৺প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশের জীবনচরিত

ও

কবিতাবলী।

শ্রীরামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায় রায়বাহাদুর কর্ত্তৃক

প্রণীত ও প্রকাশিত।

প্রথম মুদ্রণ

১৮৯২।

দ্বিতীয় সংস্করণ

১৮৯৬।

কলিকাতা।

১১৯ নং ওল্ড বৈঠকখানা বাজার রোড, বানর্জ্জি যন্ত্রে

জে, এন্, বানর্জ্জি এণ্ড সন্ কর্ত্তৃক

মুদ্রিত।

উপক্রমণিকা।

যে মহাত্মার জীবনবৃত্তান্ত লিখিতে প্রবৃত্ত হইতেছি তিনি ধনসম্পন্ন ছিলেন না, যুদ্ধবীরও ছিলেন না, জাঁকজমকের কোনও উপাধিধারীও ছিলেন না। তিনি একজন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। আজ কাল পণ্ডিতের জীবনবৃত্ত পাঠে কাহারও কি প্রবৃত্তি জন্মিবে? এক্ষণে আর সংস্কৃতবিদ্যোৎসাহী রাজা নাই, পণ্ডিতগুণগ্রাহী সহৃদয় নাই, সংস্কৃত-ভাষার তাদৃশ গৌরব নাই, এবং সে ভাষার উপাসকদিগেরও আর তাদৃশ সমাদর নাই। ভারতবর্ষের সে সকল সুখের দিন অতীত হইয়া গিয়াছে। ইদানীন্তন লোকেরা পণ্ডিত শব্দে অপদার্থ, ধনীর উপাসক, নির্ব্বিঘ্ন ব্রাহ্মণ বুঝিয়া থাকেন। সুতরাং পণ্ডিতের জীবনচরিত পাঠে কোন্ ব্যক্তির আস্থা জন্মিবে? কিন্তু প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ কি ঐরূপ অপদার্থ পণ্ডিতশ্রেণীর একজন ছিলেন? বিগত ১২৭৩ সালের চৈত্রমাসে ৺কাশীধামে তিনি মানবলীলা সম্বরণ করিলে উত্তর পশ্চিম ও বঙ্গদেশ প্রচলিত বহুতর বাঙ্গালা ও ইংরাজী সমাচার পত্রের সম্পাদক প্রভৃতি অনেকেই "ভারতবর্ষ একটী পণ্ডিতরত্ন হারাইল" বলিয়া সাতিশয় শোক প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং যাঁহারা তাঁহাকে ভালরূপ জানিতেন, সকলেই তাঁহার শোকে একান্ত ব্যাকুলিতচিত্ত হইয়াছিলেন। ইহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, তর্কবাগীশ সাধারণের অশ্রদ্ধাভাজন ছিলেন না, প্রত্যুত অনেকেই তাঁহার অসামান্য গুণে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রকাশ করিতেন। ফলতঃ প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশের জীবনবৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত অতি পবিত্র। তাঁহার আয়ুষ্কাল কেবল জ্ঞানানুশীলন, জ্ঞানবিতরণ, সংস্কৃতবিদ্যার উন্নতিসাধন এবং ধর্ম্মোপাসনাতেই পর্য্যবসিত হইয়াছে। তাঁহার একটী সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত লিখিবার এবং তাঁহার রচিত কবিতাগুলি সংগ্রহ করিয়া প্রচারিত করিবার নিমিত্ত তাঁহার বন্ধুগণ ও ছাত্রগণ আমায় বারংবার উত্তেজিত করিয়াছিলেন। আমি বিষয়কার্য্যে লিপ্ত হইয়া নানা স্থানে ভ্রমণ করিতে থাকায় প্রয়োজনীয় উপকরণসামগ্রী সংগ্রহ করিতে এবং যথাসময়ে সঙ্কল্পিত বিষয়টীতে হস্তার্পণ করিতে পারি নাই। অনেক দিন অতীত হইয়া গিয়াছে কিন্তু এখনও তর্কবাগীশের সেই সৌম্যমূর্ত্তি অনেকেরই

চিত্তপটে অঙ্কিত রহিয়াছে। এই পুস্তকখানি হাতে পড়িলে তাঁহাকে অন্ততঃ একবার স্মরণ করিবেন, তাহা হইলেই কৃতার্থ বোধ করিব। তর্কবাগীশ সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্রের জীর্ণোদ্ধার বিষয়ে সমস্ত জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তাঁহার এই জীবনচরিতখানিও একপ্রকার অসম্পূর্ণ জীর্ণোদ্ধারের মত হইয়া দাঁড়াইল। যথাসময়ে অনুষ্ঠান করা হয় নাই বলিয়া এই পুস্তকে তর্কবাগীশের একটী প্রতিমূর্ত্তি প্রকটিত করিতে অক্ষম রহিলাম। দাঁত থাকিতে দাঁতের মর্য্যাদা জানা যায় না। ইহার নিমিত্ত অনুতাপ ব্যতীত এখন আর উপায়ান্তর নাই। ডাক্তার ই. বি. কাউয়েল সাহেব মহোদয় এই নিমিত্ত বিশেষ আক্ষেপ প্রকাশ করিয়াছেন।

এই পুস্তক সঙ্কলন বিষয়ে তর্কবাগীশের ছাত্রবৃন্দ মধ্যে শ্রীযুত হরানন্দ ভট্টাচার্য্য এবং শ্রীযুত তারাকুমার কবিরত্ন যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। তর্কবাগীশের বিরচিত অনেকগুলি শ্লোক ইহাঁদের কণ্ঠস্থ। বিষেষতঃ কবি-রত্নের সাহায্য ব্যতীত আমি এই পুস্তক মুদ্রাঙ্কন বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারিতমি না। তর্কবাগীশ সংস্কৃত বিদ্যালয় হইতে অবসর লইবার সময়ে কবিরত্ন এক ছাত্র ছিলেন, সুতরাং ইনি তাঁহার শেষ সময়ের ছাত্র, স্বয়ং সুকবি বলিয়া তর্কবাগীশের প্রকৃতির প্রতি ইহাঁর বিশেষ লক্ষ্য ছিল। ইনি ভক্তিপূর্ব্বক তর্কবাগীশের প্রকৃতি সম্বন্ধে যাহা কিছু লিখিলেন তাহা সমাদরে পরিশিষ্টে দেওয়া গেল।

তর্কবাগীশের স্বর্গারোহণের পরে তাঁহার অন্যতম ছাত্র শ্রীযুত হরিশ্চন্দ্র কবিরত্ন বিলাপষট্‌ক নামে যে কয়টী মনোহর কবিতা রচনা করিয়াছিলেন তাহা পরিশিষ্টে প্রদর্শিত হইল। এই কবিতাগুলি তর্কবাগীশের আদ্য-শ্রাদ্ধ-বাসরে উপস্থিত পণ্ডিতগণকে উপহার দেওয়া হইয়াছিল।

হিন্দুপেট্রিয়ট্ প্রভৃতি পত্রের সম্পাদক ও অন্যান্য মহোদয়েরা তৎকালে তর্কবাগীশের সম্বন্ধে যাহা কিছু লিখিয়াছিলেন তাহা পরিশিষ্টে দেওয়া গেল। ইতি।

কলিকাতা।
অক্ষয় কুটীর।
১০১, তালতলা লেন।
১লা জানুয়ারি। ১৮৯২।

শ্রীরামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায়।

দ্বিতীয় সংস্করণ সম্বন্ধে কয়েকটী কথা।

৺প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশের জীবনচরিতের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত ও প্রচারিত হইল। প্রথম মুদ্রিত পুস্তকগুলি পর্য্যবসিত হইলে অনেকেই তাহা পাইবার আশয়ে আগ্রহ সহকারে আমার নিকটে আসিয়া বিমুখ হইয়া ফিরিয়া যান। প্রথম মুদ্রণের পরে তর্কবাগীশের বিরচিত সম্পূর্ণ গঙ্গাস্তোত্র প্রভৃতি কতকগুলি নূতন কবিতা পাওয়া যায়। তিনি পুরুষোত্তম রাজাবলী নামক যে এক নূতন কাব্যের রচনা আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহা পুঁথি খুজিতে খুজিতে অকস্মাৎ একদিন আমার হস্তগত হয়। কাশীতে অবস্থান সময়ে তর্কবাগীশের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে কতকগুলি নূতন কথা ঘটনাক্রমে নানা উপায়ে জানিতে পারা যায়। এই সকল নূতন উপকরণ পাইয়া জীবনচরিতখানির দ্বিতীয় সংস্করণের ইচ্ছা জন্মে। সেই ইচ্ছা এক্ষণে কার্য্যে পরিণত হইল।

বর্ণনীয় চরিত-নায়কের সঙ্গে বর্ণনাকারীর সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে পরিচয় থাকা না থাকা এই দুই দিকেই দোষ দৃষ্ট হয়। উভয় কল্পেই বর্ণনীয় নায়কের প্রতি রচয়িতার অনুরাগ ও বিরাগের তারতম্য অনুসারে প্রকৃত বর্ণনার তারতম্য ঘটিবার আশঙ্কা জন্মিয়া থাকে। আমার সঙ্গে বর্ণনীয় প্রেমচন্দ্রের যেরূপ ঘনিষ্ঠ শোণিত সম্বন্ধ, তাহা স্মরণ করিয়া বর্ণনাকালে আমায় পদে পদে পর্য্যাকুলিত হইতে হইয়াছে এবং স্থানবিশেষে ভয়ে ভয়ে মন্তব্য প্রকাশ করিতে হইয়াছে। গুণগ্রাহী অপর ছাত্র প্রেমচন্দ্রের সম্বন্ধে যাহা জানিতেন ও বলিতেন, আমি তাহাই বলিয়াছি। বৈলক্ষণ্য এই প্রেমচন্দ্র সঙ্গে ছাত্র-গণের দিনমধ্যে কয়েক ঘণ্টামাত্রের সম্বন্ধ ছিল। আমার সঙ্গে দিন, রাত্রি, মাস, বর্ষ আদি দীর্ঘকালের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ ছিল। কাজেই বেশী জানি-বার ও বেশী বলিবার অবকাশও ছিল, কিন্তু নৈপুণ্যসহকারে বলিবার সামর্থ্য ছিল না জানিয়া আমার ভয় ও পর্য্যাকুলতা। ফলতঃ গুণোন্নত অগ্রজের জ্ঞানশক্তি, কার্য্যশক্তি, দূরদর্শন, অনুশাসন, গল্প, উপদেশ, প্রতিষ্ঠা, সত্যনিষ্ঠা, উন্নতভাব ও ধর্ম্মভাব আদি গুণগ্রাম দেখিয়া শুনিয়া আমি বহুদিন অবধি তাঁহার নির্ম্মল চরিত্রের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াছিলাম। এক্ষণে

সেইগুলি স্মরণ করিয়া যথাশক্তি বর্ণনা করিবার চেষ্টা করিয়াছি। বর্ণনা কালে আনুষঙ্গিক অনেক বিষয় ও ব্যক্তির কথা উল্লেখ করিতে বিরত হই নাই। স্বরচিত কবিতাসমূহে প্রকটিত এবং গল্প ও উপদেশ চ্ছলে বিবৃত তর্কবাগীশের নিজমত ও বিস্মৃত হই নাই। যাহা কিছু বলিয়াছি, তাহা সুসঙ্গত বা অসঙ্গত, সুন্দর বা অপ্রীতিকর, হইয়াছে পাঠকবর্গ তাহার বিচার করিবেন এবং ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন।

আজকাল যে সকল জীবনচরিত বাহির হইতেছে তাহা বিচিত্র চিত্রে পরিশোভিত। তর্কবাগীশের মূর্ত্তির চিত্র রাখা হয় নাই এ কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। কাজেই প্রসঙ্গক্রমে ব্যক্ত্যন্তরের মূর্ত্তির চিত্র দিয়া ইহা শোভিত করিবার ইচ্ছা হইল না। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের জীবনচরিত; ইহাতে বাহ্য শোভাড়ম্বরের প্রয়োজন নাই। চিত্রের বৈচিত্র না থাকিলেও সহৃদয় পাঠক যদি ইহাতে বিশুদ্ধ জীবন ও পবিত্র চরিত্রের কিঞ্চিন্মাত্র বৈচিত্র্য দেখিতে পান তাহা হইলেই কৃতার্থ বোধ করিব। ইতি।

কলিকাতা।
অক্ষয় কুটীর।
১০১, তালতলা লেন।
১লা মার্চ্চ। ১৮৯৬।

শ্রীরামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায়।

দ্বিতীয়বারের শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২১	২	উৎকর্ষো	উৎকর্ষঃ
২১	২	র্জন্মনো	জন্মনো
৩১	৮	আরিষ্টটন্	আরিষ্টটল্
৪৮	১৪	চতুরা	চতুরাঃ
৫৭	৯	ব্যাঞ্জক	ব্যঞ্জক
৫৮	১৪	নাস্যাপ্রণয়ন	নাসাগ্র-নয়ন
৭৯	৯	শুভাসংশা	শুভাশংসা
৮১	১৭	অনুমাত্র	অণুমাত্র
৮৫	৮	চতুর্দ্দিকে	চতুর্দ্দিক্
৮৬	১১	মনমত	মনোমত
৮৮	১২	শাস্ত্রেই	শাস্ত্রই
৯৭	১২	লাহিত্য	সাহিত্য
১০০	২	বিফল	বিফলঃ
১০৩	৫	উৎকর্ষো	উৎকর্ষঃ
১০৩	৫	র্জন্মনো	জন্মনো
১০৮	১৫	অবর্ণয়ন্	অবর্ণয়ৎ
১০৯	৩	মুতভূপালং	মৃতভূপালং
১১২	১৬	ভমুপাযযৌ	সমুপাযযৌ
১৩৩	১৬	নৃণাগাশ্বিনো	নৃণামাশ্বিনো
১৩৩	১৭	হেমবত্যাঃ	হৈমবত্যাঃ
১৪৪	১২	পরিচয়	পরিচর
১৪৮	১৬	অধ্যপনা	অধ্যাপনা
১৫০	২৮	মীমাংশা	মীমাংসা
১৫৯	১০	বিনোদন	বিনোদেন



প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশের জীবনচরিত।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

জন্মস্থান ও বংশ।

রাঢ় প্রদেশে দামোদর নদের পশ্চিম পার্শ্বে ন্যূনাধিক দুই ক্রোশ দূরবর্ত্তী শাকরাঢ়া গ্রাম ৺প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশের জন্মভূমি। ১৭২৭ শকাব্দে বৈশাখের দ্বিতীয় দিবসে শনিবার পূর্ণিমারাত্রিতে প্রেমচন্দ্রের জন্ম হয়। লোকে এই গ্রামটীকে শাকনাড়া বলিয়া ডাকে। এই গ্রাম এক্ষণে জিলা-পূর্ব্বাংশ-বর্দ্ধমানের মধ্যবর্ত্তী রায়না থানার অন্তর্গত। সম্প্রতি শাকরাঢ়া একটী সামান্য গ্রাম। ইহার বর্ত্তমান লোকসংখ্যা তিন শত মাত্র। প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ রাঘবপাণ্ডবীয় কাব্যের নিজকৃত টীকার শেষে আত্মপরিচয় প্রদানকালে লিখিয়াছেন,—

"যস্যাভবজ্জননভূঃ কিল শাকরাঢ়া
রাঢ়াসু গাঢ়গরিমা গুণিনাং নিবাসাৎ।
গ্রামো নিকামসুখবর্দ্ধনবর্দ্ধমান-
রাষ্ট্রান্তরালমিলিতঃ সরিতঃ প্রতীচ্যাম্" ॥

(নিরতিশয় সুখবর্দ্ধন বর্দ্ধমান রাজ্যের মধ্যে দামোদর নদের পশ্চিমে শাকরাঢ়া গ্রাম যাঁহার জন্মভূমি। অনেক গুণবান্ লোকেরা ঐ গ্রামে বাস করায় উহা রাঢ়দেশের মধ্যে অতিশয় গৌরবের স্থান হইয়াছে।)

শাকরাঢ়ার ভৌগলিক সংস্থান এই কবিতাতেই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এক্ষণে এই সম্বন্ধে আর কয়েকটী কথা বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে।

দামোদর নদ বর্দ্ধমান সহরের পশ্চিম দক্ষিণ হইয়া পূর্ব্বদিকে প্রবাহিত। সুতরাং তথা হইতে নির্দ্দেশ করিতে হইলে শাকনাড়া উক্ত নদের দক্ষিণে বলিতে হয়, কিন্তু উক্ত নদ পুনর্ব্বার বক্রভাবে শাকনাড়ার অনতিদূর পূর্ব্বে দক্ষিণ মুখে প্রবাহিত হইয়াছে, এই জন্যই অপেক্ষাকৃত নিকটবর্ত্তী স্থান ধরিয়া গ্রামটী নদীর পশ্চিমে অবস্থিত বলা হইয়াছে। শাকনাড়াকে সংস্কৃত ভাষায় "শাকরাঢ়া" বলিয়া নির্দ্দেশ করা অযুক্ত হয় নাই। বর্ণ পরিবর্ত্তনে ইহার বৈশদ্য ও বৈচিত্র্য সম্পাদন করা হইয়াছে। শাস্ত্রে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে।

কেহ কেহ মনে করিতে পারেন;—তর্কবাগীশ কেবল অনুপ্রাসের অনুরোধে বর্দ্ধমানের "নিকামসুখবর্দ্ধন" এবং জন্মস্থানের অনুরাগেই নিজগ্রামের "গুণিনাং নিবাসাৎ রাঢ়াসু গাঢ়গরিমা" এই বিশেষণ দিয়াছেন। দারুণ ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রাদুর্ভাবে ঐ সকল স্থানের বর্ত্তমান দুরবস্থা দেখিয়া লোকের মনে এইরূপ তর্ক উপস্থিত হইতে পারে, কিন্তু এক সময়ে বর্দ্ধমান যে নিতান্ত সুখের স্থান ছিল তাহা বর্ণনা করিয়া প্রতিপন্ন করিবার আবশ্যক নাই। ১৭৭৫ শকে অর্থাৎ ন্যূনাধিক ৪২ বৎসর পূর্ব্বে তর্কবাগীশ পূর্ব্বোদ্ধৃত কবিতাটী রচনা করিয়াছিলেন। তখন বঙ্গদেশের অনেক স্থানের জলবায়ু অপেক্ষা বর্দ্ধমানের জলবায়ু যে সমধিক স্বাস্থ্যকর ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। স্বাস্থ্যকর জলবায়ুর অন্বেষণে বর্দ্ধমানবাসীদের স্থানান্তরে কখন যাইতে হইত না। বর্দ্ধমানের সেই সেই অসীম প্রান্তর, বিবিধশস্যপূর্ণ বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র, কাকের চক্ষের ন্যায় সলিলে পরিপূর্ণ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জলাশয়, সরোবরের পাড়ের উপর ও প্রান্তরের স্থানে স্থানে সেই সমুন্নত শতাধিক বৎসরের অশ্বত্থ, বট, তাল, বকুল প্রভৃতি বৃক্ষশ্রেণী। আহা! ইহা অপেক্ষা সুন্দর দৃশ্য বঙ্গদেশের কোথাও কি আছে? অন্যান্য বিষয়ে দরিদ্র হইলেও এই সকল সম্পত্তিতে তর্কবাগীশের জন্মস্থান যে সাতিশয় সৌভাগ্যবান্ ছিল তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। গ্রামের উত্তরে পূর্ব্বমুখে প্রবাহিত একটী খাল। খালটী পশ্চিমে কিয়দ্দূরে কয়েকটী মাঠের নালা হইতে সমুৎপন্ন হইয়া শাকনাড়ার নিকটে এক ক্ষুদ্র নদীর আকার ধারণ করিয়াছে। গ্রীষ্মকালে ইহা শুষ্ক হইত বলিয়া কৃষিকার্য্যের সুবিধার নিমিত্ত উন্নত বাঁধ দিয়া জল

সংগ্রহ করা হইয়া থাকে। কাজেই কোন কালেই জলাভাব হয় না। গ্রামের দক্ষিণ প্রান্তে তালা নামে (হিন্দুস্থানীয় তালাও শব্দের অপভ্রংশ) এক বৃহৎ সরোবর। চতুর্দ্দিকে সমুন্নত ও বিস্তৃত পাড়। পাড়ের স্থানে স্থানে ছায়ামণ্ডিত অশ্বথ বট বৃক্ষ। গ্রীষ্মকালে প্রাতে ও সায়ংকালে তরুতলে বসিয়া সরোবরের সলিলকণবাহী, প্রফুল্ল-কমলদল-সংসর্গ-সুরভি প্রান্তর-বাত সেবনে যে কিরূপ প্রীতি তাহা অনুভবকারীই বুঝিতে ও বলিতে পারেন। এই সরোবরের উত্তরে একটী সমুন্নত ও বিস্তৃত ময়দান। ময়দানের পশ্চিমে একটী এবং দক্ষিণে কথিত সরোবরের পূর্ব্বপার্শ্ব দিয়া আর একটী প্রশস্ত রাস্তার চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। ময়দানের স্থানে স্থানে এবং সরোবরের উত্তর মোহনার নিকটে খনন করিলে লালবর্ণ ক্ষুদ্রাকার ইষ্টক-রাশি পাওয়া যায়। এক সময়ে অনাবৃষ্টি বশতঃ কৃষকেরা শস্যরক্ষার্থে জল সেচন করিলে সরোবরটী একবারে পরিশুষ্ক হয়। এই সময়ে উহার মধ্যভাগে একটী বৃহৎ যূপকাষ্ঠ দেখা যায়। একটী মোটা এবং একটী সরু লৌহশৃঙ্খলে এই যূপের আগা গোড়া সম্বেষ্টিত। এইরূপ লৌহশৃঙ্খল-জড়িত যূপ সচরাচর দেখা যায় না। উহার অধঃস্তরে বহুতর অর্থরাশি সঞ্চিত আছে বলিয়া জনপ্রবাদ। এই অর্থরাশি পাইবার আশয়ে এক সাহসিক যুবকদল যূপকাষ্ঠের চতুষ্পার্শ্ব খনন করিতে আরম্ভ করে। ন্যূনাধিক ১০।১২ হাত গভীর খাদ করিবার পরে এক দিবস প্রাতে বেলা একপ্রহর সময়ে পাড়ের উপরে বৃক্ষতলে বসিয়া সকলে তামাক খাইতে-ছিল ও বিশ্রাম করিতেছিল, এমৎসময়ে যূপের চারিদিগের মৃত্তিকারাশি অকস্মাৎ এরূপ সশব্দে খাত-মধ্যে পতিত হয় যে ৩।৪ বিঘা দূরবর্ত্তী পাড়ের উপরিস্থিত বৃক্ষ সকল প্রকম্পিত এবং মনুষ্যেরা সহসা স্থানচ্যুত ও পতিত হয়। ভূমিকম্প সময়ে কখন কখন ভূগর্ভ সমালোড়িত হইলে যেরূপ শব্দ ও প্রকম্প হইয়া থাকে সেইরূপ ভীষণশব্দান্বিত প্রকম্প অনুভব করিয়া সকলে পর্য্যাকুল চিত্তে পলায়ন করিল এবং এই অদ্ভুত ব্যাপারটী ধনরক্ষার্থে নিযুক্ত যক্ষের কার্য্য বলিয়া স্থির করিল। তদবধি আর কেহ এই ধনোদ্ধারের চেষ্টা করে নাই। সঞ্চিত ধনের কাহিনী যাহাই হউক, এক সময়ে এই স্থান যে কোন সমৃদ্ধিশালী লোকের আবাসভূমি

ছিল তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সংশয় হয় না। কালস্রোতে উহাদের ইতিবৃত্ত বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, কেবল দীর্ঘ সরোবর ও সমুন্নত ময়দান আদি অতীত সমৃদ্ধিবিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। গ্রামে ভূম্যধিকারীর কোন অত্যাচার ছিল না। ব্যাঘ্র ভল্লুক আদি হিংস্র জন্তুর উপদ্রব ছিল না। শাকনাড়া সুখের স্থান বলিয়া বর্ণনা করিবার সময়ে সহৃদয় কবি তর্কবাগীশ আশৈশব পরিচিত এই বিষয়গুলি যে স্মরণ করেন নাই এরূপ বোধ হয় না। সত্য বটে, তাঁহার বংশীয়েরা উত্তম অট্টালিকা, পুষ্করিণী ও বৃক্ষবাটিকা আদি নির্ম্মাণ করিয়া আপনাদের জন্মভূমিকে 'এক্ষণে বিভূষিত করিয়াছেন. কিন্তু তর্কবাগীশের তাহা লক্ষ্য ছিল না। তিনি নিজ গ্রামকে গুণীদের নিবাস-ভূমি ও তজ্জন্য অতিশয় গৌরবান্বিত বলিয়া যে বর্ণনা করিয়াছেন, এস্থানে গুণী শব্দে বোধ হয় তাঁহার নিজের পিতৃপুরুষেরাই তাঁহার উদ্দেশ্য। অবিলম্বেই তাঁহাদের বিষয় কিছু বলিতে হইবে। তাঁহাদের জন্মস্থান বলিয়া শাকনাড়া রাঢ়দেশের গৌরবস্থান এ কথা নিতান্ত অত্যুক্তি নহে। বিশেষতঃ তর্কবাগীশ স্বীয় পূর্ব্বপুরুষদিগকে যেরূপ ভক্তি করিতেন তাহাতে তাঁহার মুখে এ কথা অতিশয় শোভাই পাইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় তর্কবাগীশ স্বয়ংই উক্ত বিশেষণের অধিকতর সার্থকতা সংস্থাপন করিয়াছেন। তিনি শাকনাড়ায় জন্মগ্রহণ করাতে উহা যে সমুদায় রাঢ়-দেশের একটী গৌরবের কারণ তদ্বিষয়ে বোধ হয় অধিক মতদ্বৈধ হইবে না।

রাজা আদিশূর আপন রাজ্যের সপ্তশতী ব্রাহ্মণদিগের প্রতি বিরক্ত হইয়া কান্যকুব্জেশ্বরের নিকট হইতে ভট্টনারায়ণ, দক্ষ, বেদগর্ভ. ছান্দড় এবং শ্রীহর্ষ নামে পাঁচজন বেদপারগ ব্রাহ্মণ আনাইয়াছিলেন। তাঁহাদের ক্রিয়াকলাপ ও যজ্ঞানুষ্ঠানবিধি দর্শন করিয়া রাজা সাতিশয় সন্তোষলাভ করেন এবং তাঁহাদের বৃত্তির জন্য রাঢ়জনপদমধ্যে অর্থাৎ ভাগীরথীর দক্ষিণ পার্শ্বে ব্রহ্মপুরী, গ্রামকুটী, হরিকুটী, কঙ্কগ্রাম ও বটগ্রাম এই পাঁচটী গ্রাম পাঁচজন ব্রাহ্মণকে প্রদান করেন। এক্ষণে এই সকল গ্রামের অবস্থানভূমি নির্ণয় করা সুকঠিন। কথিত পঞ্চ ব্রাহ্মণের মধ্যে কশ্যপকুলসম্ভূত দক্ষ তর্কবাগীশের রাঢ়ীয় বংশের আদিম পুরুষ। দক্ষের সন্তানেরা বহুকাল পর্য্যন্ত নিয়ত বেদাধ্যয়ন ও বৈদিক

ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে সর্ব্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য অতিশয় বিদ্বান্, ক্রিয়াবান্ ও যশস্বী হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি প্রথমে ঢাকার অন্তর্গত বিক্রমপুর অঞ্চলে বাস করিয়া নানা বিষয়ে আধিপত্য, সম্মান ও সম্পত্তি লাভ করেন। ঐ অঞ্চলে যবনদিগের সমাগম ও রাজ্যারম্ভের প্রারম্ভেই তিনি বিক্রমপুরের নিকটবর্ত্তী এক গ্রাম হইতে রাঢ়ে অর্থাৎ গঙ্গার দক্ষিণ পার্শ্বে আসিয়া বাস করেন। রাঢ়ে বসতি স্থাপন করিবার কিছুদিন পরেই তিনি মহাসমারোহে এক যজ্ঞানুষ্ঠান করেন। প্রসিদ্ধি আছে রাঢ়দেশে এরূপ যজ্ঞ কেহ কখন সম্পাদন করেন নাই ও দেখেন নাই। এই যজ্ঞানুষ্ঠান সময়ে অবসথপালন অর্থাৎ যজ্ঞান্তে যজ্ঞশালা ভগ্ন না করিয়া আমরণ তাহার রক্ষণাবেক্ষণ এবং তথায় নিয়ত হোমাদির অনুষ্ঠান এবং দানাদি করিতেন এই নিমিত্ত তৎসমকালীন পণ্ডিতেরা সর্ব্বেশ্বরকে "অবসথী" এই আখ্যা প্রদান করেন। এই বিষয়ে মিশ্রগ্রন্থে কবিতাটী এইরূপ আছে;—

"নাম্না সর্ব্বেশ্বরঃ প্রাজ্ঞো দানৈঃ কল্পমহীরুহঃ।
অবসথীতি বিখ্যাতো যজ্ঞেঽবসথপালনাৎ" ॥

সর্ব্বেশ্বরের দানের ইয়ত্তা ছিল না এই কথা অদ্যাপি ঘটকেরা মুক্তকণ্ঠে পাঠ করিয়া থাকেন। তর্কবাগীশ রাঘবপাণ্ডবীয় টীকার প্রথমে সর্ব্বেশ্বর ভট্টাচার্য্যের এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন;—

"আসীদসীমগরিমাস্পদকশ্যপর্ষি-
বংশপ্রশংসিতজনুর্মনুতোঽপ্যনূনঃ।
সর্ব্বেশ্বরোঽনবরতক্রতুকর্ম্মনিষ্ঠা-
নির্বর্ত্তিতাবসথিসংজ্ঞতয়া প্রতীতঃ" ॥

ইহাতেও সর্ব্বেশ্বরের অনবরত যজ্ঞকর্ম্মে নিষ্ঠাহেতু "অবসথী" এই সংজ্ঞা প্রাপ্তির কথা উল্লিখিত হইয়াছে। অবসথী সর্ব্বেশ্বর রাঢ়প্রদেশের কোন্ স্থানে কোন্ গ্রামে যে বাস ও যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন তাহা এক্ষণে নির্ণয় করা সহজ নহে। শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অবসথী সর্ব্বেশ্বরের বংশসম্ভূত। তিনি বলেন সর্ব্বেশ্বর রাঢ়ে আসিয়া

এক্ষণকার হুগলী জেলার অন্তর্গত দেশমুখগ্রামে বসতি স্থাপন ও যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। সর্ব্বেশ্বরের অধস্তন বংশধরগণের মধ্যে অনেকে এক্ষণে এই দেশমুখ গ্রামে বাস করিতেছেন এবং অনেকে বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত রামবাটী গ্রামে গিয়া বাস করেন। রামবাটী একটী প্রধান ও প্রাচীন গ্রাম। ইহা শাকনাড়ার উত্তর পশ্চিমে এক ক্রোশ দূরে অবস্থিত। সর্ব্বেশ্বরের বংশীয়েরা রামবাটী হইতে আবার ক্রমে ক্রমে পাষণ্ডা, শাকনাড়া, পাকমাজিটা প্রভৃতি বিভিন্ন গ্রামে গিয়া যে বাস করিয়াছেন এই বিষয়ে জনশ্রুতি রহিয়াছে। কালের পরিবর্ত্তন অনুসারে যজনশীল সর্ব্বেশ্বরের অধস্তন বংশীয়দের বৈদিক কার্য্যে নিষ্ঠা যদিও ক্রমশঃ হ্রাস পাইয়াছিল কিন্তু সংস্কৃত শাস্ত্রের আলোচনা এবং অধ্যাপনা যে এই বংশীয়দিগের ব্যবসায় ছিল তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। যতদূর সন্ধানে জানিতে পারিয়াছি তাঁহাতে এই বংশসম্ভূত রামচরণ বিদ্যালঙ্কার, অযোধ্যারাম ন্যায়রত্ন, চতুর্ভুজ চূড়ামণি, শ্রীনাথ বিদ্যারত্ন, দিবাকর শিরোমণি, লক্ষণপুত্র নৃসিংহ বিদ্যাভূষণ, মুনিরাম বিদ্যাবাগীশ, রামনাথ বিদ্যালঙ্কার, রামজীবন ন্যায়বাগীশ, রামকান্ত-পুত্র নৃসিংহ তর্কপঞ্চানন এবং রামদাস ন্যায়পঞ্চানন পণ্ডিতশ্রেণীতে পরিগণিত হইয়া রাঢ়ে যে খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন ইহা প্রকাশ পায়। এতদ্ব্যতীত অনেকেরই সংস্কৃতবিদ্যায় অধিকার ও বিশেষ দৃষ্টি ছিল জানা যায়। এই নিমিত্ত রাঢ়প্রদেশে এই বংশীয়দিগকে অদ্যাপি "ভট্টাচার্য্য" বলিয়া আহ্বান করিয়া থাকে। এই বংশীয়দিগের অনেকেই অলঙ্কারশাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন। তর্কবাগীশের পূর্ব্বে রামচরণ বিদ্যালঙ্কার, মুনিরাম বিদ্যাবাগীশ এবং রামনাথ বিদ্যালঙ্কার আলঙ্কারিক বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। এই বিষয়ে রামচরণ বিদ্যালঙ্কারের অবিনশ্বর কীর্ত্তিস্তম্ভ বর্ত্তমান। ইনিই সেই সাহিত্যদর্পণ নামক প্রসিদ্ধ অলঙ্কারগ্রন্থের বিখ্যাত টীকাকর্ত্তা। এই স্থানে তাঁহার টীকার আদ্যন্তের কবিতা দুইটী উদ্ধৃত করিলাম।

আদিতে মঙ্গলাচরণের পর,—

"শ্রীবিশ্বনাথকবিরাজকৃতিপ্রণীতং
সাহিত্যদর্পণমতিস্থগিতপ্রমেয়ং।

শ্রীমদ্বিধায় চরণং শরণং গুরূণাং
যত্নেন রামচরণো বিবৃণোতি বিপ্রঃ" ॥

অন্তে,—

অক্ষিপক্ষরসচন্দ্রসম্মিতে হায়নে শকবসুন্ধরাপতেঃ।
শ্রীলরামচরণাগ্রজন্মনা দর্পণস্য বিবৃতিঃ প্রকাশিতা ॥

রামচরণ বিদ্যালঙ্কার ১৬২৩ শকে অর্থাৎ তর্কবাগীশের জন্মগ্রহণের প্রায় ১০৪ বৎসর পূর্ব্বে সাহিত্যদর্পণের এই টীকা রচনা করেন। এই টীকাখানি আলঙ্কারিকদের মধ্যে অবিদিত নহে। বাঙ্গালা ও হিন্দুস্থানে ইহার অতিশয় সমাদর। যতদিন অলঙ্কারের আলোচনা থাকিবে ততদিন এই টীকার লোপ হইবার সম্ভাবনা নাই। তর্কবাগীশ এই টীকাখানির যথেষ্ট প্রশংসা করিতেন এবং এই বিষয়ে তাঁহার মত বোধ হয় অবিসম্বাদী। রামচরণের অধস্তন বংশীয়েরা অদ্যাপি পূর্ব্বকথিত রামবাটী গ্রামে বাস করিতেছেন।

তর্কবাগীশের বৃদ্ধপ্রপিতামহ মুনিরাম বিদ্যাবাগীশ একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। তিনি ন্যূনাধিক ১৮০ বৎসর পূর্ব্বে (১৬৩২।৩৩ শকে) আরংজীবের রাজত্বকালের শেষভাগে প্রাদুর্ভূত ছিলেন। নানা শাস্ত্রের বিশেষতঃ দর্শনশাস্ত্রের পাঠনাকার্য্যে তিনি পর্য্যাপ্তরূপে পটু ছিলেন। এক সময়ে বঙ্গমধ্যে অদ্বিতীয় স্মার্ত্ত বলিয়াও প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন। প্রথমে তিনি নিজগ্রাম শাকনাড়ায় চতুষ্পাঠী খুলিয়া অধ্যাপনা আরম্ভ করেন। পরে নানাদেশীয় ছাত্র আসিয়া পাঠার্থী হওয়ায় কয়েকজন হিতৈষীর অনুরোধ ক্রমে বর্দ্ধমানের নিকটবর্ত্তী খাজা মুরের-বেড় নামক গ্রামে গিয়া চতুষ্পাঠী স্থাপন করেন। তথায় তাঁহার পাঠশালার বিলক্ষণ উন্নতি হয়। এই সময়ে তাঁহার পাণ্ডিত্যের গৌরব সমধিকরূপে বিস্তৃত হইবার বিষয়ে কয়েকটী ঘটনা উপস্থিত হয়। একদা কাল্‌নার নিকটবর্ত্তী এক গ্রাম হইতে তরুণবয়স্কা একটী তন্তুবায়জাতীয়া রমণী কয়েকটী স্বজাতীয় লোক এবং বিজাতীয় কয়েকজন রাজপুরুষ সমভিব্যাহারে বিদ্যাবাগীশের পাঠশালায় উপস্থিত হয়, এবং নয় দিবস পূর্ব্বে তাহার স্বামীর মৃত্যু হওয়ায় দেহ ভস্মী-

ভূত হইয়া গিয়াছে, এক্ষণে সে সহমরণ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে পারিবে কি না বলিয়া ব্যবস্থা চাহে। বিদ্যাবাগীশ সহমরণের তাদৃশ অনুমোদন করিতেন না বলিয়াই হউক বা অল্পবয়স্কা স্ত্রীলোকটীর প্রতি দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়াই হউক প্রথমে তিনি স্ত্রীলোকটীকে তাহার সঙ্কল্প হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করেন এবং অনেক দিবস অতীত হইয়াছে, পতিবিয়োগ-শোকাবেগ সহ্যপ্রায় হইয়া আসিয়াছে, এখন আর এ উদ্যম কেন, বলিয়া বুঝাইতে লাগিলেন। তন্তুবায়রমণীর চিত্ত স্থিরসঙ্কল্পারূঢ়, প্রতিনিবৃত্ত হইবার নহে। সে কাতরবচনে বাষ্পগদ্‌গদস্বরে বলিতে লাগিল,—মহাশয়! সময়ে উপস্থিত হওয়া আমার সাধ্যায়ত্ত ছিল না, পতির মৃত্যুসময়ে নিকটে ছিলাম না। আত্মীয়েরা এ দুর্ঘটনার সমাচার যথাসময়ে দেন নাই। কাল-বিলম্বে সম্বাদ পাইয়া ব্যবস্থার নিমিত্ত নবদ্বীপের পণ্ডিতগণের নিকট গিয়া-ছিলাম। তাঁহারাও কালবিলম্ব দোষ ধরিয়া ব্যবস্থা দেন নাই। আপনি বিখ্যাত পণ্ডিত শুনিয়া নিকটে আসিয়াছি। কালাতীত দোষে এইরূপ কর্ম্ম পণ্ড হইলে তাহার অনুষ্ঠান বিষয়ে শাস্ত্রে অবশ্য কোন যুক্তি থাকা সম্ভব। যবনরাজ্যে বাস। রূপযৌবনসম্পন্ন কুলকামিনীজনের প্রতি যে অত্যাচার হইয়া থাকে তাহা কাহারও অবিদিত নাই। আমার বয়স ও রূপলাবণ্য স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিতেছেন। ইতিপূর্ব্বে কুলকামিনী ছিলাম, এক্ষণে মৃত পতির গুণ স্মরণ করিয়া অধীরভাবে গৃহের বাহির হইয়াছি। রাজপুরুষদিগের দৃষ্টিপথে পড়িয়াছি। ভাবী অশুভ ফল প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, আত্মহত্যা দোষে পতিত না হই বলিয়া শাস্ত্রের আশ্রয় এবং লোকান্তরিত স্বামীর পার্শ্বে দাঁড়াইতে প্রার্থনা করিতেছি। তাহা হইলেই অভয়পদ পাইব। আপনি সর্ব্বজ্ঞ পণ্ডিত। সকল খুলিয়া বলিলাম। দয়া করিয়া ব্যবস্থা দিউন। বিদ্যাবাগীশ তন্তুবায়রমণীর প্রগাঢ় পতিভক্তি ও বাক্-শক্তি সন্দর্শন করিয়া চমৎকৃত হইলেন এবং কিয়ৎক্ষণ মধ্যে একটী ব্যবস্থা-পত্র লিখিয়া দিলেন। কহিলেন,—শ্মশানে তোমার পতির চিতাগ্নির অব-শেষ থাকিলে চিতারোহণ করিতে পারিবে, এই ব্যবস্থা দিলাম এবং অদ্যাপি চিতায় যে অগ্নি আছে ও তোমার উদ্দেশ্য যে সুসিদ্ধ হইবে তাহাও গণনা করিয়া দেখিলাম। এই ব্যবস্থা শুনিয়া স্ত্রীলোকটী একেবারে ভূমিতে

সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিতে করিতে কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল,—পণ্ডিত মহাশয়! আমি দিব্যচক্ষে দেখিতেছি, পতির চিতায় অগ্নি ধুঁয়াইতেছে, আমার ইষ্টসাধন হইয়াছে। আমি শূদ্রকন্যা কি আর বলিব? এই মাত্র বলিতেছি, আপনার লোকান্তে আপনার পত্নীও সহগমন করিবেন।

স্ত্রীলোকটীর সঙ্গে যে কয়েকজন রাজপুরুষ ছিল তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ বর্দ্ধমানের নায়েব সুবাদারের নিকট গিয়া এই বৃত্তান্ত জানাইল। পণ্ডিতের উত্তেজনায় স্ত্রীলোকটী শ্মশানে পুনর্ব্বার অগ্নি স্থাপন করাইয়া চিতারোহণ করিতে না পারে এই বিষয়ে সতর্ক থাকিবার নিমিত্ত নায়েব সুবাদার তৎক্ষণাৎ কয়েকজন অশ্বারোহী দূত প্রেরণ করিলেন। তন্তুবায়-রমণী আত্মীয় ও রক্ষকগণ সঙ্গে পৌঁছিবার বহুপূর্ব্বে অশ্বারোহী দূতেরা উপস্থিত হইয়া চিতায় ধূমায়মান অগ্নি দেখিতে পায় এবং তদনুসারে সুবাদারের নিকটে আবেদনপত্র পাঠাইয়া দেয়। তন্তুবায়রমণী বিদ্যা-বাগীশের ব্যবস্থানুসারে বিধিপূর্ব্বক চিতারোহণ করিবার পরে নবদ্বীপের রাজা বিদ্যাবাগীশকে আহ্বান করেন এবং ব্যবস্থাবিষয়ে তাঁহার যুক্তির প্রশংসা করিয়া বহুতর পণ্ডিতগণ সমক্ষে সম্মান বর্দ্ধন করেন। এদিকে বর্দ্ধমানের নায়েব সুবাদার দরবারে উপস্থিত হইবার নিমিত্ত বিদ্যাবাগীশকে ডাকাইয়া পাঠান। সুবাদার প্রথমতঃ বিদ্যাবাগীশের বহুসংখ্যক ছাত্রের দৈনন্দিন আহার-যোজনার কি সংস্থান আছে ইত্যাদি বিষয়ে প্রশ্ন করেন। সুবাদারের প্রধান হিন্দু কর্ম্মচারী পণ্ডিতদিগের টোলে যে প্রণালীতে পাঠনা ও ছাত্রদিগের আহার-যোজনা কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে এবং পণ্ডিতদিগের অর্থাগমের যে যে উপায়, তৎসমুদায় সবিস্তরে বর্ণনা করিল। সুবাদারের আদেশ অনুসারে বিদ্যাবাগীশকে কয়েক দিবস দরবারে যাতায়াত করিতে হয়। এক দিবস দরবারে আসিয়া আদেশ প্রতীক্ষা করিতে করিতে মধ্যাহ্ন সময় উপস্থিত হইল। ভৃত্যেরা যথানিয়মে সুবাদারের ভোজনসামগ্রী এক গৃহ-মধ্যে বহিয়া আনিতে লাগিল। বিদ্যাবাগীশ প্রস্থান করিবেন এমন সময়ে একখানি কাগজ হস্তে এক যবন বালক তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল এবং তাহা অর্পণ করিবার নিমিত্ত হস্ত প্রসারণ করিল। ঐ দানপত্রে

শাকনাড়া ও লালগঞ্জ এই দুইখানি গ্রাম পণ্ডিতের বৃত্তির নিমিত্ত প্রদত্ত হইয়াছে, ইহা সুবাদারের লোক পণ্ডিতকে জ্ঞাত করিল। বিদ্যাবাগীশ নীরব ও তটস্থ। তিনি প্রাতে স্নান করিয়া দরবারে আসিয়াছিলেন। সন্ধ্যাবন্দনাদি সমুদায় নিত্যকর্ম্ম সমাপন করেন নাই। দেখিলেন,—সুবাদার খানা খাইতে খাইতে কাগজখানি প্রদান করিলেন, এবং যাহারা ভোজন পাত্র বহিতেছিল তাহাদের মধ্যে এক বালক অপবিত্র হস্তেই তাহা আনিয়া দিতেছে। গ্রহণ করিবার নিমিত্ত তাঁহার হাত আর উঠিল না। তাহা দেখিয়া "বে অকুব বামন্" এই কথাটী যবন বালক মৃদুমন্দ স্বরে বলিয়া উঠিল। অপর সকলে "বে অকুব আহাম্মক" বলিতে লাগিল। "গোঁয়ার আহাম্মক" এই কথা সুবাদারের মুখ হইতেও বিনির্গত হইল। বিদ্যাবাগীশ অক্ষুব্ধভাবে টোলে ফিরিয়া আসিলেন এবং পুনর্ব্বার স্নান ও সন্ধ্যাবন্দনাদি করিলেন। পর দিবস সুবাদারের প্রধান হিন্দু কর্ম্মচারী বিদ্যাবাগীশের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার নিমিত্ত অনেক যত্ন করিয়াছিলেন, কিন্তু নিষ্কর ভূমিদানের সনন্দখানি বহুমানপূর্ব্বক গ্রহণ না করায় নায়েব সুবাদার বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছেন বলিতে লাগিলেন। বিদ্যাবাগীশ বলিলেন,—তিনি নায়েব সুবাদারের বিরক্তি এবং তাঁহার পারিষদবর্গের ব্যঙ্গোক্তিতে অণুমাত্র ক্ষুব্ধ নহেন। অপবিত্র কাগজখানি আপন পবিত্র গ্রন্থমধ্যে অথবা অন্যান্য প্রয়োজনীয় পবিত্র সামগ্রীর সঙ্গে বাক্সমধ্যে যত্নপূর্ব্বক রাখিতে বাসনা করেন না। একবারে দুইখানি গ্রাম নিষ্কররূপে দানের প্রস্তাব! ইহার তত্ত্বাবধান কার্য্যে অনেক সময় অতিবাহিত হইবে। অধর্ম্মপরায়ণ কর্ম্মচারীর অবৈধাচরণে সহায়তা অথবা অনুমোদন করিতে হইবে। ক্রমে অর্থলালসা বৃদ্ধি হইবে। লালগঞ্জের সমৃদ্ধিশালী তন্তুবায়গণের সহিত নানা বিষয়ে বিরোধ উপস্থিত হইবে এবং এই সকল ব্যাপারে তাঁহার সঙ্কল্পিত পাঠনাকার্য্যের বিশেষ ব্যাঘাত জন্মিবে। দুরূহ শাস্ত্রের পাঠার্থী হইয়া নানা দেশ হইতে অনেকগুলি ছাত্র সমবেত। তাহাদের নিকটে অধ্যাপনাকার্য্যে অক্ষম বলিয়া পরিচিত হওয়া অপেক্ষা যবনসভায় নির্ব্বোধ বলিয়া পরিচিত থাকা ক্ষোভের বিষয় হইবে না। ইহা শুনিয়া হিন্দু কর্ম্মচারী বলিলেন,—"ইহাকেই পণ্ডিত-মূর্খ এবং এইপ্রকার বুদ্ধিকেই অপরি-

গায়দর্শিনী” বলিয়া লোকে নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। বিদ্যাবাগীশ বলিলেন, ইহা কেবল রুচিবৈচিত্রের ফল। চিত্তের অরুচিকর কার্য্য সম্পাদন না করিয়া তাঁহার মনে কখন বিকার বা ক্ষোভ জন্মে নাই; তিনি কখন এরূপ সম্পত্তি লাভের আশা করেন নাই এবং লব্ধ-নাশের নিমিত্ত দুঃখিত নহেন; এরূপ পুরস্কার ও তিরস্কারে তাঁহার চিত্তক্ষোভ জন্মে নাই। যাহাই বলুন বিদ্যাবাগীশ এই সম্পর্কে ব্যঙ্গোক্তি বিষয়ে নিজ পরিবারবর্গ হইতেও নিস্তার পান নাই। বিদ্যাবাগীশ জলকষ্ট নিবারণ নিমিত্ত শাকনাড়া মধ্যে একটী পুষ্করিণী খনন করেন। এই উপলক্ষ্যে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা আত্মারাম বিদ্যালঙ্কার ব্যঙ্গচ্ছলে বলিয়াছিলেন, শাস্ত্রচিন্তায় বিদ্যাবাগীশের মস্তিষ্ক বিপর্য্যস্ত হইয়া গিয়াছে। এই নিমিত্ত তিনি অযাচিত ধনসম্পত্তি হস্তে পাইয়াও পরিত্যাগ করিয়াছেন। নচেৎ পুষ্করিণী কেন? মনে করিলে বিদ্যাবাগীশ একটা দীর্ঘিকা নির্ম্মাণ করিতে পারিতেন। যাহা হউক, বিদ্যাবাগীশ তৎকালে ধনসম্পত্তিলাভে বঞ্চিত হইলেন বটে, কিন্তু যশোলাভে বঞ্চিত হয়েন নাই। যতই তাঁহার বয়োবৃদ্ধি হইতে লাগিল ততই তিনি সর্ব্বত্র অধিকতর যশস্বী হইতে লাগিলেন। এরূপ কিম্বদন্তী আছে, নবদ্বীপের পণ্ডিতেরাও তাঁহার যশে ঈর্ষান্বিত হইতেন। ইদানীন্তন লোকের ন্যায় তৎসময়ে পূর্ব্বদেশীয়েরা গঙ্গার দক্ষিণ পারের লোকদিগকে “রেঢ়ো মূর্খ” বলিয়া ঘৃণা করিতেন। মুনিরাম রেঢ়ো হইয়া নবদ্বীপের পণ্ডিতদিগের প্রতিদ্বন্দ্বী হইবেন ইহা কোনমতে তাঁহাদের সহ্য হইবার কথা ছিল না। এই দ্বেষাদ্বেষী সম্বন্ধে দুই একটী গল্প এই স্থানে সন্নিবেশিত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

এক সময়ে নবদ্বীপের পণ্ডিতেরা একজন দাড়িওয়ালা মোসলমানের মস্তকে এক কলস গঙ্গাজল দিয়া তাহা রাঢ়ের পণ্ডিতদিগের নিকটে পাঠাইয়া দেন। নবদ্বীপের পণ্ডিতদের এই ধারণা ছিল,—গঙ্গাজল যবনপৃষ্ট হইলেও তাহার মাহাত্ম্য যে অখণ্ডিত থাকে এই তত্ত্ব রাঢ়ের পণ্ডিতেরা অবগত নহেন। কিন্তু মুনিরামের নিকটে তাঁহাদের এই চালাকি খাটে নাই। তিনি ঐ জল অতি সমাদরে গ্রহণ করিলেন এবং স্বীয় পবিত্র গোশালায় একটী গর্ত্ত খনন করাইয়া ঐ জল ঢালাইলেন, পরে সবান্ধবে মহা সমারোহে তাহাতে মস্তক সিঞ্চনাদি কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। পরিশেষে

রাঢ়ীয়দিগের সুদুর্লভ গঙ্গোদক উপঢৌকন দিয়াছেন বলিয়া অসংখ্য ধন্যবাদ প্রদানপূর্ব্বক নবদ্বীপের পণ্ডিতদিগকে সংস্কৃত ভাষায় একখানি পত্র লিখিলেন। তাহাতে প্রেরিত জল গ্রহণ প্রণালীর বর্ণনাও করিলেন এবং মোসলমান বাহককে বহুবিধ পুরস্কার প্রদান করিয়া পত্রসহ বিদায় করিলেন। প্রেরিত পত্রে ইহাও লিখিত হইয়াছিল যে পুরাতন মহর্ষিগণ গতানুগতিক ন্যায়ানুসারে কেবল ভক্তিভাবতঃ গঙ্গাজলের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন নাই। ভূয়োদর্শন দ্বারা ইহার গুণোৎকর্ষ সম্যক্ পরীক্ষা করিয়া গুণ গান করিয়া গিয়াছেন। নদ্যন্তরের জল দেশ বিশেষে প্রবাহিত হইয়া প্রদূষিত হইতে দেখা যায়। কোন নদীর জল তুলিয়া রাখিলে কীটাণুপূর্ণ ও বিকৃত হইয়া পড়ে কিন্তু গঙ্গাজলে সে সকল দোষ লক্ষিত হয় না। গঙ্গাজল আপন প্রবাহ মধ্যে এরূপ স্বাস্থ্যকর পবিত্র পদার্থরাশি বহন করে, যে ইহার সংস্পর্শে প্লাবিত দেশ ও সংস্পৃষ্ট পাত্রও পবিত্র হইয়া যায়; অবগাহনে শরীর-ভারের লাঘব হয়, পানে দীপনত্ব ও রুচ্যত্ব লক্ষিত হয়, সম্যক্ সেবনে রোগী রোগমুক্ত হয় এবং পতিত অন্ত্যজ লোক দেবতুল্য হইয়া যায়, হীনজাতি সংস্পর্শে ইহার ভাবান্তর ও গুণান্তরের আশঙ্কা অন্তরে সমুদিত হয় না।

দ্বিতীয় গল্পটীও কৌতুকাবহ। একদা বিশেষ কার্য্যোপলক্ষ্যে নবদ্বীপের রাজবাটীতে বহুতর ব্রাহ্মণপণ্ডিত নিমন্ত্রিত। মুনিরাম প্রভৃতি রাঢ়দেশীয় কয়েক জন পণ্ডিতও তথায় উপস্থিত। নবদ্বীপের পণ্ডিতেরা রাজার নিকট অভিযোগ করিলেন,—রেঢ়ো পণ্ডিতেরা ময়রাদিগের প্রস্তুত করা মিঠাই আদি ভক্ষণ করিয়া থাকেন এবং শ্রাদ্ধাদি কার্য্যে খেজুরে গুড় দিয়া থাকেন, কাজেই উহাঁরা ভ্রষ্টাচার। অতএব প্রকৃত পণ্ডিতদিগের সহিত উহাঁরা বিদায় পাইবার অযোগ্য। এই বিষয়ের যাথাতথ্য জানিবার নিমিত্ত রাজা মুনিরামকে জিজ্ঞাসা করিলেন। মুনিরাম বলিলেন,—মহারাজ! আমাদের দেশে আমার এবং আমার ন্যায় পণ্ডিতদের আদৌ মিঠাই খাওয়া হয় না, কারণ তথায় কোন ব্রাহ্মণ কদাচ মিষ্টান্নের দোকান করে না। যদি কোথাও একটী ব্রাহ্মণের দোকান এবং তৎপার্শ্বে একটী ময়রার দোকান থাকে এবং কোন্ দোকানের মিঠাই লওয়া উচিত বলিয়া কেহ আমার ব্যবস্থা জিজ্ঞাসা করে, তবে আমি তাহাকে ময়রার দোকান হইতেই মিঠাই লইতে বলিব।

মিঠাইয়ের দোকান করা ব্রাহ্মণের কার্য্য নহে, যে ব্যক্তি ঐরূপ কার্য্য করে সে ব্রাহ্মণ নহে, সে অবশ্য পতিত। এরূপ পতিত ব্রাহ্মণ অপেক্ষা স্বধর্ম্ম-নিরত শুদ্ধাচার শূদ্রও অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ। আর খেজুরে গুড় অগ্রাহ্যীয় ইহা রাঢ়ের পণ্ডিতেরা জানেন না বলিয়া যে অভিযোগ হইল, তদ্বিষয়ে এই কথা বলিলেই বোধ হয় পর্য্যাপ্ত হইবে; খেজুরে গুড় শ্রাদ্ধাদিতে ব্যবহার করা দূরে থাকুক, খেজুর গাছ হইতে যে গুড় প্রস্তুত হয় এই কথা রাঢ়ের লোকেরা এপর্য্যন্ত অবগত নহে। এইরূপ উত্তরে রাজা সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া মুনিরামকেই সর্ব্বোচ্চ বিদায় দিলেন।

মুনিরামের নামে এইরূপ আরও অনেক গল্প প্রচলিত আছে। সকলগুলির মূলে প্রকৃত ঘটনা কি ছিল তাহা এক্ষণে নিশ্চয় করিয়া আমরা বলিতে পারি না। গল্পগুলি দ্বারা অন্ততঃ ইহা জানা যায় যে মুনিরাম একজন বহুদর্শী ও প্রতিভাশালী ব্যক্তি ছিলেন। কবিকুলচূড়ামণি কালিদাসও এইরূপ অনেক গল্পের নায়ক। এমন কি কত বাঙ্গালা প্রহেলিকার ভণিতিও তাঁহার নামে প্রচলিত। কালিদাসের কোনও গ্রন্থাদি না থাকিলেও এইগুলি দ্বারা তিনি যে একজন বিখ্যাত কবি ছিলেন তাহা অনুমান করা যাইত।

মুনিরামের ন্যায় তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা আত্মারাম বিদ্যালঙ্কার ও অযোধ্যারাম ন্যায়রত্নের সবিস্তর বিবরণ সংগ্রহে আমরা নিরাশ হইয়াছি। এইমাত্র জানা যায় যে মুনিরামের এবং তাঁহার সহোদরদিগের সময়ে অবসথী সর্ব্বেশ্বরের রাঢ়ীয় বংশমধ্যে শাকনাড়ার অধিবাসীরা পণ্ডিতপদবীতে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। সহোদরদিগের কথা দূরে থাকুক, বোধ হয় প্রতিভাশালী মুনিরামের কীর্ত্তিতে তৎসমকালীন রাঢ়ের অপর সকল পণ্ডিতই মলিনপ্রভ হইয়া পড়িয়াছিলেন। মুনিরামের কৃত কোন গ্রন্থ আমরা প্রাপ্ত হই নাই। ন্যায়সূত্র অবলম্বন করিয়া বহু যত্নে তিনি যে একখানি ন্যায়গ্রন্থ এবং কয়েকখানি স্মৃতিগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তৎসমুদায় অন্যান্য পুস্তকাবলির সহিত দামোদরের প্রবল বন্যায় এবং মারহাট্টাদের দৌরাত্ম্যে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছিল। মুনিরাম তিনটী পুত্র রাখিয়া লোকান্তরিত হয়েন। তখন তাঁহার বয়স ৮৫। ৮৬ বৎসর হইয়াছিল। তখন পর্য্যন্ত নিজ গ্রামে

তাঁহার পাঠনাকার্য্য অব্যাহতরূপে চলিতেছিল। কয়েক দিবস সামান্য জ্বরের পর একদিন অপরাহ্ন সময়ে অকস্মাৎ তাঁহার মূর্চ্ছা হয়। ছাত্র ও আত্মীয়গণ তাঁহার মৃত্যুকাল উপস্থিত বোধ করিয়া সসম্ভ্রমে তাঁহাকে প্রাঙ্গণে আনয়ন করে। পদতলে গর্ত্ত খনন ও তাহা গঙ্গাজলে পরিপূর্ণ করিয়া তাহাতে গুল্‌ফদ্বয় কেহ কেহ ডুবাইয়া ধরিল এবং কেহ কেহ মস্তকপ্রদেশে গঙ্গাজলের ঘট ও তুলসী গাছ রাখিয়া মুখে ও মস্তকে গঙ্গাজল সেচন করিতে লাগিল। সকলে উচ্চৈঃস্বরে দেবতাদের নাম শুনাইতে লাগিল। পূর্ব্ব ও দক্ষিণ দেশীয় কয়েকজন ছাত্র মস্তকের নিকট বসিয়া গঙ্গালাভ হইল, মুক্তির প্রার্থনা করুন, অবশ্য আপনার মোক্ষ প্রাপ্তি হইবে উল্লেখ করিতে করিতে তারস্বরে ঠাকুরদের নাম কীর্ত্তন করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে মুনিরামের মৃতকল্প দেহে চৈতন্য সঞ্চার হইল এবং তিনি অঙ্গুলি পরিচালন দ্বারা নীরব হইতে সকলকে সঙ্কেত করিলেন। ফলে তখন তাঁহার মৃত্যু হইল না। আরও কয়েকদিন তাঁহাকে জীবিত থাকিতে হইয়াছিল। এই সময়ে একদিন তিনি আপন আত্মীয় ও ছাত্রদিগকে ধীরে ধীরে বলিলেন—মৃত্যুসময়ে মুমূর্ষুকে টানাটানি করিয়া প্রান্তরে ফেলিও না ও চীৎকার রবে উদ্বেজিত করিও না। প্রশান্তভাবে তাহাকে মরিতে দেওয়া উচিত। তখন তাহার সমক্ষে গৃহাভ্যন্তর বা প্রান্তর সমান সন্দেহ নাই, কিন্তু নিজ গৃহে বন্ধুজনবেষ্টিত হইয়া মরিতেছে এইরূপ জ্ঞান থাকিলে চিত্তের শান্তি জন্মে। অস্তগমন মহা অবসাদের সময়। তখন সমুদয় শারীরিক ও মানসিক ব্যাপার একান্ত শিথিল, কেবল অভ্যন্তরে অনিলরাশির প্রবল গণ্ডগোল। উদান বায়ুর উৎক্রমণ চেষ্টা, কিন্তু তাহাকে অধোদিগে টানিয়া রাখিতে অপানের চেষ্টা। এমন সময়ে মুমূর্ষুকে উদ্বেজিত করা অবৈধ। কামনা করিলেই অথবা প্রতিনিধি দ্বারা উচ্চরবে দেবতানাম উচ্চারণ করাইলেই মুক্তিলাভ হয় না। দেবতাগণ বধির বলিয়া জানি না। উচ্চৈঃস্বরে দেবতাদিগকে আহ্বান করার প্রয়োজন দেখি না। আর যদি কামনাই থাকিল তবে মুক্তির প্রত্যাশা কোথায়? আমি এমত কোন কাজ করি নাই এবং এরূপ জ্ঞান অর্জ্জন করি নাই যে মোক্ষপদের অধিকারী হইতে পারি। এ পর্য্যন্ত বলবতী কর্ম্মপ্রবৃত্তি দ্বারা প্রেরিত হইয়া ঐহিক কামনায় মত্ত ছিলাম;

স্বার্থত্যাগ, অভিমানপরিহার অভ্যাস করিতে পারি নাই; অদ্যাপি মায়ার ঘোর সম্পূর্ণরূপে কাটে নাই. জ্ঞানের উজ্জ্বল বিকাশ অথবা পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সংস্কারের ফল বা কোন সাধনাবল দেখিতে পাই নাই; আমি জ্ঞানী কি কর্ম্মীরূপে পরিগণিত হইব বুঝিতে পারি নাই। জ্ঞানবিশেষের সাক্ষাৎকার মুক্তির কারণ; সেই জ্ঞানবিশেষের স্ফূর্ত্তি না হইলে মনুষ্য উন্নত পদ পায় না। কাজেই আমার পুনরাবর্ত্তন অনিবার্য্য; সম্মুখে অনন্ত ভবিষ্যৎ দেখিতেছি, অতীতের ইয়ত্তা কে জানে? শুভাকাঙ্ক্ষা থাকিলে সকলে একমনে এই প্রার্থনা করিও আমি যেন কোন পবিত্র ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিতে পারি, ও এইরূপ শাস্ত্রের আলোচনা ও অধ্যাপনা করিতে এবং শেষ দিন পর্য্যন্ত সকলকে জ্ঞানশিক্ষা দিতে সমর্থ হই।

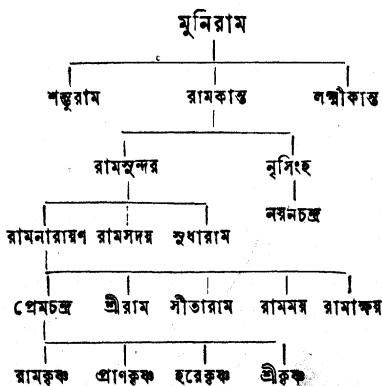
শুনিতে পাই একদিন অপরাহ্নে এইরূপ কথা কহিতে কহিতে মুনিরাম নীরব হয়েন। নিদ্রাবেশ হইল বলিয়া সকলে ভাবিলেন কিন্তু সেই নিদ্রাই দীর্ঘনিদ্রা রূপে পরিণত হইল, আর জাগিলেন না। মুখমণ্ডলে মৃত্যুযন্ত্রণার কোন চিহ্ন লক্ষিত হইল না।

সারবান্ প্রায় বাহ্যাড়ম্বর-শূন্য। জগতে কত শত সারাল পদার্থ অন্যের অজ্ঞাতসারে সময়স্রোতে পতিত ও বিলুপ্ত হয়। বৃদ্ধপরম্পরাগত কতকগুলি প্রবাদ ভিন্ন এই জ্ঞানরাশি মুনিরামের অন্য কোন চিহ্নই নাই।

মুনিরামের মৃতদেহ নিজকৃত পুষ্করিণীর পাড়ে ভস্মীভূত হয়। ঐ সঙ্গে তাঁহার পত্নী সহমৃতা হয়েন। ইহাতে পূর্ব্বকথিত তন্তুবায়-কন্যার ভবিষ্যৎ বাক্য সুসিদ্ধ হয়। সেই অবধি মুনিরামের পুষ্করিণীটী "সতীর পুকুর" বলিয়া বিখ্যাত ছিল। তর্কবাগীশের জীবনসময়ে পুষ্করিণীটীর পুনঃসংস্কার হয়। চতুর্দ্দিকে যে সকল ফলবান্ বৃক্ষ রোপিত হইয়াছিল তাহা ক্রমে পল্লবিত ও ফলিত হইয়া এক্ষণে গ্রামের শোভা সম্পাদন করিয়াছে। লালগঞ্জ নামে যে গ্রামখানির কথা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা শাকনাড়ার অতি সন্নিহিত উত্তর পশ্চিম কোণে সন্নিবেশিত ছিল, এক্ষণে একবারে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। মুনিরামের সময়ে ইহা অতি সমৃদ্ধিশালী ছিল। সমৃদ্ধি দেখিয়া পিণ্ডারীরা এই গ্রাম উপর্য্যুপরি দুইবার আক্রমণ ও লুণ্ঠন করে। এই প্রদেশে পিণ্ডারীদিগকে বর্গী বলিয়া কহিত। বর্গীরা অশ্বারোহণে

অকস্মাৎ আসিয়া লালগঞ্জের ধনশালী তন্তুবায় এবং বণিক্‌দিগের উপর আক্রমণ করিত। এই অবকাশে শাকনাড়ার অধিবাসীরা আপন আপন ধনসম্পত্তি ও প্রাণ লইয়া গ্রামের দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত পূর্ব্বকথিত তালানামক পুষ্করিণীর উচ্চ পাড়ের অন্তরালে গিয়া লুকাইত এবং অত্যাচার-কারীদের গন্তব্যমার্গে লক্ষ্য রাখিত। লালগঞ্জের রাজা ও খাঁ উপাধি-ধারী তন্তুবায়দিগের নির্ম্মিত রাজখাঁপুকুর নামে একটী পুষ্করিণীমাত্র এক্ষণে বর্ত্তমান। বাস্তব্য ভূমিসকল কৃষকের হল দ্বারা বিদারিত ও রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছে।

মুনিরাম আপন পুত্রগণ মধ্যে শম্ভুরামকে সস্নেহ নয়নে দেখিতেন না। শম্ভুরাম জড়প্রকৃতি ছিলেন এবং কনিষ্ঠ সহোদর রামকান্ত ও লক্ষ্মীকান্তের ন্যায় শাস্ত্রাভ্যাসে যত্নশীল ছিলেন না। কালক্রমে রামকান্ত অতি শান্ত শিষ্ট ও স্থিরবুদ্ধি এবং লক্ষ্মীকান্ত অতি তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন এবং চতুর ও দাম্ভিক হইয়া উঠিয়াছিলেন। নিম্নলিখিত চিত্রে মুনিরামের বংশাবলী প্রকাশিত হইল।



উপরিলিখিত বংশাবলীতে প্রেমচন্দ্রের পূর্ব্বে যাঁহাদের নাম লিখিত হইল, তাঁহাদের মধ্যে নৃসিংহ ব্যতীত আর কেহই প্রকৃত পণ্ডিত বলিয়া

প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারেন নাই। রামকান্ত ও তাঁহার পুত্র রামসুন্দর সংস্কৃত জানিতেন, লক্ষ্মীকান্তও নানা শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন এবং ব্রাহ্মণ্যানুষ্ঠানে তৎপর ছিলেন; কিন্তু ইহাঁরা কেহ পণ্ডিত বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন এরূপ জানা যায় না। রামকান্তের দ্বিতীয় পুত্র নৃসিংহ তর্কপঞ্চানন একজন বড় পণ্ডিত হইয়াছিলেন। নৃসিংহ প্রথমতঃ স্বদেশে ব্যাকরণ এবং স্মৃতি পাঠ করিয়া কাশীতে ৭।৮ বৎসর সাংখ্য, বেদান্ত এবং জ্যোতিষশাস্ত্রের অধ্যয়ন করেন। স্বদেশে আসিয়া শাকনাড়ার উত্তর পশ্চিমে ন্যূনাধিক আড়াই ক্রোশ দূরে বল্লা নামক গ্রামে টোল স্থাপন করেন। এই নৃসিংহই প্রেমচন্দ্রের জীবনপ্রবন্ধের প্রথম সমালোচক, তাঁহার প্রথম গুণগায়ক, প্রথম শিক্ষক এবং ভাবী উন্নতির পথদর্শক। প্রেমচন্দ্রের জন্মগ্রহণের পূর্ব্বে নৃসিংহের বিলক্ষণ ভাবান্তর লক্ষিত হইয়াছিল। প্রেমচন্দ্রের পিতৃপিতামহের সঙ্গে নৃসিংহ ও তদ্বংশীয়দিগের এক উৎকট জ্ঞাতিবিরোধ জন্মিয়াছিল। নৃসিংহ বিদ্বান্ হইলেও কলহ আদি আসুরিক ভাবের বশীভূত ও বৈর-নির্য্যাতনে সতত তৎপর ছিলেন। তিনি আপন সহোদর ভ্রাতা রামসুন্দরকে নানাপ্রকারে অতিশয় উদ্বেজিত করিয়াছিলেন। রামসুন্দরের মৃত্যু হইলেও এই বিরোধের অবসান হয় নাই। তাঁহার প্রথম পুত্র রামনারায়ণকে প্রথমে তিনি ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন, এমন কি, নৃসিংহ ও রামনারায়ণ বহুদিন পরস্পরের মুখ দর্শন করেন নাই। রামনারায়ণ অল্প বয়সেই পিতৃহীন হয়েন। সংসারের ভার মস্তকে পড়ায় নিজের জ্ঞানশিক্ষায় তাঁহাকে একবারে জলাঞ্জলি দিতে হয়। যৌবনের প্রারম্ভে আবার তাঁহাকে প্রথম পত্নীর বিয়োগযাতনা সহ্য করিতে হয়। তাঁহার প্রথম পত্নী সন্তান প্রসবকালের পূর্ব্বেই কালগ্রাসে পতিত হয়েন। তৎপরে তিনি শাকনাড়ার প্রায় সাত ক্রোশ পশ্চিমে রঘুবাটী গ্রামে দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন। তাঁহার এই দ্বিতীয় পত্নী লোকান্তরিতা প্রথম পত্নীর ন্যায় রূপলাবণ্যবতী ছিলেন না। এই সকল অশুভ ঘটনাপরম্পরা দেখিয়া রামসুন্দরের বংশীয়দের অধঃপতন হইতেছে বলিয়া নৃসিংহ অনুমান করিয়াছিলেন। উভয় বংশীয়দিগের বাটীর মধ্যে একটী লম্বা প্রাচীর ছিল। রামকান্তের বংশীয়েরা পশ্চিমের খণ্ডে এবং নৃসিংহ ও তাঁহার বংশীয়েরা পূর্ব্বদিগের

প্রকোষ্ঠে বাস করিতেন। রামনারায়ণের দ্বিতীয় পত্নীর প্রথম প্রসব সময় উপস্থিত হইলে প্রসব-ফল দেখিয়া ঐ বংশীয়দের উন্নতি বা অধোগতির বিষয়ে সিদ্ধান্ত করিবেন বলিয়া নৃসিংহ সায়ংকাল অবধি তাঁবি-যন্ত্র পাতিয়া প্রস্তুত হইয়া বসিয়া রহিলেন। রাত্রি ৪।৫ দণ্ড মধ্যে একটী পুত্রসন্তান জন্মিল এই কথা শুনিতে পাইয়া নৃসিংহ তৎক্ষণাৎ গণনা করিতে বসিলেন এবং লগ্ন নিরূপণ করিয়া এ বংশে যে এক মহাপুরুষ জন্মিল এই কথা বলিয়া উঠিলেন। পরক্ষণেই নৃসিংহ রামনারায়ণের নিকটে আসিয়া সস্নেহে কহিলেন, আমাদের বংশে তোমার পুত্ররূপে দ্বিতীয় কালিদাস জন্ম গ্রহণ করিল। অদ্য হইতে তোমার সহিত আমার সমুদায় বিরোধের বিশ্রাম হইল। ইহার পর নৃসিংহ যত দিন জীবিত ছিলেন ততদিন তাঁহাদের পরস্পর বিরোধ সত্য সত্যই একবারে প্রশান্ত ছিল। ধন্য! প্রেমময় প্রেমচন্দ্র! তুমি জন্মিয়াই প্রেমশৃঙ্খলে চিরশত্রুকেও সমাকর্ষণ, পিতার অন্তরে শান্তিবারিবর্ষণ এবং বংশে সন্ধি সংস্থাপন করিলে!

নৃসিংহের লোকান্তর গমনের কিছু দিন পরেই উভয় বংশীয়দের পূর্ব্বপ্রীতিভাব তিরোহিত হয়। নৃসিংহের পুত্র নয়নচন্দ্র পূর্ব্বতন জ্ঞাতিবিরোধ পুনর্ব্বার জাগাইয়া তুলেন। নয়নচন্দ্র পিতার মত বিদ্বান্ বলিয়া প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারেন নাই, কিন্তু পিতা অপেক্ষা সমধিক তেজস্বী ও দাম্ভিক ছিলেন। তন্ত্রশাস্ত্রে তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। বিরোধ, প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও মোকদ্দমাপ্রিয়তা বশতঃ তাঁহাকে নিয়ত ব্যস্ত থাকিতে হইত। ইহা না হইলে নয়নচন্দ্র তান্ত্রিক সমাজে একটী উচ্চ স্থান লাভ করিতে পারিতেন। নয়নচন্দ্র কয়েক বৎসর রামনারায়ণকে বড় ব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে রামনারায়ণ পিতামহ রামকান্তের অলৌকিক গম্ভীরতা, সহিষ্ণুতা এবং উদারতাদি কতকগুলি গুণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই সকল গুণেই তিনি নয়নচন্দ্রকে প্রায় নিরস্ত করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ যখন নয়নচন্দ্র অত্যাচার আরম্ভ করিলেন, তখন রামনারায়ণ সহায় সম্পত্তিসম্বন্ধে নিতান্ত দুর্ব্বল ছিলেন না। তখন তাঁহার মধ্যম সহোদর রামসদয় দ্বিতীয় ভীম অবতাররূপে পরিণত হইয়া উঠিয়াছিলেন। নয়নচন্দ্র রামসদয়কে বড় ভয় করিতেন। এই স্থলে রামসদয় সম্বন্ধে কয়েকটী কথা না বলিয়া আমরা

ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। রামসদয় প্রায় নিরক্ষর থাকিলেও উন্নতমনা একটী শূর ছিলেন। তিনি কোন প্রবল পক্ষের অত্যাচার সহ্য করিতে পারিতেন না। জ্যেষ্ঠ রামনারায়ণের ন্যায় তিনি ন্যায়পর বাক্যবিন্যাস করিয়া বিরোধ নিষ্পত্তি করিতেন না। একবারে স্বদেহ অপেক্ষা দীর্ঘতর বংশনির্ম্মিত লাঠি বাহির করিয়া সকল কাজ অল্প ক্ষণেই নিষ্পন্ন করিতেন। গ্রামে কোন হাঙ্গামা উপস্থিত হইলে রামসদয় লাঠি হাতে এক পক্ষের শিরোভাগে দণ্ডায়মান থাকিবেন ইহা নিশ্চিত ছিল। কৃষিকার্য্যের নিমিত্ত সংগৃহীত জল লইবার নিমিত্ত বিভিন্ন গ্রামের বহুতর লোক সমবেত হইয়া গভীর রাত্রিকালে শাকনাড়ার খালের বাঁধ বলপূর্ব্বক কাটাইতেছে শুনিয়া রামসদয় লাঠি হাতে মহানিনাদে অকস্মাৎ উপস্থিত। তাঁহার সেই রুদ্র-মূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া শত শত লোক প্রাণভয়ে চতুর্দ্দিকে পলাইত। কখন কখন উহাদের আনীত কোদাল আদি অস্ত্র শস্ত্র পড়িয়া থাকিত। পরে প্রধান প্রধান লোকেরা কখন কখন আসিয়া প্রণিপাত পূর্ব্বক তাহাদের পরিশুষ্ক শস্যক্ষেত্রের নিমিত্ত সত্যসত্যই জলের প্রয়োজন বলিয়া জানাইলে রামসদয় সদয়ান্তঃকরণে প্রচুর জল ছাড়িয়া দিতেন, এবং ঐ জল দ্বারা প্রত্যেক ব্যক্তির কতদূর উপকার সাধন হইল স্বয়ং ক্ষেত্রে গিয়া তাহার তত্ত্বাবধান করিতেন। ফলতঃ বল রামসদয়ের নিকট দুর্ব্বল হইত। বিনয়ে তাঁহার নিকটে কার্য্যসিদ্ধি হইত।

এই সময়ে রায়না থানার এলাকায় ডাকাইতের অতিশয় প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। বুনো শ্যামা, পেড়ো শ্যামা, রামা ও নিধে বাগ্‌দি প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ডাকাইতেরা মধ্যে মধ্যে আসিয়া রামনারায়ণকে ভয় প্রদর্শন করিত এবং বক্‌সিস বলিয়া কিছু কিছু লইয়া যাইত। এক সময়ে তাহারা আসিয়া বাহির বাটীতে কয়েকখানা শাড়ীকাপড় শুকাইতেছে দেখিয়া বলিল,—"ভট্টাচার্য্য মহাশয়! আজকাল বাড়ীতে কলিকাতার আমদানি যে ভাল ভাল শাড়ী দেখছি।" রামনারায়ণ এই সঙ্কেত গ্রহণ করিয়া রাত্রিকালে আসিয়া পাছে অপহরণ করে এই ভয়ে শাড়ী কয়েকখানা তুলিয়া ডাকাইতদিগকে প্রদান করিলেন। শাড়ী লইয়া বিদায় হইবার সময়ে রামসদয় বাটীতে ছিলেন না। পরে এই কথা শুনিয়া রাগে গস্ গস্

করিতে লাগিলেন এবং ডাকাইতের শ্রাদ্ধ করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন। রামসদয় প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করিবার পাত্র ছিলেন না। কিছুদিন পরে ডাকাইতেরা আবার কিছু লইবার অভিপ্রায়ে বেড়াইতে আসিলে রামসদয় তাঁহার দীর্ঘ লাঠি বাহির করিয়া একবারে তাহাদিগকে বিলক্ষণ প্রহার দিলেন। "নারায়ণের শাড়ী ও সদয়ের বাড়ী" ইহার মধ্যে কি ভাল লাগে জিজ্ঞাসা করিলেন। দুই দুই ব্যক্তির গ্রীবা ধরিয়া মহা সমারোহে মাথা ঠোকাঠুকি করিয়া দিলেন, এবং তিনি জীবিত থাকিতে শাকনাড়ার সীমানা দিয়া যাতায়াত না করে এই বিষয়ে কালীঠাকুরাণীর শপথ করাইয়া ছাড়িয়া দিলেন। রামসদয়ের এইরূপ শাসন নিষ্ফল হইত না, চতুষ্পার্শ্বের দুর্দ্দান্ত লোকেরা তাঁহার ভয়ে সর্ব্বদা শঙ্কিত ও জড়সড় থাকিত।

রামসদয় নিয়ত অত্যাচারী নয়নচন্দ্রকে একবারে মারিয়াই ফেলিতেন কিন্তু বৃকোদর যেরূপ যুধিষ্ঠিরের প্রতিজ্ঞা প্রতীক্ষা করিয়া দুর্য্যোধনের অত্যাচার সহ্য করিতেন, জ্যেষ্ঠের আদেশ রামসদয়ের পক্ষে সেইরূপ অমুল্লঙ্ঘনীয় ছিল।

প্রেমচন্দ্রের পিতামাতার বিষয়ে বিশেষ করিয়া আমরা কিছু বলি নাই। এই স্থানে দুই চারি কথা বলিতে ইচ্ছা করি।

প্রেমচন্দ্র আপন গ্রন্থ সকলে পিতার পরিচয় দিবার নিমিত্ত যেখানে যাহা লিখিয়াছেন প্রথমতঃ তাহাই উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

নৈষধের টীকার শেষে—

"রাঢ়ে গাঢ়প্রতিষ্ঠঃ প্রথিতপৃথুযশাঃ শাকরাঢ়ানিবাসী
বিপ্রঃ শ্রীরামনারায়ণ ইতি বিদিতঃ সত্যবাক্ সংযতাত্মা"।

রাঘবপাণ্ডবীয় টীকার প্রথমে প্রথমতঃ অবসথীদিগের আদি পুরুষ সর্ব্বেশ্বরের পরিচয় দিয়া—

"তদন্বয়সুধাম্বুধেরজনি রামনারায়ণঃ
শশীব বিমলান্তরো দ্বিজবরঃ শ্রিয়া ভাস্বরঃ।
যদীয়গুণচন্দ্রিকোল্লসিতরাঢ়নীরাশয়ে
সতাং হৃদয়কৈরবং কলিতগৌরবং মোদতে॥"

কাব্যাদর্শের টীকার শেষে—

"উৎকর্ষো কশ্যপর্ষের্বলবলিজয়িনোর্জন্মনোজ্জৃম্ভিতশ্রী-
র্বংশো বিশ্বাবতংসোঽবসথিকুলমিতশ্চামলং প্রাদুরাসীৎ।
এতস্মান্মধ্যরাঢ়াবিততগুণগণো গ্রামণীঃ সজ্জনানাং
সম্ভূতো রামনারায়ণধরণিসুরঃ শাকরাঢ়ানিবাসী॥"

তর্কবাগীশ এইরূপে আপন পিতাকে "সত্যবাক্ সংযতাত্মা, শশীর ন্যায় বিমলান্তর, সুন্দরমূর্ত্তি, এবং সজ্জনগণের অগ্রণী" ইত্যাদি বিশেষণে বিভূষিত করিয়াছেন। পিতার প্রতি কেবল ভক্তি দেখাইবার ইচ্ছায় অথবা কেবল কতকগুলি অনুপ্রাসযুক্ত শব্দ প্রয়োগ করিয়া কবিতা পূরণ করিবার মানসে তিনি এইরূপ লিখিয়াছেন ইহা যেন কোন পাঠক মনে না করেন। তাঁহার পিতা বাস্তবিক এই সকল গুণের আধার ছিলেন। এই সকল বিশেষণ দ্বারা তাঁহার স্বরূপবর্ণন ব্যতীত আর কিছুই হয় নাই। পাঠক দেখিবেন,—তর্কবাগীশ পিতাকে বড় বিদ্বান্ বা পণ্ডিত বলিয়া কোন স্থানে নির্দ্দেশ করেন নাই। অল্পবয়সে পিতৃহীন হওয়ায় তাঁহার পিতার পড়াশুনার ব্যাঘাত ঘটিয়াছিল পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। কিন্তু কৃত্রিম সংস্কার ব্যতিরেকেও কেবল স্বভাবের গুণে মনুষ্য কতদূর উন্নত হইতে পারে, রামনারায়ণ তাহার একটী প্রধান আদর্শস্থল। তিনি কখন ক্রোধে বিচলিত হইয়াছেন এরূপ দেখা যায় নাই। কোন ব্যক্তির প্রতি অতিশয় বিরক্ত হইয়া তিরস্কার করিতে বসিলে "রাখাল" এই শব্দ অপেক্ষা কোন কর্কশ ও মর্ম্মভেদী বাক্য প্রয়োগ করেন নাই। সত্যনিষ্ঠা ও অঙ্গীকৃত কার্য্যের অনুষ্ঠানই ধর্ম্ম, এবং প্রতিজ্ঞাভঙ্গই পাপ বলিয়া তিনি নিয়ত নির্দ্দেশ করিতেন। পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসকলের ছোট বড় লোকের এরূপ বিশ্বাসভাজন ছিলেন যে গভীর রাত্রিকালে লোকে কোন প্রকার বিপদের আশঙ্কা করিয়া বহুমূল্য দ্রব্য-সামগ্রী গোপনে তাঁহার নিকটে গচ্ছিত রাখিয়া যাইত, লেখাপড়া বা সাক্ষী-সাবুদ থাকিত না।

তর্কবাগীশ পিতার যেরূপ বর্ণন করিয়াছেন তাহাতে অত্যুক্তি দোষ দূরে থাকুক্ বরং তাঁহার একটী মহৎ গুণের বিশদরূপ উল্লেখ না দেখিয়া আমরা

বড় বিস্মিত হইয়াছি। রাঢ়মধ্যে কেহ রামনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের মত আতিথেয় ছিলেন কি আমরা জানি না। তাঁহার নিজ পরিবারবর্গের ভরণপোষণ বড় স্বচ্ছলভাবে চলিত না, কিন্তু যদি একদিন তাঁহার গৃহে অতিথি না আসিত তবে তাঁহার ব্যাকুলতার পরিসীমা থাকিত না। "কেন আজ অতিথি আসিল না" বলিয়া রাস্তার ধারে গিয়া তিনি চতুর্দ্দিকে অতিথির অন্বেষণ করিতেন। তাঁহার গৃহে প্রায় অতিথির অভাবও থাকিত না। দুর্দ্দিন আদি নিবন্ধন কোন দিন কোন অতিথি না আসিলে সায়ংকালে গ্রামের কোন দরিদ্রকে ডাকাইয়া অন্ন দান করা তাঁহার নিয়মিত কর্ম্ম ছিল। ইহা না করিলে তিনি সায়ন্তন সময়ের সন্ধ্যাবন্দনাদি করিতে যাইতেন না।

গ্রামের নিকটে এক স্থানে বহুকাল হইতে সপ্তাহে দুইবার হাট বসিয়া থাকে। এই হাটের দিন এবং বর্ষাকালে নিকটবর্ত্তী খালটী জলে পরিপূর্ণ হইলে পারাপারের অসুবিধা হেতু লোকে রামনারায়ণের বাটীতে আসিয়া আশ্রয় লইত। এক এক সময়ে এত বেশী লোক আসিত, যে গৃহে স্থানাভাব জন্য গৃহস্থের বিলক্ষণ কষ্ট হইত। সন্তানদিগের উপার্জ্জনের পূর্ব্বে নিজ পরিবারবর্গের ভরণপোষণ এবং নিজের অপরিহরণীয় অতিথিসৎকারের ব্যয় নিমিত্ত রামনারায়ণের তিনটী উপায় ছিল। প্রথম—পিতৃ-পিতামহ-ক্রমাগত কিঞ্চিৎ নাখেরাজ ভূমি, দ্বিতীয়—চাষ, এবং তৃতীয়—মুনিরাম বিদ্যাবাগীশের সময়ে প্রতিষ্ঠিত নিকটবর্ত্তী ৫।৭ খানি গ্রামের সভাপণ্ডিতি বৃত্তি। এই সকল গ্রামের কাহারও বাটীতে বিবাহ আদি শুভকার্য্য হইলে মুনিরামের বংশীয়েরা সভাপণ্ডিত ভাবে কিছু কিছু বিদায় পাইতেন। তৎকালে হিন্দু সামাজিক নিয়ম প্রবল থাকায় ইহাতে মন্দ আয় হইত না। রামনারায়ণের আয় অধিক না থাকিলেও তাঁহার সাংসারিক ব্যয়ের ব্যবস্থা অতি উৎকৃষ্ট ছিল। তাঁহার দ্বিতীয় পত্নী প্রেমচন্দ্রের গর্ভধারিণী সাক্ষাৎ লক্ষ্মী ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সমস্ত সাংসারিক ব্যাপার তাঁহার হস্তে ন্যস্ত ছিল। সকল বিষয়েই তাঁহার এরূপ উৎকৃষ্ট বন্দোবস্ত এবং যথাসময়ে সঞ্চয় করা ও যথাস্থানে জিনিসপত্র সাজাইবার এরূপ শৃঙ্খলা ছিল যে তাহা সময়ে সময়ে স্বয়ং রামনারায়ণেরও অসীম বিস্ময় জন্মাইত। তাহা

এখনকার পাঠককে সম্যক্‌রূপে বুঝান সহজ নহে। এই গৃহলক্ষ্মীর কয়েকখানি গৃহমধ্যে বিলাসিতার উপযোগী উপকরণসামগ্রী থাকত না সত্য, কিন্তু পল্লীগ্রামের ভদ্র গৃহস্থের সাংসারিক ব্যাপারের উপযোগী কোন দ্রব্যের কখন অভাব থাকিত না। আলস্য ও অপব্যয় তিনি জানিতেন না। তিনি একাকিনী শত শত লোকের নিমিত্ত অন্ন ব্যঞ্জন অল্পক্ষণেই প্রস্তুত করিয়া দিতে পারিতেন। অনেকবার এরূপ ঘটিয়াছে, যে, গৃহস্থের আহারাদির পরে রাত্রিকালে একদল আগন্তুক উপস্থিত। তাহাদের সৎকারের নিমিত্ত রামনারায়ণ স্বয়ং গৃহিণীর সাহায্যার্থে ভাণ্ডারের যেখানে যাহা ছিল তাহা বাহির করিয়া দিয়াছেন। তাহাদের আহার সামগ্রী বিতরিত হইতেছে, এমন সময়ে আর একদল অধিকসংখ্যক লোক সমাগত। রাত্রি অধিক হইয়াছে। ঝম্ ঝম্ বৃষ্টি পড়িতেছে। পরিজন ও ভৃত্যগণ নিদ্রায় কাতর। এত লোকের আহার সামগ্রী আর ঘরে নাই ভাবিয়া রামনারায়ণ খিদ্যমান। গৃহিণী বলিলেন,—এতগুলি লোক অভুক্ত থাকিলে গৃহস্থের অমঙ্গল ;—আসন আদি দিয়া আগন্তুকদিগের অভ্যর্থনা করা হউক, আর কোন চিন্তা নাই, কেবল কাষ্ঠের অভাব দেখিতেছি। ইহা শুনিয়া রামনারায়ণ তখনি ঘরের কাষ্ঠের খুটি উপড়াইয়া স্বহস্তে ছেদন করিলেন। গৃহিণী এ ঘর সে ঘরের গোপনীয় স্থান হইতে হাঁড়ি হাঁড়ি তণ্ডুল আদি বাহির করিয়া অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া দিলেন। রামনারায়ণ অতিথিসৎকার করিয়া মহা তৃপ্তি লাভ করিলেন। ধর্ম্মপরায়ণ স্বামীর এবং অভুক্তদিগের তৃপ্তির নিমিত্ত ভক্তিভরে স্নেহমাখা সরল অন্তরে সেই গৃহিণী সামান্য বস্তুতে যাহা কিছু ভোজনসামগ্রী প্রস্তুত করিয়া দিতেন তাহাই সকলেয় উপাদেয় বোধ হইত। এই বংশীয় ইদানীন্তনদিগের নিয়োজিত পাচক পাচিকাদের পাকা মসলা মাখা ঘিয়ে ছাকা জিনিসেও আর সেরূপ মধুর আস্বাদ পাওয়া যায় না।

একদা গ্রীষ্ম সময়ে পশ্চিদেশীয় একদল অতিথি আইসে। সঙ্গে ৬৩ জন লোক, কতকগুলি পাষাণময় ঠাকুর এবং ৮টী ঘোটক ছিল। ঘোটকপৃষ্ঠে বড় বড় পিতলের হাঁড়া এবং কতকগুলি গাঁঠ্‌রি ছিল। লোকমধ্যে ১০।১১ জন অস্ত্রধারী। দলপতি অতি দীর্ঘাকার ও তাহার মস্তকে প্রকাণ্ড

জটাভার; তিনি প্রায় মৌনী অথবা মিতভাষী। আতিথ্য করিয়া থাকে শুনিয়া আসিয়াছে, সমস্ত লোকের ভোজনসামগ্রী আতপ চাউল ঘৃত আদি দিতে সমর্থ কি না বলিয়া কয়েক জন অস্ত্রধারী পুরুষ প্রথমে আসিয়া রামনারায়ণকে জিজ্ঞাসা করিল। তিনি "স্বাগত" বলিয়া সকলের অভ্যর্থনা করিলেন। গোলা হইতে ধান্য বাহির করাইয়া গ্রামের কয়েকজনের বাটী হইতে অল্প সময় মধ্যে আতপ চাউল প্রস্তুত করাইয়া লইলেন। এবং অন্যান্য সামগ্রীর আয়োজন করাইয়া অতিথিগণের সৎকার করিলেন। দিবাবসানে উহাদের ভোজনের পূর্ব্বে স্বয়ং জলস্পর্শ করিলেন না। সন্ধ্যার সময়ে ঠাকুরদের আরতি উপলক্ষ্যে অতিথিগণের আনীত তুরী, ভেরী, শাঁক, শিঙ্গা, কাঁসর, ঘড়ী প্রভৃতির তুমুল শব্দ সমুত্থিত হইল। পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম-সকলের বৃহত্তর লোক কৌতূহল বশতঃ আসিয়া জুটিল। উহাদের মধ্যে বিজ্ঞ ও বৃদ্ধেরা অতিথিদের অস্ত্র শস্ত্র ও রঙ্গ ভঙ্গ দেখিয়া উহারা ডাকাইত বা ঠগ্ বলিয়া অবধারণ করিল এবং রাত্রিকালে বাটী লুট তরাজ করিবে ভাবিয়া রামনারায়ণকে সাবধান করিতে লাগিল। বহুমূল্য দ্রব্যাদি গোপনে আপন আপন বাটীতে লইয়া রাখিবে বলিয়া কেহ কেহ বেশি আত্মীয়তা দেখাইতে লাগিল। রামনারায়ণ ব্রাহ্মণীর নিকটে এই বৃত্তান্ত জানাইলেন। ব্রাহ্মণী বলিলেন,—তোমার শরীর ও জীবন অপেক্ষা বহুমূল্য সামগ্রী ঘরে নাই;—অতিথিরা থাকিতে থাকিতে তোমাকে ত স্থানান্তরিত করা দুষ্কর; যে কয়েকখানা সামান্য অলঙ্কার স্ত্রীলোকদের গায়ে আছে, তাহা রাত্রি-কালে খুলিয়া লওয়া অমঙ্গলজনক এবং ঘর লুটপাট বা অত্যাচার করা কখন অতিথিসৎকারের পুরস্কার হইতে পারে না, এই আমার বিশ্বাস। ইহা শুনিয়া রামনারায়ণ আশ্বস্তচিত্তে বাহির বাটীতে আসিলেন এবং বৃদ্ধমণ্ডলীকে ধন্যবাদ দিয়া বিদায় দিলেন। অনেকে বাটী গেলেন না। অতিথিদের কার্য্য দেখিবার নিমিত্ত গ্রামের এখানে সেখানে থাকিলেন। রাত্রি গভীর হইলে জটাধারী দলপতির সঙ্কেত অনুসারে অস্ত্রধারীরা বাটীর বাহিরে এখানে সেখানে পাহারা দিতে লাগিল এবং বিশ্রাম করিবার নিমিত্ত রামনারায়ণের প্রতি আদেশ করিল। ইহা দেখিয়া ভয়াকুল প্রতিবেশীরা লুটতরাজের যোগাড় হইতেছে বলিয়া সিদ্ধান্ত করিল, কিন্তু গৃহস্থ সুখে—রাত্রি অতি-

বাহিত করিল। প্রভাতে অতিথিদলের প্রত্যেক ব্যক্তি রামনারায়ণের নিকটে কৃতজ্ঞতা প্রকাশিয়া বিদায় গ্রহণ করিল। দলপতি মুখে কিছু বলিলেন না কিন্তু করদ্বয়ের উত্তোলন এবং সঞ্চালনবিশেষ দ্বারা তাঁহার শুভাকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিলেন। রামনারায়ণের অন্তর আনন্দে পুলকিত হইল।

কালক্রমে জ্যেষ্ঠ এবং মধ্যম পুত্রের উপার্জ্জিত অর্থের আনুকূল্য পাইয়া রামনারায়ণ কয়েক বৎসর ইচ্ছামত অতিথিসৎকার করিয়া মহা আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন। শেষাবস্থায় অতিথি উপস্থিত হইলে তাহার সমুদায় তত্ত্বাবধান কার্য্য স্বয়ং করিতে পারিতেন না, কিন্তু প্রতিদিন কয়জন অতিথি লাভ হইয়াছে তাহা জানিবার নিমিত্ত সায়ংকালে আহারের স্থানগুলি স্বয়ং গণনা করিতেন পরে সন্ধ্যাবন্দনাদি করিতে বসিতেন। তাঁহার আদেশ অনুসারে প্রত্যেক অতিথিকে পৃথক্ পৃথক্ স্থানে আহারসামগ্রী দেওয়া হইত। এক অতিথির উচ্ছিষ্ট পাত্রাদি পরিষ্কার করিয়া ঐ স্থানে আর এক ব্যক্তিকে খাইতে দেওয়া নিষেধ ছিল। সন্ধ্যাসময়ে ঐ স্থানগুলি স্বয়ং গণনা করিয়া তৃপ্তিলাভ করিতেন।

রামনারায়ণের দ্বিতীয় পত্নীর গর্ভে প্রেমচন্দ্রের পরে উপর্য্যুপরি ৩টী কন্যা তৎপরে ৪টী পুত্রের জন্ম হয়। সন ১২৫৮ সালের কার্ত্তিক মাসে চিকিৎসার নিমিত্ত প্রেমচন্দ্রের মাতাকে কলিকাতায় আনিতে হয়। শাকনাড়া হইতে আসিবার সময়ে অন্দরবাটীর বহির্দ্বারে প্রেমচন্দ্রের মাতা প্রেমচন্দ্রের পত্নীর দুইটী হাত ধরিয়া বলেন,—মা! আমি গঙ্গাতীরে চলিলাম; ফিরিয়া আসিব এমন মনে লয় না, দিবার উপযুক্ত আমার কোন সামগ্রী নাই; এই উপদেশটী দিয়া যাই; আমার অনুপস্থিতিতে তুমি বাড়ীর গৃহিণী; তুমি সকলের শেষে আহার করিও; খাইতে বসিতেছ এমন সময়ে অতিথি আসিল বলিয়া যদি শুনিতে পাও তবে নিজে না খাইয়া অন্নগুলি অতিথির নিমিত্ত পাঠাইয়া দিও; তোমার ছোট যা-দিগকে এইরূপ করিতে শিখাইয়া দিও; দেখ মা! যেন অতিথি বিমুখ হইয়া না যায়।

ধন্য গৃহিণী! ধন্য উপদেশ! ধন্য তোমার পবিত্র ভারার্পণ! তোমার

পুণ্যে ও প্রসাদে সংসারে অন্নের অভাব নাই, অতিথিরও অভাব নাই, কিন্তু তোমার বংশীয় এখনকার গৃহীণীদের তোমার মত সেই স্নিগ্ধ উদারভাব ও সাত্ত্বিক দান আছে কি না আমরা বলিতে প্রস্তুত নহি। অতিথি ফিরে না ইহাই পরম মঙ্গল এবং ইহা তোমারই পুণ্যফল!

অতিথিসেবার মত গো-সেবা প্রেমচন্দ্রের মাতার একটী সংকল্পিত কার্য্য ছিল। এই নিমিত্ত অন্দরবাটীর নিকটেই একটী স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল। তাহাতে অন্ততঃ একটী গাভী প্রতিদিন রাখিতে হইত। সাংসারিক কার্য্য করিতে করিতে প্রেমচন্দ্রের মাতা গো শালায় একবার যাইতেন এবং গাভীর পদধাবন, গাত্রমার্জন, ললাটে সিঁন্দুর চন্দন দান এবং নব নব ঘাস প্রভৃতি ভোজন করাইয়া আত্মাকে পবিত্র জ্ঞান করিতেন। তিনি বলিতেন স্ত্রীলোকদিগের যত্ন না থাকিলে গাভীর সেবা হয় না এবং রীতিমত গাভীর সেবা না হইলে গৃহস্থের স্বাস্থ্য, বল ও মঙ্গল সাধন হয় না—গরু গৃহস্থের অমূল্য ধন।

ভৃত্যেরা যত্নপূর্ব্বক সেবা করিত না বলিয়া প্রেমচন্দ্রের পিতা এক সময়ে কতকগুলি বৃদ্ধ ও অকর্ম্মণ্য গাভী ও হালের গরু নিজ গ্রাম ও অপর গ্রামের লোকদিগকে বিতরণ করিয়া দিয়াছিলেন। প্রেমচন্দ্রের মাতা এই কথা জানিতে পারিয়া আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করেন। কর্ম্মে অপটু এই বলিয়া গরুগুলি বিলাইয়া দেওয়া অতি কুদৃষ্টান্ত দেখান হইয়াছে বলিয়া স্বামীর সঙ্গে তর্ক করেন এবং বলেন আমরা উভয়েই বৃদ্ধ ও কর্ম্মে অক্ষম হইয়া পড়িতেছি। ইহা দেখিয়া ছেলেরা একদিন আমাদিগকে বিলাইয়া দিতে কেন সঙ্কুচিত হইবে? যে ভৃত্য বৃদ্ধ গরুগুলির সেবায় অযত্ন ও অবহেলা করে তাহার দণ্ড বা তাহার স্থানে আর একজনকে নিযুক্ত না করা বাটীর কর্ত্তার দোষ হইতে পারে কি না? ইহার পরে বৃদ্ধ গরুগুলি বাটীতে ফিরিয়া আনিতে হয় এবং যে পর্য্যন্ত সকল গরুগুলিকে গোশালায় প্রত্যাগত না দেখেন ততদিন প্রেমচন্দ্রের মাতা জলস্পর্শ করেন নাই।

সত্যনিষ্ঠা যেমন প্রেমচন্দ্রের পিতার একটী বিশেষ গুণ ছিল, তেমনি পরনিন্দায় বিরক্তি তাঁহার মাতার এক অসামান্য গুণ ছিল। তাঁহার মুখে কখনও শত্রুরও নিন্দাবাদ শুনা যায় নাই। একবার অপরের বাটীতে

নিমন্ত্রণে যাইয়া তাঁহার একটী পুত্র ভাল খাওয়া হয় নাই, ভাল রান্না হয় নাই, ছেলেদিগকে ভাল করিয়া দেয় নাই, বলিয়া নিন্দা করিতেছিল,-শুনিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ পুত্রটীকে কোলে করিয়া কি কি খাইবার সামগ্রী হইয়াছিল ইত্যাদি বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন এবং পুত্রের মুখেই বিলক্ষণ আয়োজনের কথা বাহির করিয়া লইয়া বলিলেন বাপু! গৃহস্থ ত এত সামগ্রী পত্র করিয়াছিল; ভাল রান্না অথবা পরিবেশনের ভাল বন্দোবস্ত না হওয়াতে তত দোষ কি? পরের বাটীতে খাইয়া কখন নিন্দা করিও না। এইটীতে বড় পাপ জ্ঞান করিও।" মাতার এই উপদেশ পুত্রের অন্তরে নিয়ত জাগরূক থাকিল। এই সকল গুণে প্রেমচন্দ্রের মাতা সকলেরই ভক্তিভাজন হইয়াছিলেন। নয়নচন্দ্র প্রেমচন্দ্রের পিতা ও অন্যান্য লোকের সঙ্গে বিরোধ এবং সামান্য ছল পাইয়া মোকদ্দমা করিতেন। মোকদ্দমার বিচারের নির্দ্ধারিত দিবসে নয়নচন্দ্র "বড় বৌ" "বড় বৌ" বলিয়া প্রেমচন্দ্রের মাতাকে আহ্বান করিতেন, তাঁহাকে খিড়কীদ্বারে একবার দাঁড়াইতে অনুরোধ করিতেন এবং তাঁহার মুখ দেখিয়া যাত্রা করিলে মোকদ্দমায় জয়লাভ করিবেন বলিয়া দূর হইতে ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম করিয়া যাইতেন।

সন ১২৫৮ সালের ৫ই পৌষের সন্ধ্যাসময়ে নিমতুলায় গঙ্গার গর্ভে প্রেমচন্দ্রের মাতার মৃত্যু হয়। তখন তাঁহার পিতা রামনারায়ণ শাকনাড়ার বাটীতে ছিলেন। উক্ত রাত্রিশেষে রামনারায়ণ বাহির বাটী হইতে অন্দর বাটীর মধ্যে গিয়া প্রেমচন্দ্রের পত্নীকে জাগরিত করিয়া বলিলেন এই রাত্রিতে গৃহিণীর মৃত্যু হইয়াছে, প্রাতে তেঁতুল গাছ আদি কাটাইবার ও ও শ্রাদ্ধের অন্যান্য আয়োজন ও বন্দোবস্ত করিবার জন্য লোকজনকে বলিয়া দাও। প্রেমচন্দ্রের পত্নী বিস্ময়ান্বিত হইয়া কলিকাতা হইতে এই বিষয়ে কোন সমাচার আসিয়াছে কি না বলিয়া জিজ্ঞাসিলেন। রামনারায়ণ বলিলেন,—গৃহিণী স্বয়ং আসিয়া এখনি আমায় এই সমাচার দিয়া গেলেন, অন্যরূপে কোন সমাচার পাই নাই। রাত্রিশেষে দেখিলাম,—গৃহিণী পদতলে বসিয়া আমার গাত্রে হাত বুলাইতেছেন; তাঁহার মস্তকে ও কপালে অনেক সিন্দূর লেপা; এক খানা আর্দ্র শাড়ী পরা, তাহাতে অনেক কালীর রেখা দাগ, বাম হাতে খানিক তূলা, এই দেখিয়া উঠিয়া শয্যায় বসিলাম,

তূলা ও আর্দ্রবস্ত্রের স্পর্শ অনুভব করিতেছি এবং গৃহিণীর এইরূপ আকার দেখিতেছি বলিয়া স্পষ্ট বোধ করিলাম। অঙ্গুলি নির্দ্দেশে একটী পথ দেখাইয়া আমি এই পথে চলিলাম, তুমি আইস এই বলিয়া গৃহিণী চলিয়া গেলেন।

পাঠক! আপনাকে এই আকর্ষণী শক্তির তত্ত্ব এবং এইরূপ অলৌকিক লোমহর্ষণ ব্যাপার বুঝাইতে অক্ষম। প্রেমচন্দ্রের পিতা ও মাতা ইহা বুঝাইতে পারিতেন কি না জানি না। এখন অবিশ্বাস পরিহার করিয়া স্থির চিত্তে আপনি স্বয়ং বুঝিবার চেষ্টা করুন। যে কয়েকটী কথার ব্যাখ্যা আবশ্যক কেবল তাহাই আমরা বলিয়া দিতেছি।

ঘটনাটি ঠিক্। প্রেমচন্দ্রের পিতা স্বপ্ন দেখেন নাই ইহাও ঠিক্। তিনি ভয় পান নাই, নিকটে যে যে লোক শয়ন করিয়াছিল তাহাদিগকে জাগাইয়া পূর্ব্বকথিত অবস্থায় গৃহিণীকে যাইতে দেখিল কি না জিজ্ঞাসিয়াছিলেন ইহাও ঠিক্। প্রেমচন্দ্রের পত্নী কেবল শ্বশুর মহাশয়ের এই কথার উপর নির্ভর করিয়াই প্রাতে কাষ্ঠ আদির আয়োজনের বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া ছিলেন ইহাও ঠিক। পল্লীগ্রামে প্রথমতঃ কাষ্ঠের আয়োজনই প্রধান আয়োজন। প্রেমচন্দ্রের মাতাকে তীরস্থ করিবার সমাচার বাটীতে পাঠান হয় নাই। কলিকাতা হইতে শাকনাড়া দুই দিনের পথ। তখন রেলওয়ে অথবা টেলিগ্রাফের বন্দোবস্ত ছিল না। দুই দিনের দিন এই মৃত্যুসমাচার লইয়া লোক শাকনাড়ায় পৌছে। তখন শ্রাদ্ধের আয়োজন আরম্ভ হইয়াছিল। প্রেমচন্দ্রের ভগিনীরা মাতার পীড়ার সময়ে শুশ্রূষা নিমিত্ত গঙ্গাতীরে উপস্থিত ছিলেন। উহাঁরা পতিপুত্রবতী মাতার মুমূর্ষু সময়ে তাঁহার ললাটে ও মস্তকে অনেক সিন্দূর এবং বাম করে একটা তূলার পাঁজ দিয়াছিলেন। পাঁজ দেওয়ার কথা আমরাও তখন জানিতে পারি নাই। দাহ করিবার পূর্ব্বে যে একখানি রাঙ্গাপেড়ে কাপড় নিমতলার এক দোকান হইতে কেনা হয়, তাহাতে দোকানদার কয়লা দিয়া হাটে অন্যান্য অনেক কাপড় কিনিবার হিসাব লিখিয়াছিল। গঙ্গাজলে সিক্ত করিয়া কাপড়খানি পরিধান করাইবার সময়েঃ কালীর দাগ সকল দেখা যায়। প্রেমচন্দ্র এমত কাল দাগওয়ালা শাড়ী খরিদ করিবার নিমিত্ত আপন চতুর্থ ভ্রাতাকে

তিরস্কার করেন। অগত্যা রাত্রিতে ঐ কাপড়ই পরান হয় ও দাহাদি কার্য্য নিষ্পন্ন হয়।

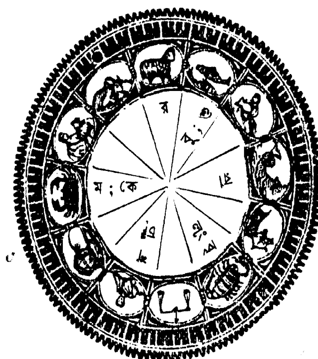
এখন রামনারায়ণের প্রত্যক্ষীভূত রাত্রিকার বৃত্তান্ত মনে মনে সঙ্গতরূপে পাঠক গড়িয়া লইতে পারেন, কিন্তু প্রেমচন্দ্রের মাতা ইহলোক হইতে যাত্রা করিবার সময়ে স্বামীর পাদস্পর্শ করিয়া যে বিদায় গ্রহণ করিয়া ছিলেন, তদ্বিষয়ে তাঁহার স্বামী ব্যতীত অপর সাক্ষী ছিল না।

সন ১২৬০ সালে প্রেমচন্দ্রের পিতার পক্ষাঘাত হয়। তাঁহাকে গঙ্গা-তীরস্থ করিবার উদ্দেশে শাকনাড়া হইতে প্রথমে বৈদ্যবাটীতে আনা হয়। এই বংশীয়দের পরম বন্ধু প্রসিদ্ধ ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তথায় তাঁহাকে দেখিতে যান। তিনি রামনারায়ণের স্নিগ্ধ গম্ভীর মুখমণ্ডল দেখিয়া বিস্মিত হয়েন এবং এরূপ মুখশ্রীযুক্ত ব্যক্তি সাধুতা ও বদান্যতা আদি উন্নত গুণেরই আধার হইবে, ইহার ব্যভিচারের সম্ভাবনা কম বলিয়া প্রকাশ করেন। আকার নিরীক্ষণ করিয়াই তিনি বলিলেন,—অল্প দিন মধ্যে ইহাঁর মৃত্যু হইবে না। গঙ্গাতীরে রাখিবার প্রয়োজন নাই। চিকিৎসা করাইবার ইচ্ছা থাকিলে কলিকাতায় লইয়া যাওয়া কর্ত্তব্য। তদনুসারে উহাঁকে কলিকাতায় আনা হয়। পরে সন ১২৬১ সালের কার্ত্তিক মাসে ৮০ বৎসর বয়সে রামনারায়ণের মৃত্যু হয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বাল্য ও শিক্ষা।

নৃসিংহ তর্কপঞ্চানন প্রেমচন্দ্রের একটী জন্মপত্রিকা প্রস্তুত করিলেন, এবং এই বালক স্থিরবুদ্ধি, জ্ঞানী ও সুকবি হইবে বলিয়া রামনারায়ণকে বারবার বলিতে লাগিলেন। জাতচক্র ও জন্মপত্রিকা নিম্নে লিখিত হইল।



জন্ম।

শকাব্দ ১৭২৭।০।১।৩৮।৩২।

খৃষ্টাব্দ ১৮০৬।৪।১২।

নৃসিংহ জ্যোতিষ শাস্ত্রে বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তিনি দেখিলেন জাতকের লগ্নে বৃহস্পতি অনুকূল। পঞ্চম মীনে অর্থাৎ বুদ্ধিস্থানে বুধ এবং শুক্রগ্রহ অবস্থিত এবং তাহাতে লগ্নাধিপ ও একাদশস্থ চন্দ্রের সম্পূর্ণ দৃষ্টি। রবি ষষ্ঠস্থানবর্ত্তী তুঙ্গী। রবি ও শুক্রগ্রহ মেষ ও মীনে অবস্থিত থাকায় সম্পূর্ণ উচ্চ যোগ ছিল। ইহাতে জাতক সৌম্যমূর্ত্তি, মধ্যাকার, ধীশক্তিসম্পন্ন, ধার্ম্মিক, স্থিরচিত্ত, সদুপদেষ্টা, মন্ত্রজপপরায়ণ,

রাজমান্য, বিদ্বান্, অধ্যাপক এবং সুকবি হইবে বলিয়া স্থির করা অসঙ্গত হয় নাই। প্রেমচন্দ্রের জীবনচরিতে কোষ্ঠীর কথা আর দুই এক বার বলিতে হইবে। পাঠকগণ মনে করিবেন না যে জ্যোতিষের ফলাফলে বিশ্বাস করিতে তাঁহাদিগকে অনুরোধ করিতেছি। ভারতবর্ষ জ্যোতিষ শাস্ত্রের জন্মভূমি হইলেও এক্ষণে ইহার সম্যক্‌রূপ তত্ত্বানুসন্ধানের অভাব এবং লোকদিগের শ্রদ্ধার হ্রাস দেখিয়া এই বিষয়ে ভয়ে ভয়ে কথাবার্ত্তা বলিতে হইতেছে। এক সময়ে ভৃগু, পরাশর, বশিষ্ঠ, বরাহ, মিহির প্রভৃতি আর্য্যজ্যোতির্বিদগণ এবং আরিষ্টটন; টলেমি, কেপ্‌লার, প্রভৃতি বিখ্যাত পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ এই শাস্ত্রের ফলোপধায়কতা প্রত্যক্ষ করিয়া ইহার গৌরব সমর্থনে যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। আজকাল অর্থলোলুপ কতকগুলি অদূরদর্শী লোকের হস্তে পড়ায় এই শাস্ত্রের ফলবত্তার প্রতি অনেকের অশ্রদ্ধা জন্মিতেছে সন্দেহ নাই। যাহা হউক, বাল্যকালে প্রেমচন্দ্রের বিদ্যাশিক্ষাবিষয়ে তত্ত্বাবধানের ভার যাঁহাদের উপরে ন্যস্ত ছিল, তাঁহাদের জ্যোতিষী গণনায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিল এবং স্বয়ং প্রেমচন্দ্র নিজ কোষ্ঠীর লিখিত ফলাফলে চিরকাল দৃঢ় বিশ্বাস করিতেন এবং তাহার জীবনে গ্রহসূচিত কতকগুলি শুভ ও কতকগুলি অশুভ ফল যে প্রকৃতরূপে ফলিয়াছিল তাহা অনুভব করিয়াছিলেন। রামনারায়ণ পণ্ডিত না হইলেও নৃসিংহের বচনানুসারে প্রেমচন্দ্র একজন বিদ্বান্ ও ভাগ্যবান্ বড়লোক হইবে এই একটী তাঁহার বলবতী ধারণা ছিল এবং এই প্রতীতিবশতঃ তিনি প্রেমচন্দ্রের শিক্ষাবিষয়ে প্রথমাবধি সাতিশয় যত্নবান্ ছিলেন। ইহাতে প্রেমচন্দ্রের এই সময়ে যে অনেকটা মঙ্গল ঘটিয়াছিল তাহাতে সংশয় নাই। গ্রহগণের অবস্থান সূচিত ফলের তারতম্য প্রায় সর্ব্বদা দেখা যায়। ইহার কারণ অনেক। অক্ষাংশ, দেশ ও জাতিভেদে এবং পিতামাতার যোগ এবং শারীরিক ও মানসিক বৃত্তি ভেদে ফলের বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়। কবিবর লর্ড বায়রণের জাতচক্রের পঞ্চম স্থানে শনিসহচরিত শুক্রগ্রহের অবস্থান এবং প্রেমচন্দ্রের লগ্নের উক্ত পঞ্চম গৃহে শুক্র এবং বুধ দুইটী উচ্চ গ্রহের অবস্থান দৃষ্ট হয়, অথচ উভয়ের কবিত্ব শক্তির অপার তারতম্য দেখা যায়। দেশ জাত্যাদি ভেদে ফলের বিভিন্নতা অপরিহার্য্য।

প্রথমতঃ পাঠশালার শিক্ষাপ্রণালী অনুসারে বর্ণজ্ঞানাদি জন্মিলে নৃসিংহ প্রেমচন্দ্রকে সংস্কৃত শিখাইবার মানসে সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণ পড়াইতে আরম্ভ করিলেন। চূড়াসংস্কার সময়ে উপস্থিত থাকিয়া বিধিপূর্ব্বক গায়ত্রী শিক্ষা করাইলেন। অল্প দিন মধ্যেই প্রেমচন্দ্রের বুদ্ধিমত্তা দেখিয়া নৃসিংহ তাঁহাকে যত্ন ও স্নেহের একাধার জ্ঞান করিতে লাগিলেন। কিন্তু আপন ভবিষ্যৎ বাণীর ফল প্রত্যক্ষ করা নৃসিংহের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিল না। প্রেমচন্দ্রের ব্যাকরণপাঠ শেষ হইতে না হইতেই নৃসিংহের মৃত্যু হইল।

নৃসিংহের মৃত্যুর পরে প্রেমচন্দ্র ব্যাকরণের অবশিষ্ট অংশ অধ্যয়ন করিবার নিমিত্ত মাতুলালয়ে রঘুবাটী গ্রামে প্রেরিত হয়েন। তথায় সীতারাম ন্যায়-বাগীশ নামে একজন বিখ্যাত বৈয়াকরণিক অধ্যাপনা করিতেন। শাকনাড়ার অতি নিকটবর্ত্তী পাষণ্ডা গ্রামে আপন জ্ঞাতি রামদাস ন্যায়পঞ্চানন প্রভৃতির দুই খানি চতুষ্পাঠী ছিল। তথায় রামনারায়ণ প্রেমচন্দ্রকে পাঠাইলেন না। নৃসিংহের ভবিষ্যৎ বচন রামনারায়ণের হৃদয়ে জাগরূক ছিল। প্রেমচন্দ্র বিখ্যাত বিদ্বানের নিকটে উপদেশ পান ইহাই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য। প্রেমচন্দ্র রঘুবাটীতে মাতুলালয়ে থাকিয়া ন্যায়বাগীশের টোলে ব্যাকরণ পড়িতে লাগিলেন। অল্প দিন মধ্যেই তীক্ষ্ণবুদ্ধির পরিচয় পাইয়া ন্যায়বাগীশ প্রেমচন্দ্রের উপর সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং তাঁহার শিক্ষা বিষয়ে যত্ন করিতে লাগিলেন। কিছুকাল উত্তমরূপ পড়াশুনা চলিতে লাগিল। কিন্তু মাতুলালয়ে থাকিবার সুবিধা হইবে বলিয়া তিনি যে আশা করিয়াছিলেন, তাহা ভ্রমাত্মক বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। প্রেমচন্দ্রের মাতুলেরা বড় সজ্জন ছিলেন না। ইহাঁরা হুগলী জিলার অন্তঃপাতী খামারপাড়া গ্রামের রায়বংশীয়। নবাব প্রদত্ত সম্পত্তি ও মর্য্যাদা পাইয়া ইহাঁরা অত্যন্ত গর্ব্বিত হইয়াছিলেন। রঘুবাটী অঞ্চলে ইহাঁদের কতক ভূমিসম্পত্তি ছিল। ইহাঁরা দরিদ্র ভগিনীপতি রামনারায়ণ ও তাঁহার সন্তানদিগকে সস্নেহ নয়নে দেখিতেন না; বরং অবজ্ঞা করিতেন। জন্মাবধি অদীনস্বভাব প্রেমচন্দ্র এরূপ কুটুম্বদের বাটীতে অন্নদাস হইয়া বহুদিন যে থাকিতে পারিবেন, এরূপ সম্ভাবনা ছিল না। কিয়ৎকাল মধ্যেই মাতুলদিগের সহিত তিনি কলহ করিয়া বাটীতে ফিরিয়া আসিলেন।

ব্যাকরণ পাঠান্তে কাব্যশাস্ত্রের আলোচনা হয় বলিয়া তাঁহার পিতার আগ্রহ জন্মে। কাব্য ও অলঙ্কার উভয় শাস্ত্র পড়িবেন বলিয়া প্রেমচন্দ্র ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তৎকালে রাঢ়মধ্যে এই দুই শাস্ত্রের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা অতিশয় বিরল হইয়া উঠিয়াছিল। ব্যাকরণে কিছু ব্যুৎপত্তি জন্মিলে, রঘুনন্দনকৃত নব্যস্মৃতির ২।৪ পাতা নাড়িয়া চাড়িয়া অনেকেই এক একটী চতুষ্পাঠী খুলিয়া পণ্ডিত নাম ধারণ করিতেন। পল্লীগ্রামের পণ্ডিতগণ প্রায় নিরন্ন। সম্পন্ন লোকদিগের আর্থিক সাহায্য এবং ক্রিয়াকলাপ উপস্থিত হইলে বিদায় আদি হইতে অর্থাগম ক্রমশই কমিয়া আসিতেছিল। নিজ ব্যয়ে বহু ছাত্র পোষণ পূর্ব্বক অধ্যাপনা অনেকের সাধ্যায়ত্ত ছিল না।

বিখ্যাত অধ্যাপক এবং থাকিবার সুবিধাজনক স্থান আদির সন্ধান করিতে করিতে যে কিছুদিন প্রেমচন্দ্রকে বাটীতে বসিয়া থাকিতে হয়, এই সময় প্রেমচন্দ্রের জীবনের অতি রমণীয় সময়। তখন তাঁহার বয়স ১৩।১৪ বৎসর। এই সময়ে তাঁহার হৃদয়ের সহজ ভাবের মধুর গীতিময় উচ্ছ্বাস স্ফুরিত এবং কবিত্বকুসুমের কোরক বিকসিত হইতে আরম্ভ হয়। এই সময়ে তিনি অলঙ্কারপরিচ্ছদশূন্য মধুর সরলতাপূর্ণ গীতিময় কবিতা-শরীর সরল কোমল মাতৃভাষায় গড়িতে আরম্ভ করেন। তৎকালে নিজগ্রামে এবং নিকটবর্ত্তী অনেক গ্রামেই তর্জা গাওনার দল হইয়াছিল। এক্ষণে তর্জা গাওনার প্রথা লুপ্তপ্রায় হইয়া গিয়াছে। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন তর্জার বড় সমাদর ছিল। দুই দলে কবিওয়ালাদের মত আড়া আড়ি ভাবে সঙ্গীত চলিত। কিন্তু কবিওয়ালাদের মত ইহারা দাঁড়াইয়া গাইত না। আসরে বসিয়া বসিয়া গান করিত। প্রেমচন্দ্র একদলের নিমিত্ত গান বাঁধিয়া দিতেন। চাপান অপেক্ষা সুশ্রাব্য উত্তর-গান প্রস্তুত করা তাঁহার অনায়াসসাধ্য হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার রচিত সরল উত্তর-গীত গাইবার সময়ে ঐ দলের লোকেরা যত বাহবা পাইত, ততই তাহাদের প্রেমচন্দ্রের উপরে অনুরাগ ও ভক্তি বাড়িত। কথিত আছে, রাত্রিকালে গ্রামান্তরে যাইতে হইলে ঐ দলের লোকেরা প্রেমচন্দ্রের পিতার অজ্ঞাতসারে তাঁহাকে মহাসমাদরে স্কন্ধে লইয়া দৌড়িত এবং আসরের অনতিদূরে কাহারও ঘরের দুয়ারে বা বৃক্ষতলে বসাইয়া উত্তর-গান রচনা করাইয়া লইত। ইহার নিমিত্ত

প্রেমচন্দ্রের নিকটে আলোক, দোয়াত, কলম, কাগজের প্রয়োজন হইত না। এই উপলক্ষে প্রেমচন্দ্র মুকুন্দরাম কবিকঙ্কন, কীর্ত্তিবাস, কাশীরাম দাস প্রভৃতির সুসজ্জিত ভাণ্ডার সকলের সামগ্রী পত্র দেখিয়া লয়েন। এইগুলি তিনি বয়ঃপরিণামে কালিদাস, ভবভূতি প্রভৃতির মনোহর বাজারের জাঁকজমক এবং আপন দোকানের ঘসা মাজা স্বচ্ছ জিনিসগুলি দেখিয়াও বিস্মৃত হয়েন নাই। আদিম বাঙ্গালা কবিগণের যেখানে যে যে ভাল ভাল জিনিস যেমন ভাবে সাজান আছে, তাহার হিসাব তিনি মুখে মুখে দিতে পারিতেন। যাহা হউক, এইরূপে বাল্যবয়সেই প্রেমচন্দ্রের রচনাশক্তি যে বিলক্ষণ পরিচালিত হইয়াছিল তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

এই সময়ে প্রেমচন্দ্রের পিতা তাঁহাকে শাকনাড়ার দক্ষিণ পশ্চিমে পাঁচ ক্রোশ দূরে অবস্থিত ছুয়াড়গ্রামের জয়গোপাল তর্কভূষণের টোলে প্রবিষ্ট করাইয়া আসিলেন। ছুয়াড়গ্রাম অতি ক্ষুদ্র গ্রাম। তর্কভূষণ তৎকালে রাঢ়দেশে ব্যাকরণ কাব্য অলঙ্কার আদি শাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত। ছাত্রসংখ্যা বিস্তর। তর্কভূষণের বাটীতে স্থানাভাব। টোলে অবস্থান এবং একটী ব্রাহ্মণের বাটীতে প্রেমচন্দ্রের আহারের বন্দোবস্ত হয়। আহারের বিনিময়ে ব্রাহ্মণের দুইটী অল্পবয়স্ক পুত্রের ব্যাকরণ অধ্যাপনার ভার প্রেমচন্দ্রকে গ্রহণ করিতে হয়। টোলে প্রেমচন্দ্র ব্যাকরণের অবশিষ্টাংশ, তাহার টীকা, কাব্য ও অলঙ্কার ক্রমে পাঠ করিলেন। তর্কভূষণের শিক্ষাপ্রণালী অতি উত্তম ছিল। প্রত্যেক ছাত্রের পাঠ সম্যক্রূপে বুঝাইয়া দিতে তিনি নিয়ত যত্ন করিতেন। ইহা ব্যতীত তিনি যখন সাংসারিক কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেন, তখন জ্ঞানবান্ ছাত্রদিগকে সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতে বলিতেন এবং এই অবকাশে সরল সংস্কৃতভাষায় পদ, বাক্য, কবিতা চরণ আদি পূরণ করিতে বলিতেন। এই সকল বিষয়ে প্রেমচন্দ্র অল্পদিন মধ্যেই তর্কভূষণ মহাশয়ের অতি প্রিয় ছাত্র হইয়া উঠিয়াছিলেন। কোন স্থানে নিমন্ত্রণ হইলে তিনি প্রেমচন্দ্রকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতেন। চতুষ্পাঠীর অধ্যাপকদিগের এই নিয়ম ছিল, যে তাঁহারা নিমন্ত্রণে যাইবার সময়ে প্রধান প্রধান ২।১টী ছাত্রকে সঙ্গে লইয়া যাইতেন। ঐ ছাত্রেরা সভাস্থলে সমবেত অন্যান্য অধ্যাপকদিগের ছাত্রের সঙ্গে বিচার করিয়া জয়লাভ করিলে

অধ্যাপকের গৌরব বৃদ্ধি হইত এবং ছাত্রেরাও কিছু কিছু বিদায় পাইত। প্রেমচন্দ্র যেখানে যাইতেন প্রায় সর্ব্বত্র জয়ী হইয়া স্বগুরুর আনন্দ বর্দ্ধন করিতেন। এইরূপ নিমন্ত্রণ উপলক্ষ্যে প্রেমচন্দ্রকে গুরুর সহিত অনেক দূরতর স্থানে গমন করিতে হইত এবং অনেক বিষয়ে ক্লেশ পাইতে হইত। বয়ঃপরিণামে তিনি সময়ে সময়ে এই সকল বিষয়ের গল্প করিতেন। তিনি বলিতেন,—দূরে যাইতে হইলে পথে তাঁহার পা ফুলিয়া যাইত। পথিমধ্যে আহারাদির নানাপ্রকার অসুবিধা ও কষ্ট হইত। অধ্যাপকের সঙ্গে না গেলেও পাঠ বন্ধ হইত। বাটীতে আসিবারও সুযোগ থাকিত না, পিতা তিরস্কার করিতেন। প্রেমচন্দ্র ইহাও বলিতেন, তর্কভূষণ মহাশয়ের সঙ্গে চলিবার সময়ে পথশ্রম বিস্মৃত হইবার এক অতি চমৎকার উপায় ছিল। তিনি পথে যাইতে যাইতে দুই পার্শ্বে যাহা দেখিতে পাইতেন তাহারই সংস্কৃতভাষায় বর্ণন করিতে ছাত্রকে আদেশ করিতেন। ভালরূপ কোন বর্ণনীয় বিষয় দেখিতে না পাইলে বাঙ্গালাভাষায় এক একটী বাক্য বলিয়া সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদ করিতে বলিতেন। এইরূপে গদ্যরচনায় প্রেমচন্দ্রের কিঞ্চিৎ পরিপক্কতা জন্মিলে তিনি তাঁহাকে মুখে মুখেই কবিতা রচনা শিখাইতে আরম্ভ করেন। প্রেমচন্দ্রের রচিত কবিতা পুনরাবৃত্তি করিয়া তর্কভূষণ মহাশয় স্থানে স্থানে এক একটী শব্দ, পদ, বাক্য ও চরণ এরূপ ভাবে পরিবর্ত্তন করিয়া দিতেন যে, প্রেমচন্দ্রের মনে আনন্দের পরিসীমা থাকিত না। তিনি বলিতেন,—টোলে বসিয়া পড়া অপেক্ষা নিমন্ত্রণের সময়ে অধ্যাপকের সঙ্গে যাওয়ায় তাঁহার সমধিক উপকার হইত। কারণ, তৎকালে কেবল তাঁহারই উপর গুরুর সম্পূর্ণ মনোযোগ পড়িত এবং প্রশ্নোত্তরচ্ছলে সমুদায় বিষয় যেমন বিশদরূপে হৃদয়ঙ্গম হইত, কেবল পুস্তক পড়িয়া তেমন হইত না।

এইরূপে অধ্যাপকের প্রিয়শিষ্য হওয়াতে প্রেমচন্দ্রের যদিও অনেক বিষয়ে সুবিধা হইয়াছিল কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে তাঁহার পাঠ্যাবস্থা বড় কষ্টের সময় ছিল। চতুষ্পাঠীর ছাত্রগণমধ্যে বয়সে কনিষ্ঠ হইলেও পড়াশুনায় অধ্যাপক সর্ব্বাপেক্ষা তাঁহারই প্রশংসা করিতেন। ইহাতে বয়োজ্যেষ্ঠ ছাত্রেরা তাঁহার প্রতি ঈর্ষা প্রকাশ করিত। কেহ তাঁহার পুঁথির পাতা

ছিঁড়িয়া রাখিত, কেহ তাঁহার রাত্রিকালের পাঠের নিমিত্ত সঞ্চিত তৈল ফেলিয়া দিত বা ভাণ্ড হইতে ঢালিয়া লইত, কেহ তাঁহার কাপড়ের পুটুলি হইতে পয়সা কড়ি বাহির করিয়া লইত। এই সকল এবং অন্যান্য বিষয় লইয়া উহাদের সহিত বাদানুবাদ হইলে তাঁহাকেই চড়্‌টা চাপড়্‌টা সহ্য করিতে হইত। এতদ্ব্যতীত আহারের ক্লেশও একটী অপ্রতিবিধেয় যন্ত্রণার কারণ ছিল। যে ব্রাহ্মণের বাটীতে তাঁহাকে আহার করিতে হইত, তাঁহার সাংসারিক ব্যাপারে তাদৃশ স্বচ্ছলতা ছিল না। তাঁহার গৃহিণী আবার বিষম কৃপণস্বভাবা ছিলেন। প্রেমচন্দ্রের পিতা ঐ ব্রাহ্মণের কিছু কিছু সাহায্য করিতে চেষ্টা করিতেন, কিন্তু ব্রাহ্মণের সে বিষয়ে বিলক্ষণ অভিমান থাকায় কিছু লইতে স্বীকৃত হইতেন না। নানা কৌশলে প্রেমচন্দ্রের পিতাকে তাহা দিতে হইত। প্রেমচন্দ্র শেষ বয়সপর্য্যন্ত মধ্যে মধ্যে এই সকল বিষয়ে অনেক হাস্যজনক গল্প করিতেন। বর্ত্তমান কালের পঠার্থীদের ঐ গল্প সকল প্রীতিপ্রদ হইবে না বলিয়া বলিতে বিরত থাকিলাম।

দুয়াড়গ্রামে অধ্যয়নকালে প্রেমচন্দ্র তর্জা গাওনার কথা ভুলেন নাই। পূর্ব্বকথিত দলের লোকেরা মধ্যে মধ্যে তাঁহার নিকটে গিয়া গান বাঁধিয়া আনিত। সংগীতরচক বলিয়া খ্যাতি প্রকাশ হইলে অনেক গ্রামের বৈষ্ণবেরা মকর ও মধু সংক্রান্তি সময়ে তাঁহার নিকট গান রচনা করাইয়া লইত। প্রথম মুদ্রণ সময়ে আমরা তাঁহার রচিত কোন একটী সম্পূর্ণ সংগীত পাইবার নিমিত্ত বিস্তর চেষ্টা করিয়াছিলাম, দুর্ভাগ্য বশতঃ সে বিষয়ে বিফলযত্ন হইয়া একটীমাত্র উত্তর-গীতের এই খানিকটা পাইয়া মুদ্রিত করিয়াছিলাম।

"অপযশ কেন গাও অকারণ ?

নহে সে সেরূপ রমণী, কামিনীকুল-শিরোমণি,
অতুল মানিনী ;
আগে ছিল মুনিসুতা, হলো দ্রুপদ-দুহিতা,
দেবতারূপিণী ;
নহে কাম-চপলতা, তার তপ-সফলতা,
দেববরে পঞ্চ পতির বরণ ॥"

পরে অনুসন্ধানে আমরা প্রেমচন্দ্রের বাল্যরচিত আর কয়েকটী গীতের কতক কতক অংশ এবং একটী সম্পূর্ণ গীত পাইয়াছি। তন্মধ্যে সম্পূর্ণ গীতটী নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। প্রেমচন্দ্র যে দলের নিমিত্ত গীত রচনা করিতে গিয়াছিলেন, ঐ দলে অধিকাংশ চাসা ও তাঁতি গায়ক ছিল এবং সদ্‌গোপ অর্থাৎ চাসা জাতীয় এক ব্যক্তি গীত রচয়িতা ছিল। বিপক্ষদলে কলু ও কলুর ব্রাহ্মণই অধিক এবং দুইজন কলুর ব্রাহ্মণ গীত রচনা করিত। এই দলের লোকেরা প্রথমোক্ত দলের প্রথমকার হরিনাম সম্পর্কীয় গীতের দোষ ধরিয়া চাসা-ভূষো লোক, হাল করা ও ক্ষেতে খাটাই অভ্যাস, হরিনামের মাহাত্ম্য কি বুঝিবে, হরিনামে চাসার অধিকার কি? ইত্যাদি বলিয়া একটী গীত গাইতেছিল, এমৎসময়ে প্রথমোক্ত দলের কয়েক জন প্রেমচন্দ্রকে স্কন্ধে লইয়া উপস্থিত হয়। জাঁকাল আসর, বহুতর লোকের সমাগম, চারিদিকে হৈ চৈ গোলমাল ও কোলাহল হইতেছিল। প্রেমচন্দ্র এক গাছতলায় বসিয়া এই উত্তর গীতটী রচনা করিয়া দেন।

"চাসা অতি খাসা জাতি, নিন্দা কি তাহার
কত দিব্য গুণাধার।
প্রেমভরে হরিরে ডাক্‌তে চাসার পূর্ণ অধিকার॥
থাকে সত্য মাঠে ঘাটে, বেড়ায় স্বভাবের হাটে
চতুরালি নাই তাহার।
কুটিল সমাজ যত্নে করে পরিহার॥
স্বার্থে পরার্থে কাজ, নিজ কাজে নাহি লাজ,
ভাবে ধর্ম্ম এই তাহার।
প্রাণপণে যোগায়, চাসা জগতের আহার॥
কিবা গৃহী উদাসীন, চাসার অধীন চিরদিন,
বিনে চাসা দুনিয়া আঁধার।
পেটে ভাত বিহনে ঘুরিয়ে ঘানী ফল্ কি ভাব
একটী বার॥

মনে ভক্তি আছে যার, হরি সহায় তাহার,
এ কেবল প্রেমের কারবার ॥
ভক্তবৎসল হরি ভজতে নাহি জাত্ বিচার।
তোমরা ঘাণীর ঘোরে সদাই ঘোর ও
বুঝবে কি ভাই সারাসার ॥

শুনা যায় ঐ রাত্রিতে চাসার দলই প্রেমচন্দ্রের সহায়তায় বড় বাহবা পাইয়াছিল এবং জয়ী হইয়াছিল। ফলতঃ বাল্যাবধি প্রেমচন্দ্রের লৌকিক ব্যবহারে স্থূক্ষ্ম দর্শন এবং রচনা বিষয়ে ভাবতত্ত্বে ও প্রসাদ্গুণে বিলক্ষণ লক্ষ্য ছিল প্রতীয়মান হয়। এই গুণেই তাঁহার সংস্কৃত রচনার ভূয়সী প্রতিষ্ঠা দেখা যায়।

এইরূপ সঙ্গীতরচনার আমোদ তর্কবাগীশের বাল্যাবসানেই বিরত হয় নাই। কলিকাতায় আসিয়া বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইবার পরেও তিনি বহুদিন পর্য্যন্ত ঈশ্বর গুপ্তের সঙ্গে ওস্তাদি কবিওয়ালাদের লড়াই দেখিতে যাইতেন। উত্তর-গীত রচনার সন্ধান লওয়া তাঁহার একটী বাই ছিল। সংস্কৃত বিদ্যালয়ে কর্ম্ম পাইবার পরে নিজ বাটীতে উৎসব উপলক্ষ্যে অপর সকলে যখন "যাত্রা" "যাত্রা" বলিয়া ক্ষেপিত, তখন তিনি গোপনে আপন সহচর-দিগকে পাঠাইয়া বর্দ্ধমান প্রভৃতি স্থান হইতে ওস্তাদি কবির দল আনাইয়া আসরে লাগাইয়া দিতেন। যাত্রা পাওয়া গেল না, আসর ফাঁক যাওয়া অপেক্ষা কবি মন্দ কি? বলিয়া সহচরেরা বলিত। তিনিও তাহাতেই সায় দিতেন। রাত্রিকালে গাওনা আরম্ভ হইলে তর্কবাগীশকে বাটীর প্রকাশ্য স্থানে কেহ খুজিয়া পাইত না। বাটীর মধ্যে যেখানে কম আলোক থাকিত এবং যেখানে ছোট লোকেরা নারিকেল ছোবড়ার লুটি গেলাসের বা লণ্ঠনের জ্বলন্ত শিখায় ধরাইয়া গুড়ুক টানিত, তথায় একটী আসন পাড়াইয়া দুই চারিটী সহচর সঙ্গে তর্কবাগীশ অপ্রকাশ্যভাবে বসিতেন এবং সময়ে সময়ে উভয়দলের গীতরচকদিগকে নিকটে ডাকাইয়া কি প্রণালীতে উত্তর প্রত্যুত্তর রচিত হইতেছে তদ্বিষয়ে সন্ধান লইতেন এবং সহায়তা করিতেন। কবি-গাওনা শুনা অপেক্ষা তাহার রচনাতে তাঁহার অধিক আমোদ জন্মিত।

গাওনার সময়ে দুই একটী ভাবসূচক কথা শুনিয়া যখন আমোদ চড়িত, তখন মৃদুমন্দস্বরে "হাঃ সাবাস্" হাঃ সাবাস্" বলিয়া উঠিতেন। কলেজে চাকরী হইবার পরেও এক বৎসর গ্রীষ্মাবকাশে বাটীতে আছেন, এই সময়ে কবিওয়ালার একদল নিকটবর্ত্তী এক গ্রামে কবি গাইতে গাইতে অপর দলের প্রশ্নের উত্তর দিতে অসমর্থ হইয়া রাত্রি আড়াই প্রহরের সময় তর্কবাগীশের নিকটে উত্তর লেখাইয়া লইয়া গিয়াছিল।

সঙ্গীতরচনা ব্যতীত ছিপে মাছধরা তর্কবাগীশের অপর একটী বাল্য-কালের আমোদ ছিল। ইহাতেও তাঁহার বিলক্ষণ বাই থাকার কথা শুনা যায়। তিনি একদিন ছিপ ফেলিয়া ১০।১৫টী শোলমাছের বাচ্ছা ধরেন। কোনকারণে বাচ্ছাগুলি না মারিয়া একটি হাঁড়িতে জিয়াইয়া রাখেন। খানিক পরে আর মাছ না উঠায় জলের ধারে গিয়া দেখেন যে আর বাচ্ছা নাই, ধাড়িটী এধার ওধার করিয়া বাচ্ছাদিগকে খুজিয়া বেড়াইতেছে। ইহা দেখিয়া তাঁহার অত্যন্ত দয়া উপস্থিত হইল এবং পূর্ব্ব-ধৃত মৎস্যগুলি মারিয়া ফেলেন নাই বলিয়া দৈবকে ধন্যবাদ দিতে দিতে ঐগুলিকে পুষ্করিণীর জলে পুনর্ব্বার ছাড়িয়া দিলেন, এবং ধাড়িটী ছানা-গুলির সঙ্গে মিলিত হইয়া বড় আনন্দিত হইল বোধ করিলেন। সেই দিন হইতে তর্কবাগীশ মৎস্য ধরায় ক্ষান্ত হইয়াছিলেন।

প্রেমচন্দ্র জয়গোপাল তর্কভূষণের চতুষ্পাঠীতে ৭।৮ বৎসর কাল অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তথায় সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণের মূল ও টীকা সম্পূর্ণরূপে পড়িয়াছিলেন এবং উহাতে তাঁহার যে অসামান্য ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছিল পরে তাহার পরিচয় সর্ব্বদা পাওয়া যাইত। শেষ সময় পর্য্যন্ত ব্যাকরণের সূত্রগুলি প্রায় তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। তিনি তথায় কাব্য ও অলঙ্কারের কি কি গ্রন্থ পড়িয়াছিলেন তাহা আমরা জানিতে পারি নাই। কিন্তু কলিকাতায় আসিবার পূর্ব্বেই এই দুই শাস্ত্রে তাঁহার যে অনেকটা অধিকার জন্মিয়াছিল তাহা জানা গিয়াছিল।

তর্কভূষণের চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়ন সময়ে ১৮।১৯ বৎসর বয়ঃক্রম কালে প্রেমচন্দ্রের বিবাহ হয়। আরও কিছুকাল বিলম্বে বিবাহ দিবেন বলিয়া প্রেমচন্দ্রের পিতার সঙ্কল্প ছিল, কিন্তু কন্যাদাতার উত্তেজনায় এবং

অধ্যাপক তর্কভূষণের অনুরোধক্রমে এই বিবাহে পিতাকে সম্মতি দিতে হয়।

তৎকালে কলিকাতার সংস্কৃত কলেজে যে প্রণালীতে বিবিধ শাস্ত্রের অধ্যাপনা হইত এবং এই বিদ্যামন্দির বিখ্যাতনামা নিমাইচাঁদ শিরোমণি, শম্ভুনাথ বাচস্পতি, নাথুরাম শাস্ত্রী, জয়গোপাল তর্কালঙ্কার প্রভৃতি পণ্ডিতরত্নে বিভূষিত হইয়া যেরূপ গৌরবের আস্পদ হইয়াছিল তৎসমুদায় প্রেমচন্দ্র শুনিয়াছিলেন। তথায় কিছুকাল দর্শন আদি শাস্ত্র পড়িবেন বলিয়া প্রেমচন্দ্র সাতিশয় সমুৎসুক হয়েন। পরিশেষে পিতার উৎসাহে ও প্রযত্নে (১৭৪৮ শকে) ১৮২৬ খৃষ্ট অব্দের নবেম্বর মাসে কলিকাতায় আসিয়া সংস্কৃত কলেজে প্রবিষ্ট হয়েন। তখন তাঁহার বয়স ২১।২২ বৎসর। মিষ্টার হোরেস্ হেম্যান উইল্‌সন্ সাহেব মহোদয় তৎকালে এই বিদ্যামন্দিরের সেক্রেটরীর পদে নিযুক্ত ছিলেন। গৃহে প্রবিষ্ট হইবামাত্র প্রেমচন্দ্রের প্রশস্ত ললাটদেশ এবং মস্তকের আকার দেখিয়াই সাহেব মহোদয়,—এই বালক স্থিরচিত্ত, ও কবিত্বশক্তিসম্পন্ন হইবে বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন এবং শাস্ত্রে কতদূর অধিকার জন্মিয়াছে তদ্বিষয়ে প্রশ্ন করিতে করিতে তাঁহাকে কবিতা রচনা করিতে বলেন। প্রেমচন্দ্র অমনি প্রস্তুত। তিনি কাগজ কলম লইয়া বসিয়া গেলেন এবং অল্পক্ষণমধ্যে উইলসন্ সাহেবের সংস্কৃতশাস্ত্রে অনুরাগ ঐ শাস্ত্রের উন্নতিসাধনে চেষ্টা এবং কলেজের তত্ত্বাবধান সম্পর্কে তাঁহার প্রতিষ্ঠা বিষয়ে ৪টী শ্লোক রচনা করিলেন। রচনা বিষয়ে তৎপরতা ও ব্যাকরণে পরিপক্কতা দেখিয়া উদারচরিত উইলসন্ সাহেব মহোদয় চমৎকৃত হইলেন এবং তদবধি প্রেমচন্দ্রকে সস্নেহ নয়নে দেখিতে লাগিলেন। কাব্যালঙ্কারের প্রশ্নোত্তর শুনিয়া সাহেব মহোদয় বলিলেন,—পল্লীগ্রামে কাব্যলঙ্কার পাঠনার রীতি অপেক্ষা তাঁহার বিদ্যালয়ের রীতি পদ্ধতি উৎকৃষ্ট; একবারে ন্যায়-শাস্ত্রের শ্রেণীতে না গিয়া সাহিত্যশ্রেণীতে অধ্যয়ন আরম্ভ করিলে ভাল হয় বলিয়া প্রেমচন্দ্রকে উপদেশ দিলেন। প্রেমচন্দ্র এই বন্দোবস্তে সম্মত হইলেন। সাহিত্য শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইবার ২।৩ দিবস মধ্যেই প্রেমচন্দ্র পিতার প্রযত্নের সফলতা, উইলসেন সাহেব মহোদয়ের উপদেশের সারবত্তা এবং নিজের কৃতার্থতা বোধ করিতে সমর্থ হইলেন। তৎকালে সহৃদয়তার

অবতার জয়গোপাল তর্কালঙ্কার সাহিত্য শ্রেণীর অধ্যাপক ছিলেন। প্রেমচন্দ্র দূর হইতে তর্কালঙ্কার মহোদয়ের যশঃ সৌরভের কথা শুনিয়াছিলেন। সম্প্রতি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাহা অনুভব করিয়া মনে মনে অপার প্রীতিলাভ করিতে লাগিলেন। তৎকালে এই শ্রেণীতে যে সকল গ্রন্থের পাটনা হইতেছিল তন্মধ্যে অনেকগুলি প্রেমচন্দ্র পূর্ব্বে টোলে পড়িয়াছিলেন। টোলের ও কলেজের সাহিত্য শ্রেণীর অধ্যাপকের নাম সাদৃশ্য থাকিলেও অর্থাৎ উভয়েই জয়গোপাল নামে অভিহিত হইলেও এবং উভয়ের শ্লোক ব্যাখ্যা সম্বন্ধে যাথার্থ্য ব্যক্তির সৌসাদৃশ্য থাকিলেও টোলের জয়গোপালকে কতক পরিমাণে কঠোর শব্দ রাজ্যের কুলপতি এবং কলেজের জয়গোপালকে মধুর ভাবরাজ্যের অধিপতি বলিয়া নির্ণয় করিতে তিনি বাধ্য হইয়াছিলেন। ফলতঃ প্রেমচন্দ্রের মতে তর্কালঙ্কার মহাশয়ের শিক্ষা প্রণালীতে মার্জ্জিত প্রতিভার ভূয়িষ্ট চিহ্ন লক্ষিত হইত। তিনি বলিতেন তর্কালঙ্কারের পাঠ বিষয়ে বর্ণ বৈশুদ্ধি, ব্যাখ্যাবিষয়ে সূক্ষ্মভাব ব্যক্তি, প্রিয়দর্শন মুখমণ্ডল ও কর্ণায়ত সমুন্নত সজীব লোচন যুগলের ভাবভঙ্গী এবং গদ্য পদ্য রচনায় অসাধারণ শক্তি সুশ্রূষু ছাত্রের মনকে একবারে মাতাইয়া তুলিত এবং তাহার হৃদয়কন্দর অকস্মাৎ আলোকিত করিত। ফলতঃ এই সকল গুণেই মুগ্ধ হইয়া উইলসন্ সাহেব মহোদয় তর্কালঙ্কার মহাশয়কে পরিণত বয়সেও বহুযত্নে কাশী হইতে কলিকাতায় আনিয়াছিলেন এবং দর্শন ও অলঙ্কার আদির অধ্যাপনার ন্যায় কাব্যশাস্ত্রের অধ্যাপনার উৎকর্ষ সাধন করিয়া আপনার কলেজের গৌরব বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। শাস্ত্র বিশেষের অধ্যাপণা নিমিত্ত যথোপযুক্ত অধ্যাপক নির্ব্বাচন বিষয়ে সাহেব মহোদয়ের অসাধারণ বিচক্ষণতা ছিল সন্দেহ নাই। অল্পদিন মধ্যেই তর্কালঙ্কার পাঠ ও রচনা আদি বিষয়ে প্রেমচন্দ্রের বুদ্ধিমত্তা ও গুণবত্তার পরিচয় পাইয়া সাতিশয় প্রীত হইয়াছিলেন।

এই সময়ে একদিবস উইলসন্ সাহেব মহোদয় সাহিত্য শ্রেণীতে আসিয়া ইতস্ততঃ চক্ষু নিক্ষেপ করিতেছিলেন। ইত্যবসরে "কাহার অন্বেষণ করিতেছেন" বলিয়া তর্কালঙ্কার মহাশয় জিজ্ঞাসিলে "সেই নবাগত টোলের যুবা বন্ধুটীকে খুজিতেছি" বলিয়া সাহেব মহোদয় উত্তর দিলেন। তথন

প্রেমচন্দ্র দাঁড়াইয়া উঠিলেন। সাহেব উহাঁকে নির্দেশ করিয়া "এই ছাত্রটি এই শ্রেণীতে আসিতে ইচ্ছুক ছিলেন না, ইহাঁর ভালরূপে পরীক্ষা করা হইয়াছে কি না" বলিয়া জিজ্ঞাসিলেন। তখন প্রেমচন্দ্র সাগ্রহে বলিয়া উঠিলেন--মতিভ্রমই ইহার কারণ—এই শ্রেণীতে না আসিলে কাব্য পাঠের প্রকৃত আনন্দ লাভে তিনি চিরদিনের জন্য বঞ্চিত থাকিতেন। তর্কালঙ্কার বলিলেন—কালেজের নিম্নশ্রেণী হইতে এইরূপ ছাত্র প্রায় পাওয়া যায় না, প্রকৃতপক্ষে ইনি ছাত্র নহেন—পণ্ডিতকল্প সন্দেহ নাই, শাস্ত্রে ইহাঁর বিলক্ষণ অধিকার জন্মিয়াছে।

এই সকল কথোপকথন সংস্কৃত ভাষাতেই সম্পন্ন হইয়াছিল। সাহেব মহোদয় অধ্যাপকদিগের সঙ্গে সংস্কৃতভাষাতেই কথাবার্ত্তা কহিতেন। সংস্কৃত ভাষায় প্রেমচন্দ্রের বাক্‌শক্তি দেখিয়া উভয়েই সাতিশয় প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার ধারণা হইয়াছিল। তদবধি তিনি দ্বিগুণিত উৎসাহ সহকারে নির্দ্ধারিত পাঠ্যপুস্তক ব্যতীত অন্যান্য অপঠিত কাব্যালঙ্কারের গ্রন্থ সকল আয়ত্ত করিতে যত্নবান্ হইয়াছিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রেমচন্দ্র—অধ্যাপক—তর্কবাগীশ।

কালের স্রোত অবারিতরূপে চলিতে লাগিল। কলেজে প্রবিষ্ট হইবার পরে দেখিতে দেখিতে ন্যূনাধিক ছয় বৎসর কাল গড়াইয়া গেল। এই বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রেমচন্দ্রের জ্ঞানভাণ্ডারের সমুন্নতি হইতে লাগিল। তিনি ১৮২৬ খৃ অব্দের নবেম্বর মাস হইতে ১৮২৮ অব্দের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত সাহিত্য, ১৮৩০ অব্দের জানুয়ারি পর্য্যন্ত অলঙ্কার, এবং ১৮৩১ অব্দের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ন্যায় শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলেন এবং পরীক্ষায় আশানুরূপ ফল পাইতে লাগিলেন। জীবনের এই কয়েক বৎসর সময় তিনি বহুমূল্য বলিয়া বোধ করিলেন। জ্ঞানোন্নত বিখ্যাত গুরু ও বিভিন্ন-রুচি-বুদ্ধি-সম্পন্ন সহাধ্যায়ীবর্গের সংসর্গে প্রেমচন্দ্র আপন চরিত্রের সর্ব্বাবয়ব সুগঠিত করিয়া তুলিলেন। তিনি পল্লীগ্রামের এক পবিত্র বংশের জনৈক ধর্ম্মপরায়ণ দুঃখী ব্রাহ্মণের জ্যেষ্ঠ পুত্র, তাঁহার জ্ঞানার্জ্জন বিষয়ে পিতৃদেবের ঐকান্তিক যত্ন এবং তিনি এক দিন জ্ঞানী ও মানী হইবেন এই বিষয়গুলি প্রেমচন্দ্রের হৃদয়ে উজ্জ্বল অক্ষরে অঙ্কিত ছিল। মাতা পিতার সত্যনিষ্ঠা বাঙ্‌নিষ্ঠা ও ধর্ম্মনিষ্ঠার কথাগুলিও তিনি চিরদিন মনে রাখিয়াছিলেন। তিনি বাল্যাবধি মিতভাষী, স্থিরচিত্ত এবং উন্নতমনা ছিলেন; বাচালতা ও চটুলতা জানিতেন না। পাঠ শ্রবণ সময়ে যে দুই একটী কথা জিজ্ঞাসিতেন তাহাতেই তাঁহার চিন্তাভিনিবেশ এবং শাস্ত্রতত্ত্বে প্রবেশের পরিচয় পাইয়া অধ্যাপকগণ অতিশয় প্রীতিলাভ করিতেন। এই সময় তাঁহার বয়স ২৭। ২৮ বৎসর হইয়াছিল। অবলম্বিত কার্য্যে অভিনিবেশ, ধীরতা এবং উজ্জ্বলকান্তি ও গাম্ভীর্য্যপূর্ণ মুখমণ্ডল দেখিলেই সকলেই তাঁহাকে অতি প্রবীণ বলিয়া গ্রহণ করিতেন।

অলঙ্কার শাস্ত্রের অধ্যাপক নাথুরাম শাস্ত্রী ১৮৩১ অব্দের জুলাই মাস হইতে ছয় মাসের অবকাশ লয়েন। তখন প্রেমচন্দ্র ন্যায় শ্রেণীতে অধ্যয়ন

করিতেন। উইলসন্ সাহেব মহোদয় একদিন ন্যায় শ্রেণীতে আসিয়া নাথুরাম শাস্ত্রীর প্রতিনিধিস্বরূপে অলঙ্কারের অধ্যাপনা করিবার নিমিত্ত প্রেমচন্দ্রকে আদেশ করিলেন। ইহাতে তাঁহার সহাধ্যায়ীরা আনন্দভরে কোলাহল করিয়া উঠিলেন এবং অধ্যাপক নিমাইচাঁদ শিরোমণির সঙ্কেত-মতে রামগোবিন্দ শিরোমণি প্রভৃতি কয়েকজনে প্রেমচন্দ্রকে ক্রোড়ে করিয়া অলঙ্কার শ্রেণীর অধ্যাপকের আসনে বসাইয়া দিলেন। পরিশেষে নাথুরাম শাস্ত্রীর মৃত্যু হইলে ১৮৩২ অব্দের জানুয়ারি মাসে প্রেমচন্দ্র অলঙ্কারের অধ্যাপক পদে স্থায়ীরূপে নিযুক্ত হইলেন। এই পদের নিমিত্ত প্রার্থনা-কারীর সংখ্যা কম ছিল না, কিন্তু উইলসন্ সাহেব মহোদয় উদ্যমশীল প্রেমচন্দ্রের শাস্ত্রজ্ঞানের পরিণাম ও স্থিরচিত্ততা আদি গুণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকেই এই পদে স্থিরতর রাখিলেন। অতঃপর প্রেমচন্দ্র রাঢ়দেশীয় শূদ্রযাজী ব্রাহ্মণ, তাঁহার নিকটে গঙ্গাতীর বাসী ভাল ভাল ব্রাহ্মণেরা পাঠ স্বীকার করিবেন না বলিয়া কয়েক ব্যক্তি ঈর্ষ্যাপরবশ হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে দরখাস্ত দিয়াছিলেন। ইহাতে সাহেব মহোদয় বলিয়াছিলেন "আমি প্রেমচন্দ্রকে কন্যা দান করিতেছি না, তাঁহার গুণের পুরস্কার করিয়াছি; ঈর্ষ্যাকুল কয়েকজন অধ্যয়ন না করিলে বিদ্যালয়ের কোন ক্ষতি হইবে না।"

অলঙ্কারের অধ্যাপক হইবার পরেও প্রেমচন্দ্র অধ্যয়নে বিরত হয়েন নাই। প্রতিনিধি থাকা সময়ে ছয়মাস কাল ত নূতন পাঠ সময়ে ন্যায়-শ্রেণীতে গিয়া অধ্যয়ন করিয়া আসিতেন এবং অলঙ্কার শ্রেণীর ছাত্রদিগকে কোনপ্রকার রচনা আদি কার্য্যে ব্যাপৃত রাখিয়া যাইতেন। তৎপরে সায়ং প্রাতে যে সময় পাইতেন তাহাতে নিমাচাঁদ শিরোমণি, শম্ভুনাথ বাচস্পতি, হরনাথ তর্কভূষণ প্রভৃতি অধ্যাপকদিগের বাসায় গিয়া ন্যায়, বেদান্ত, স্মৃতি, আদি পড়িতেন। ন্যায় শ্রেণী হইতে অধ্যাপক হওয়ায় পণ্ডিতেরা প্রথমে প্রেমচন্দ্রকে ন্যায়রত্ন বলিয়া ডাকিতেন। পরিশেষে এডুকেশন্ কমিটী হইতে যে সার্টফিকেট প্রদত্ত হয় তাহাতে "তর্কবাগীশ" এই উপাধি লিখিত ছিল। এই শেষোক্ত উপাধিতেই তিনি চিরদিন খ্যাত হইয়াছিলেন।

প্রেমচন্দ্রের পিতা রামনারায়ণের সরল অন্তরে লোকান্তরিত নৃসিংহের বচনগুলি নিয়ত জাগরূক ছিল। তিনি কলিকাতায় প্রেমচন্দ্রের উন্নতির

বার্ত্তা শুনিয়া এই সকল নৃসিংহের অকপট আশীর্ব্বাদের ফল বলিয়া তাঁহাকে নিয়ত ধন্যবাদ দিতেন। সহায় সম্পত্তিশূন্য রাঢ়দেশীয় দরিদ্র ব্রাহ্মণ সন্তান রাজধানীতে রাজপ্রতিষ্ঠিত বিদ্যামন্দিরে অধ্যাপক হইলেন বলিয়া সহর্ষচিত্তে প্রেমচন্দ্রের শুভাকাঙ্ক্ষা করিতেন। বাটীতে উপস্থিত হইলে "কুলতিলক" হইবে বলিয়া প্রণত প্রেমচন্দ্রের মুখ ও মস্তক চুম্বন পূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং অনুজদিগের জ্ঞান শিক্ষার ভার গ্রহণ করিতে বলিলেন। কয়েক বৎসর কলিকাতায় অবস্থান করিয়া প্রেমচন্দ্র ইংরাজী শিক্ষাদান-বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের যত্নের বিষয় অবগত ছিলেন এবং মধ্যম সহোদর শ্রীরামকে ইংরাজী শিক্ষা দিতে ইচ্ছা করেন বলিয়া পিতা মাতার অভিপ্রায় জানিতে চাহিলেন। ইংরাজী বিদ্যার ফলাফল বিষয়ে তাঁহার কিছুমাত্র জ্ঞান নাই, বরং হিন্দুকলেজের ছাত্রেরা যথেচ্ছাচার হইতেছেন এইরূপ নিন্দাবাদের কথা শুনিতে পান বলিয়া রামনারায়ণ বলিলেন। ইংরাজী পড়িলে মদ্য ও অখাদ্য খাইবে এবং খৃষ্টান হইয়া এই পবিত্র কুলে কালী দিবে বলিয়া প্রেমচন্দ্রের মাতা শঙ্কা করিতে লাগিলেন। ইংরাজের রাজ্য, কালে ইংরাজী বিদ্যারই সমধিক প্রচলন হইতে চলিল;—ইংরাজী শিক্ষা বিতরণে রাজপুরুষদিগের সদুদ্দেশ্যই দেখা যায়;—ইংরাজী পড়িলেই যে সকলে ভ্রষ্টাচার হয় ইহা অমূলক; ইংরাজীতে প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিলে এদেশীয়েরা উন্নতমনা ও সমাজমান্য হইবেন, ও অর্থোপার্জ্জনে এবং স্বদেশের হিতসাধনে সমর্থ হইতে পারিবেন ইত্যাদি কথোপকথনের পর পিতামাতা উভয়েই এই বিষয়ে কর্ত্তব্য অবধারণের ভার প্রেমচন্দ্রের উপরেই অর্পণ করিলেন। বুদ্ধির প্রবণতা দেখিয়া প্রেমচন্দ্র মধ্যম সহোদর শ্রীরামকে ইংরাজী শিক্ষা এবং তৃতীয় সহোদর সীতারামকে ব্যাকরণ পাঠান্তে দর্শন শাস্ত্রের শিক্ষা দিবার কল্পনা করিলেন। ধীশক্তির প্রাখর্য্য দেখিয়া সীতারামকে প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক করিবেন ও দেশে টোল করিয়া দিবেন বলিয়া সঙ্কল্প জানাইলে পিতামাতা উভয়েই ইহাতে লোকান্তরিত মুনিরামের বংশোচিত কার্য্য করা হইবে বলিয়া অপার আনন্দ লাভ করিলেন। প্রেমচন্দ্রের অভিলষিত এই দুইটী সঙ্কল্প মধ্যে প্রথমটী কার্য্যে পরিণত হইল; দ্বিতীয়টী আর সিদ্ধ হইল না। সীতারাম কলিকাতায় অধ্যয়ন সময়ে তরুণ বয়সেই বিসূচিকা রোগে

কালগ্রাসে পতিত হইলেন। মধ্যম সহোদর শ্রীরাম প্রথমতঃ মিষ্টর্ ডেভিড্ হেয়ার সাহেবের স্কুলে পাঠ সময়ে বুদ্ধি কৌশলে ও পবিত্র চরিত্র-বলে তাঁহার প্রিয়পাত্র ও স্নেহপাত্র হয়েন, পরিশেষে সাহেব মহোদয়ের প্রযত্নে হিন্দুকলেজে পাঠ সমাপ্তির কিছু পূর্ব্বেই পাইকপাড়া ইষ্টেটের ভাবী উত্তরাধিকারী প্রতাপচন্দ্র সিংহ ও ঈশ্বরচন্দ্র সিংহের শিক্ষক ও তত্ত্বাবধায়ক-রূপে নিযুক্ত হয়েন। এই অবকাশে তিনি জমিদারী সম্পর্কীয় কার্য্যপ্রণালী ও পারস্য ভাষায় বিলক্ষণ পারদর্শিতা লাভ করেন। অনন্তর ইহারই অসাধারণ যত্ন ও বুদ্ধি কৌশলে পাইকপাড়া ইষ্টেটের যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল এবং রাজদ্বারে ও লোকদরবারে রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ ও ঈশ্বরচন্দ্র সিংহের অসীম সম্মান সমৃদ্ধি ও সমাজিক সমুন্নতি সাধিত হইয়াছিল। উদারচেতা এই দুইটী ভ্রাতা অকালে কালগ্রাসে পতিত না হইলে এবং প্রতিজ্ঞা পালনে যত্নপর হইলে শ্রীরাম চট্টোপাধ্যায় একজন বড় লোক হইতে পারিতেন।

অনুপম রূপগুণ সম্পন্ন তৃতীয় সহোদরের অকাল মৃত্যুতে প্রেমচন্দ্র সাতিশয় মর্ম্মাহত হইলেন এবং অপর সহোদরদিগের বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে একপ্রকার বীতরাগ হইয়া পড়িলেন। চতুর্থ সহোদর রামময় পল্লীগ্রামে টোলে পূর্ব্বারব্ধ ব্যাকরণ পাঠ করিতে লাগিলেন কিন্তু কনিষ্ঠ সহোদর রামাক্ষয়ের কোনপ্রকার জ্ঞান শিক্ষার উপায় করা হইল না। তৎকালে পল্লীগ্রামে গুরুমহাশয়ের পাঠশালা ব্যতীত অন্য কোনপ্রকার স্কুল আদি সংস্থাপিত ছিল না। কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে কলিকাতায় আনিলে পুত্রশোকাতুরা মাতার মনে বড়ই কষ্ট হইবে এবং আবার কোনপ্রকার বিপদ ঘটনা হইলে মাতার শোকাপনোদনে সমর্থ হইবেন না ভাবিয়া প্রেমচন্দ্রের চিত্ত নিয়ত দোলায়মান হইতে থাকিল। পরিশেষে ১৪।১৫ বৎসর বয়স সময়ে রামাক্ষয় স্বয়ং একদিন অকস্মাৎ কলিকাতার বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং কোন স্কুলে পড়িবেন বলিয়া জ্যেষ্ঠের নিকটে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। পিতামাতার অনুমতি লইয়া আসিয়াছেন শুনিয়া প্রেমচন্দ্র হৃষ্টচিত্তে কনিষ্ঠ সহোদরকে সংস্কৃত কলেজে প্রবিষ্ট করিয়া দিলেন। টোলে ব্যাকরণ পাঠ শেষ হইলে চতুর্থ সহোদর রামময়কেও উক্ত কলেজের সাহিত্য শ্রেণীতে

প্রবেশ করাইলেন। কিছুকাল পরেই কলেজের নিয়মিত পরীক্ষায় উভয় ভ্রাতার প্রতিপত্তি ও প্রথম বৃত্তি প্রাপ্তির কথা জানিতে পারিয়া একদিন প্রেমচন্দ্র প্রীতিপ্রফুল্লমুখে বলিলেন আজ আমার আনন্দপ্রস্রবণ দ্বিগুণিত বেগে বহিতেছে। এতদিন পরের ছেলেদের জ্ঞানোন্নতিতে আনন্দ অনুভব করিতাম, আজ ঘরের ছেলেরাও যশস্বী অপর বালকের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছেন জানিয়া বড়ই সুখী হইয়াছি। রামাক্ষয়কে যথাসময়ে অধ্যয়নার্থ আনি নাই বলিয়া অন্তরে যে একটা বিষাদের ভার ছিল, তাহা দূর করিতে সমর্থহইয়াছি। আশা করি, ভ্রাতারাও লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়া অধস্তন বালকদের জ্ঞানশিক্ষা বিষয়ে যত্ন করিবেন। বয়োবৃদ্ধদের যত্ন না থাকিলে কনিষ্ঠদের সম্যক্ জ্ঞানার্জন হয় না। জ্ঞানবান্ না হইলে কোন পুরুষ পিতার বা কর্ত্তার সমুচিত কার্য্য সম্পাদনে সমর্থ হয় না। প্রত্যেক পিতা বা তত্ত্বাবধায়ক পুরুষোচিত কার্য্যে যত্নবান্ না হইলে সমাজের কল্যাণ হয় না এবং জাতীয় গৌরব বর্দ্ধিত হয় না।

সংস্কৃতকলেজে প্রবিষ্ট হইবার ২।৩ বৎসর মধ্যে বঙ্গকবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সহিত প্রেমচন্দ্রের বন্ধুত্ব হয়। উভয়েই বঙ্গভাষার উন্নতি সাধন বিষয়ে যত্নবান্ হয়েন, কিন্তু অর্থ সংস্থান সম্বন্ধে দুই জনেরই অবস্থা তখন সমান। সন ১২৩৭ সালে (১৮৩০ খৃঃ অঃ) বাবু যোগেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উৎসাহে ও আনুকূল্যে ঈশ্বরচন্দ্র যখন "সংবাদপ্রভাকর" নামে সমাচারপত্রের প্রচার আরম্ভ করেন, তখন তিনি প্রেমচন্দ্রের সাহায্য অতি মূল্যবান্ জ্ঞান করেন। ইহার পূর্ব্বে ৫।৬ খানি বাঙ্গালা সমাচারপত্র প্রচারিত হইত। তন্মধ্যে সমাচারচন্দ্রিকা নামে কাগজখানি অনেক ভদ্রলোকে পাঠ করিতেন। সংবাদকৌমুদী নামে আর একখানি ব্রাহ্মদলের কাগজ ছিল। চন্দ্রিকার প্রচার বিষয়ে বাবু ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বিশেষ সাহায্য করিতেন এবং রাজা রামমোহন রায়ের পারিষদ সংস্কৃতবিদ্যালয়ের অন্যতম পণ্ডিত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ সংবাদকৌমুদীর প্রচার বিষয়ে যত্ন করিতেন। এই উভয় কাগজের লেখায় অত্যন্ত জেঠামী থাকিত বলিয়া প্রেমচন্দ্র বড় চটা ছিলেন। এই সমস্ত সমাচারপত্রের গৌরব হ্রাস করিতে হইবে বলিয়া প্রেমচন্দ্র ও ঈশ্বরচন্দ্র উভয়ে প্রতিজ্ঞারূঢ় হয়েন এবং অল্প দিন মধ্যে রচনাচাতুর্য্য

দ্বারা আপনাদের কাগজখানির উন্নতিসাধনে কৃতকার্য্য হয়েন। রাজপুরুষদিগের কার্য্যপ্রণালীর পর্য্যালোচনা করিতে এবং প্রস্তাবিত কোন বিধিনিয়মের বৈধাবৈধতা বিষয়ে নরম গরম দুই এক কথা বলিতে ইহারাই প্রথমে অগ্রসর হয়েন। ইঁহাদের যত্নে ও উৎসাহে জয়গোপাল তর্কালঙ্কার গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ প্রভৃতি অনেক কৃতবিদ্য ও বড় বড় লোক এই কার্য্যে যোগ দেন। পূর্ব্বকার সমস্ত কাগজ বিশেষতঃ সমাচারচন্দ্রিকার উপরে কটাক্ষ করিয়া প্রেমচন্দ্র প্রভাকরের প্রভা সমধিক সমুজ্জ্বল করিবার উদ্দেশে নিম্নলিখিত দুইটী শ্লোক রচনা করেন,—

"সতাং মনস্তামরস-প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ।
উদেতি ভাস্বৎসকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদনবপ্রভাকরঃ॥
নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেম্বিন্দীবরেষু ক্বচিদ্
ভ্রামং ভ্রামমতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ।
অদ্যোদ্যদ্বিমলপ্রভাকরকরপ্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে
স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরা স্বান্তদ্বিরেফা রসম্" ॥

চন্দ্রিকার উপরেই দ্বিতীয় শ্লোকটীর বিশেষ লক্ষ্য। বাস্তবিকই প্রভাকরের প্রভাবে চন্দ্রিকার রূপ অল্পদিন মধ্যেই মলিন ও বিলীন হইয়াছিল।

সময়ে সময়ে প্রভাকরের সাহায্য করিয়া তৃপ্তিলাভ না হওয়ায় গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ স্বয়ং "সংবাদভাস্কর" নামে একখানি কাগজ প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। ইহার শিরোভাগ বিভূষিত করিবার নিমিত্ত প্রেমচন্দ্র এই কবিতাটী রচনা করিয়া দেন,—

"ভ্রাতর্ব্বোধসরোজ! কিং চিরয়সে মৌনস্য নায়ং ক্ষণো
দোষধ্বান্ত! দিগন্তরং ব্রজ, ন তেঽবস্থানমত্রোচিতম্।
ভো ভোঃ সৎপুরুষাঃ! কুরুধ্বমধুনা সৎকৃত্যমত্যাদরাদ্
গৌরীশঙ্করপূর্ব্বপর্ব্বতমুখাদুজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ" ॥

তৎকালে বঙ্গভাষায় যে সকল সমাচার কাগজ বাহির হইত, তাহার শিরোভাগে এক একটী সংস্কৃত কবিতা দেওয়ার প্রথা প্রচলিত হইয়াছিল।

এইরূপ কবিতা রচনা করাইবার নিমিত্ত অনেককেই তর্কবাগীশের নিকটে আসিতেন। তাঁহার রচিত এইরূপ কবিতা সকল মধ্যে কলিকাতা বার্ত্তাবহ নামক কাগজখানির শিরোভাগে "কিংচান্দ্রী বিশদপ্রভা কিমথবা প্রভাকরী চাতুরী" ইত্যাদি মর্ম্মে যে কবিতাটী তর্কবাগীশ রচনা করিয়া দেন তাহা অতি শ্রুতিসুখকর হইয়াছিল মনে হয়। দুর্ভাগ্যক্রমে সমগ্র কবিতাটী সংগ্রহ করিতে অক্ষম হইয়াছি।

তখনকার সমাজের অবস্থা স্মরণ করিয়া কথিত কবিতাগুলি মনোযোগ-পূর্ব্বক পাঠ করিলে তর্কবাগীশের রচনাচাতুর্য্য এবং বঙ্গভাষার উন্নতি সাধন চেষ্টার পরিচয় পাওয়া যায়। সমাচার কাগজের সংখ্যাবৃদ্ধিতে তাঁহার আনন্দ বৃদ্ধি দেখা যাইত। তিনি বলিতেন উপযুক্ত সম্পাদক প্রকৃত সমাজসংস্কারক এবং নিপুণ উপদেশক অপেক্ষা সমধিক প্রতিষ্ঠাভাজন।

প্রভাকর প্রথমে সাপ্তাহিক পরে দৈনিক পত্ররূপে প্রচারিত হইত। এই উভয় সময়েই প্রেমচন্দ্র প্রভাকরের ক্ষুদ্র কলেবরকে শোভমান করিতে যত্ন করিতেন। উন্নতভাবে ঈশ্বরচন্দ্রের বড় লক্ষ্য থাকিত না জানিয়া প্রেমচন্দ্র স্বয়ং অনেক গুরুতর বিষয়গুলি তেজস্বিনী ভাষায় লিখিতেন। প্রেমচন্দ্রের লিখিত কোন প্রবন্ধবিশেষের উল্লেখ করা এখন আমাদের পক্ষে সহজ ব্যাপার নহে। ইশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সময়ে সময়ে বৈশাখের প্রভাকরে লেখকদের নাম উল্লেখ করিতেন। সন ১২৫৩ সালের ১লা বৈশাখের প্রভাকরে প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ প্রভৃতি লেখকগণের নাম নির্দ্দেশ করিয়া ঈশ্বরচন্দ্র এইরূপ লেখেন,—"শ্রীযুক্ত প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ যিনি এক্ষণে সংস্কৃতকলেজের অলঙ্কারশাস্ত্রের অধ্যাপক, তিনি লিপিবিষয়ে বিস্তর সাহায্য করিতেন। তাঁহার রচিত সংস্কৃত শ্লোকদ্বয় অদ্যাবধি প্রভাকরের শিরোভূষণ রহিয়াছে।

ঈশ্বরচন্দ্রের সঙ্গে প্রেমচন্দ্রের প্রণয় জন্মিলে কাগজের লেখা সম্বন্ধে সময়ে সময়ে পরস্পরের যে কথোপকথন হওয়া জানা গিয়াছিল, তাহার মধ্যে দুই একটা কথা এই স্থানে বলিলে অসঙ্গত হইবে না।

একদা প্রেমচন্দ্র ঈশ্বরচন্দ্রকে বলেন,—গুরুতর বিষয়ে হাত দিয়া অবসানে ছেব্লামিতে পরিণত হইতে দাও কেন? ইহাতে যে বড় রসভঙ্গ হয়? ঈশ্বরচন্দ্র বলিলেন,—চেষ্টা করিলেও আমি গম্ভীরভাবধারী অশেষ শক্তিমান্

ঈশ্বর বলিয়া পরিচিত হইতে পারিব না, কিন্তু এইরূপ ছেব্লামি করিলে অন্ততঃ "ফচ্‌কে ঈশ্বর" রূপে নামটা জারি করান আমার পক্ষে সহজ হইবে। তাই এইরূপ করি।

আর এক সময়ে ঈশ্বরচন্দ্রের এক বিষয়ে কয়েকটী পদ্য উল্লেখ করিয়া প্রেমচন্দ্র বলিলেন,—এই পর্য্যন্ত লিখিয়া ক্ষান্ত হইলে ভাল হইত, ইহাতে কবিতাগুলির গূঢ়ভাব অব্যাহত থাকিত ও অলঙ্কারসঙ্গত হইত। শেষের এই কয়েক পংক্তিতে এই ভাব একেবারে ঘাঁটা ছরকটা হইয়া পড়িয়াছে। ইহা শুনিয়া ঈশ্বরচন্দ্র উত্তর করিলেন—আপনি এখন অলঙ্কারের অধ্যাপক, অলঙ্কার পরিচ্ছদ আপনার দোকানের মাল। সাজান কোজান আপনার পক্ষে সহজ, কিন্তু আমি কবিতা-কামিনীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ খোলা রাখিতে ও দেখিতে বড় ভাল বাসি।

ক্রমে ঈশ্বরচন্দ্রের সঙ্গে প্রেমচন্দ্রের ঘনিষ্ঠতার হ্রাস হইয়া আসিতে লাগিল। ঈশ্বরচন্দ্র কলিকাতার বড় বড় লোকের ছেলেদের দলে মিশিলেন এবং পবিত্র চরিত্রটী কলুষিত হইতে দিতে লাগিলেন। রাত্রিকালে দুই জনে গোপনে ওস্তাদি কবিদলের গাওনা শুনিতে দৌড়িতেন। প্রেমচন্দ্র এই রোগটী একবারে পরিত্যাগ করিলেন; কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্রে কখন প্রেমচন্দ্রের অনুরাগের হ্রাস হয় নাই। তিনি সর্ব্বদা তাঁহার কবিত্বশক্তির প্রশংসা করিতেন। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ও গুড়গুড়ে (গৌরীশঙ্কর) ভট্টাচার্য্যের কবি-লড়াই-সময়ে প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ আক্ষেপ করিয়াছিলেন,—বঙ্গসাহিত্য এই উন্নতির পথে আরোহণ করিতেছিল, কিন্তু ইহাঁরা দুজনে যেরূপ কলম ধরিয়াছেন দেখ্‌ছি সব মাটি হলো—কাগজ পাঠে ভদ্রলোকের আর রুচি থাকিল না। তখনও ঈশ্বরের কবিত্বশক্তি সম্বন্ধে প্রেমচন্দ্র বলিয়াছিলেন,— "এ গুপ্তখনি অক্ষয্য"।

সময়ের স্রোতে তর্কবাগীশের চিত্তের পরিবর্ত্তন উপস্থিত। তিনি বাঙ্গালারচনায় যেমন লেখনী সংযত করিলেন, অমনি সংস্কৃতরচনার দিকে তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। কলেজে অধ্যাপনাকার্য্য নিয়মিতরূপে সম্পাদন করিয়া প্রাতে ও সায়ংকালে যে অবকাশ পাইতেন তাহা সংস্কৃতরচনায় নিয়োজিত করিতে লাগিলেন। তৎকালে রঘুবংশ প্রভৃতি কয়েকখানি মহাকাব্যের

মল্লিনাথকৃত টীকা বঙ্গদেশে প্রচলিত ছিল না। এই নিমিত্ত মিষ্টর উইলসন সাহেব নিয়ত পাঠ্য রঘুবংশের সংক্ষিপ্ত টীকা রচনা করিতে আদেশ করেন। তদনুসারে প্রথমে রামগোবিন্দ পণ্ডিত পরে নাথুরাম শাস্ত্রী রঘুবংশের কয়েক সর্গের টীকা করিয়া লোকান্তরিত হয়েন। পরে প্রেমচন্দ্র অবশিষ্ট কয়েক সর্গের টীকা রচনা করেন। টীকাসহ সমগ্র কাব্যখানি বিদ্যালয়ে পাঠনার নিমিত্ত মুদ্রিত হয়। সংস্কৃতরচনায় এই প্রেমচন্দ্রের প্রথম উদ্যম। অতঃপর সংস্কৃতরচনায় আগ্রহ জন্মিলে তিনি পূর্ব্ব নৈষধ ও রাঘবপাণ্ডবীয় এই দুরূহ মহাকাব্যদ্বয়ের টীকা রচনা করেন।. প্রেমচন্দ্রের টীকাসহ পূর্ব্ব নৈষধ প্রথমে এসিয়াটিক সোসাইটী হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। পরে ১৮৫৪ অব্দে তিনি নিজ ব্যয়ে নিজকৃত টীকাসহ পূর্ব্ব নৈষধ ও রাঘব পাণ্ডবীয় মুদ্রিত ও প্রচারিত করেন। আজ কাল রাঘব পাণ্ডবীয়ের পাঠ ও পাঠনা প্রায় দেখা যায় না, প্রেমচন্দ্রের টীকাসহ পূর্ব্ব নৈষধের সমাদর পূর্ব্ববৎ রহিয়াছে। ইহা দেখিয়া তাঁহার মধ্যম পুত্র শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ সম্প্রতি উহার তৃতীয় সংস্করণ প্রচারিত করিয়াছেন।

কালিদাসকৃত কুমারসম্ভবের সপ্তম সর্গ পর্য্যন্ত এদেশে প্রচলিত ছিল। সমুদায় গ্রন্থ পাওয়া যাইত না। পরে কাপ্তেন মার্সেল সাহেব ও স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের যত্নে অষ্টমাদি সর্গসহ সম্পূর্ণ গ্রন্থ পশ্চিম দেশ হইতে আনীত হইলে তর্কবাগীশ উহার টীকা রচনা করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। এই টীকাসহ অষ্টম সর্গ মুদ্রিত ও প্রচারিত করেন। আদর্শখানি অপরিশুদ্ধ এবং নবম আদি সর্গের রচনাপ্রণালী দৃষ্টে কালিদাস প্রণীত কি না সন্দেহ করিয়া অবশিষ্ট অংশে হস্তার্পণ করেন নাই। পরে প্রেমচন্দ্র খণ্ডকাব্য চাটুপুষ্পাঞ্জলি, মুকুন্দমুক্তাবলী এবং সপ্তশতীনামক গ্রন্থের টীকা করিয়া মুদ্রিত ও প্রচারিত করেন।

এদেশে পূর্ব্বে সংস্কৃত নাটকগুলি মুদ্রিত না হওয়ায় সাধারণের পাঠ ও পাঠনার নিতান্ত অসুবিধা ছিল। এই অসুবিধা দূর করিবার উদ্দেশে তর্কবাগীশ সর্ব্বপ্রথমে অগ্রসর হয়েন এবং ১৭৬১ শকে (১৮৩৯।৪০ খৃঃ অঃ) মহাকবি কালিদাস প্রণীত অভিজ্ঞানশকুন্তল মুদ্রিত করেন। অনন্তর ১৭৮১ শকে (১৮৬০ খৃঃ অঃ) সংস্কৃত কলেজের পূর্ব্বতন অধ্যক্ষ ই, বি, কাউএল

সাহেব মহোদয়ের আদেশ অনুসারে গৌড়দেশ প্রচলিত এবং দেশান্তরে মুদ্রিত কয়েকখানি আদর্শ অবলম্বন করিয়া তর্কবাগীশ সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা সহিত অভিজ্ঞানশকুন্তলের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রচারিত করেন।

ইহার অল্প দিবস পরে ১৭৮২ শকে (১৮৬০।৬১ খৃঃ অঃ) মুরারিমিশ্র-বিরচিত অনর্ঘরাঘব নাটকখানি ঐরূপ ব্যাখ্যাসহিত মুদ্রিত এবং প্রচারিত করেন।

এইরূপে ১৭৮৩ শকে (১৮৬১।৬২ খৃঃ অঃ) তর্কবাগীশ গৌড়দেশ প্রচলিত কবিবর ভবভূতি বিরচিত উত্তররামচরিত নাটকখানি বারাণসী এবং অন্ধ্রদেশ হইতে সমানীত আদর্শপুস্তকের সহিত মিলন ও সংশোধন করিয়া ব্যাখ্যাসহিত মুদ্রিত ও প্রচারিত করেন।

ইহার পরে তর্কবাগীশ একটী বৃহৎ কার্য্যে ব্যাপৃত হয়েন। মহাকবি আচার্য্য দণ্ডী প্রণীত কাব্যাদর্শ নামক প্রসিদ্ধ অলঙ্কার গ্রন্থখানি এদেশে একেবারে লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল। এতদ্দেশপ্রচলিত সাহিত্যদর্পণ প্রভৃতি অলঙ্কার গ্রন্থসকল অপেক্ষা কাব্যাদর্শের গুণালঙ্কার প্রভৃতির প্রণয়নপ্রণালী অতি উৎকৃষ্ট। বিদ্যোৎসাহী কথিত কাউএল সাহেব মহোদয়ের সাহায্যে পশ্চিম দেশ হইতে সমানীত কয়েকখানি আদর্শ অবলম্বন করিয়া তর্কবাগীশ বহু পরিশ্রমে এই জীর্ণোদ্ধার করেন এবং অতি বিস্তৃত ও বিশদ টীকা করিয়া ১৭৮৫ শকে (১৮৬৪ খৃষ্ট অব্দে) ইহা প্রচারিত করেন। মুদ্রিত পুস্তকগুলি অল্পদিন মধ্যে পর্য্যবসিত হইলে তাঁহার বংশীয়েরা ১৮৮১ খৃষ্ট অব্দে এই পুস্তকের পুনর্মুদ্রণ করিয়াছেন। কাব্যাদর্শে তর্কবাগীশ কীদৃশ কবিত্ব ও পাণ্ডিত্য প্রকটিত করিয়াছেন তাহা পাঠ করিয়া সহৃদয় ব্যক্তি পাঠমাত্রেই অবগত হইতেছেন।

এতদ্ভিন্ন কয়েকখানি নূতন গ্রন্থ প্রণয়নে তর্কবাগীশ হস্তার্পণ করিয়াছিলেন। প্রথম—পুরুষোত্তম রাজাবলীর বর্ণনা উপলক্ষে উজ্জয়িনীরাজ বিক্রমাদিত্য ও শালিবাহনের চরিত। ইহার ৪র্থ সর্গ পর্য্যন্ত রচিত হইয়াছিল। সম্পূর্ণ হইলে এইখানি এক মহাকাব্য হইত।

দ্বিতীয়—নানার্থসংগ্রহ নামক এক অভিধান। ইহাতে অকারাদি ক্রমে মকার আদি শব্দ পর্য্যন্ত সংগৃহীত হইয়াছিল।

তৃতীয়—একখানি নূতন অলঙ্কার গ্রন্থ। ইহাতে রস ও গুণ আদির নিরূপণপ্রণালী যেরূপ বিশদ ভাবে রচিত হইয়াছিল, সম্পূর্ণ হইলে গ্রন্থখানি পণ্ডিতসমাজে বিলক্ষণ সমাদৃত হইত সন্দেহ নাই। এই গ্রন্থগুলি সম্পূর্ণ হইতে না হইতে প্রেমচন্দ্রের জীবন শেষ হয়।

কলেজে অধ্যাপনাসময়ে সংস্কৃতমিশ্র পালী (লী) প্রভৃতি ভাষায় খোদিত তাম্রশাসন, প্রস্তরফলক প্রভৃতির সুসঙ্গত পাঠ স্থির করা প্রেমচন্দ্রের একটী কার্য্য ছিল। এই বিষয়ে প্রাবীণ্য বশতঃ তিনি এসিয়াটিক সোসাইটির তাৎকালিক প্রেসিডেণ্ট জেমস্ প্রিন্সেফ্ সাহেব মহোদয়ের নিকটে বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন। *মগধ, পূর্ব্ববঙ্গ, কলিঙ্গ প্রভৃতি দেশ হইতে সমানীত অনেক তাম্রপট্ট ও প্রস্তরফলক আদি প্রেমচন্দ্র বহু পরিশ্রমে সঙ্গতরূপে পাঠ করিতে সমর্থ হওয়ায় অনেক ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত আবিষ্করণ বিষয়ে প্রিন্সেফ সাহেব মহোদয় কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন এবং প্রেমচন্দ্রের সাহায্য বহুমূল্য জ্ঞান করিয়াছিলেন। তিনি এবং প্রোফেসর উইলসন সাহেব মহোদয় স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়াও প্রেমচন্দ্রকে বিস্মৃত হয়েন নাই। শাস্ত্রতত্ত্বনির্ণয় যিষয়ে সময়ে সময়ে উভয়েই প্রেমচন্দ্রকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইতেন এবং উত্তর পাইয়া সম্মান প্রকাশ করিতেন।

৫৭ বৎসর বয়স অতীত হইল। চিত্তের চাঞ্চল্য লক্ষিত হইতে লাগিল। বৈষয়িক কার্য্যে বিরাগ প্রকাশ হইতে থাকিল। প্রেমচন্দ্র প্রথমতঃ ছয় মাসের অবকাশ লইলেন। গয়া বারাণসী ও প্রয়াগ তীর্থে গমন এবং শাস্ত্রানুমোদিত শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। পূর্ব্ব সঙ্কেত অনুসারে এক সাধুর অন্বেষণে কয়েকদিন কাটাইলেন। বোধহয় তাঁহার দর্শন পাইলেন না। অবকাশের শেষে নিজকার্য্যে উপস্থিত হইলেন। কয়েক মাস নিয়মিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে করিতে প্রেমচন্দ্র অকস্মাৎ জাগরিত হইলেন। মোহ-আবরণ অপসারিত হইল। চিত্ত বিচলিত হইল। সাংসারিক ব্যাপারে তিনি একেবারে বীতরাগ ও চিরশান্তিসুখের নিমিত্ত সমুৎসুক হইলেন। বিদ্যালয়ের যে অলঙ্কারের আসন ন্যূনাধিক ৩২ বৎসর অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন তাহা পরিত্যক্ত হইল। ১৮৬৪ সালের জানুয়ারি মাসে পেন্সনের নিমিত্ত প্রার্থনা করা হইল। গার্হস্থ্যাশ্রম পরিত্যক্ত হইল।

বন্ধুবাক্য অবধীরিত হইল। তিনি বলিলেন,—আমি তীর্থ ভ্রমণে যাইব না, পবিত্র আত্মাই পরম তীর্থ, তীর্থে তীর্থে পরিভ্রমণ নিষ্ফল; কিন্তু গৃহেও আর বাস করিব না, গৃহে আর জনক জননী নাই, গৃহস্থের কার্য্য যথাসাধ্য সম্পাদন করা হইয়াছে। এক্ষণে গৃহে চিত্তবিক্ষেপের বহুতর কারণ উপস্থিত হইয়াছে। চরম সময় অনতিদূরবর্ত্তী। সংসার অপেক্ষা অধিকতর প্রীতিপদ বস্তুর সন্ধানে অবশিষ্ট সময় অতিবাহিত করিবার এবং গঙ্গাতীরে বাস করিবার বড় ইচ্ছা। বারাণসী গঙ্গা ও গঙ্গাধরের পুণ্যতীর্থ, তথায় এই পার্থিব পিণ্ড পরিত্যক্ত হয় এইটী মনের বাসনা। এই বলিয়া সকলের নিকটে অমনুতপ্ত হৃদয়ে বিদায় গ্রহণ করিলেন এবং কাশীধামে গিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। তথায় প্রায় ৪ বৎসর জীবিত ছিলেন। এই সময় অকারণে যাপিত হয় নাই। জ্ঞানানুশীলন, যোগসাধন, সাধুভাবের উদ্দীপন, বিদ্যাবিতরণ আদি কার্য্যে এই কয়েক বৎসর ব্যয়িত হইয়াছিল। প্রেমচন্দ্রের প্রশান্ত সৌম্যমূর্ত্তি, লাবণ্যপূর্ণ আকৃতি, ধর্ম্মনিষ্ঠা, স্থিরচিত্ততা এবং মিষ্টভাষিতা আদি গুণে সমাকৃষ্ট হইয়া অনেকগুলি হিন্দুস্থানীয় ছাত্র তাঁহার নিকটে পাঠস্বীকার করিয়াছিলেন। পীড়া সঞ্চারের পূর্ব্বদিবস পর্য্যন্ত তিনি ২৯।৩০ জন ছাত্রের পাঠনাকার্য্য সমাদরে সম্পাদন করিয়া প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন। ১২৭৩ সালের ১০ই চৈত্র শনিবারে তাঁহার ওলাউঠা হয়। ১২ই চৈত্র সোমবার (২৫শে এপ্রেল ১৮৬৭ খৃঃ অঃ) মনিকর্ণিকার ঘাটে প্রাণ বিয়োগ হয়। চরম সময় পর্য্যন্ত তাঁহার জ্ঞান অবসন্ন ও মুখবর্ণ বিশীর্ণ হয় নাই। ওষ্ঠাধর অপরিস্ফুট স্বরে কি মন্ত্রজপে নিযুক্ত ছিল।

কাশীতে পীড়া সময়ে পত্নী ব্যতীত প্রেমচন্দ্রের অপর আত্মীয়েরা কেহ নিকটে ছিলেন না। গুণানুরক্ত তত্রত্য ছাত্রেরাই পীড়া সময়ে সুশ্রূষা ও প্রাণান্তে অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া আদি পরম যত্নে সম্পন্ন করিয়াছিলেন। প্রেমচন্দ্রের পত্নী অদ্যাপি কাশীতে বাস করিতেছেন। তিনি বলেন—ওলাউঠা রোগ হইয়াছিল, কিন্তু রোগীকে মলমূত্র ক্লেদে কোন কষ্ট পাইতে হয় নাই। শেষ সময় পর্য্যন্ত তিনি উঠিয়া স্বয়ং মলত্যাগ আদি করিতে সমর্থ ছিলেন। অন্যের সাহায্য লইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিতেন। বিরক্তি প্রকাশ করিলেও আমি অনন্তকর্ম্মা হইয়া নিকটেই থাকিতাম। বিদেশ ও দূরবন্ধু

বলিয়া আমাকেও কোন কষ্ট অনুভব করিতে হয় নাই। রোগী সম্বন্ধে আমার কর্ত্তব্য কার্য্যেও ছাত্রেরা আগ্রহ পূর্ব্বক আসিয়া পড়িত বিদ্যাসাগরের স্বর্গীয় পিতামহাশয়ও নিয়ত তত্ত্বাবধান করিতেন। ক্রমে অবসাদ বৃদ্ধি হইতে থাকিলে সকলের অনুপস্থিতি সময়ে শয্যাপার্শ্বে কে রহিয়াছে ফিরিয়া দেখিবার কালে আমায় দেখিয়াই অমনি মুখ ফিরাইলেন—বলিলেন, তোমার সঙ্গে এখানকার সম্বন্ধ বোধ হয় শেষ হইল - সম্মুখে আসিয়া আর মমতা বাড়াইও না, কোন চিন্তা নাই, তুমি পুত্র কন্যার মাতা, পুত্র ও আত্মীয়গণ দ্বারা ঈশ্বর তোমার তত্ত্বাবধান করিবেন, আর কিছু বলিবার কথা নাই, একটী মাত্র অনুরোধ আছে; এইটী আমার শেষ অনুরোধ— রক্ষা করিবে—দেখিবে—আমি যদি জ্ঞানশূন্য হই, অমৃত বাবু আসিয়া যেন আমায় ডাক্তারখানার কোন জলীয় ঔষধ না খাওয়ান, গঙ্গাজল ব্যতীত কোন পানীয় আমার কণ্ঠায় যেন না যায়।

সার্ রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের জামাতা অমৃতলাল মিত্র মহাশয় প্রেমচন্দ্রের মধ্যম ভ্রাতার পরম হিতৈষী বন্ধু এবং প্রেমচন্দ্রেরপ্রতি বড়ই ভক্তিমান্ ছিলেন। স্বাস্থ্য নিমিত্ত তিনি তখন সিক্‌রোলে বাস করিতেছিলেন। কাশীতে বাঙ্গালি টোলায় প্রেমচন্দ্রের পীড়া শুনিয়া অবিলম্বে তাঁহার শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হয়েন এবং হোমিও প্যাথিক ঔষধ খাওয়াইবার নিমিত্ত যত্ন করেন।

প্রেমচন্দ্রের পত্নী তাঁহার শেষ আজ্ঞার মর্ম্ম জানাইলে অমৃতবাবু বলিলেন —কোন প্রকার জলীয় ঔষধ দেওয়া যাইবে না—গুঁড়া ঔষধ খাওয়াইবার কোন বাধা নাই, অধর্ম্মও নাই। এই বলিয়া তিনি কি কি গুঁড়া ঔষধ দেন কিন্তু কোন ফল দর্শে নাই। রোগের তীব্রতা দেখিয়া অমৃতলাল বাবু তারযোগে কলিকাতায় সমাচার পাঠাইয়া দেন। প্রেমচন্দ্রের চতুর্থ ভ্রাতা রামময় তর্করত্ন ও তৃতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ অবিলম্বে যাত্রা করেন, কিন্তু উহাঁরা কাশীতে মনিকর্ণিকার ঘাটে উপস্থিত হইবার সময়ে দাহাদি কার্য্য প্রায় শেষ হইয়াছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পিতা স্বর্গীয় ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তখন কাশীতে বাস করিতেছিলেন, তিনি প্রেমচন্দ্রের পীড়া ও অন্ত্যেষ্টি কার্য্য সময়ে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন।

৬১ বৎসর ৩ দিবসের দিন কাশীধামে গঙ্গাগর্ভে অশেষগুণচন্দ্র প্রেমচন্দ্রের পবিত্র জীবনপ্রবাহ অনন্তসময় সাগরে বিলীন হইল। এইটী তাঁহার চিবাভিলষিত বাসনা ছিল। পূর্ণ হইল। এই মহাপুরুষের জীবন বিশ্বাস বা আভ্যন্তরীণ পবিত্র ভাবের দৃঢ় ভিত্তিতে সংস্থাপিত ছিল। ধর্ম্মের পথে তিনি কখন ডাইনে বা বামে হেলেন নাই এবং অপরের যুক্তি প্রমাণের অপেক্ষা রাখেন নাই। ফলতঃ ধর্ম্মভাবে তাঁহার মনের গঠন অতি সমুন্নত ও সত্যালোকে সমুদ্ভাসিত ছিল। জ্ঞানবলে ও যোগবলে বলীয়ান হইলেও প্রেমচন্দ্র পূর্ব্ব পুরুষদের মত পরিণত বয়স পর্য্যন্ত পার্থিব সুখ ভোগে সমর্থ হইতে পারেন নাই। অপেক্ষাকৃত-অল্প বয়সেই মানবলীলা সম্বরণ করায় তাঁহার আত্মীয় স্বজন ও পরিচিত জন অপার বিষাদে মগ্ন হইয়াছিলেন। বিষাদের বিশিষ্ট কারণ ও ছিল। জ্ঞানীর জীবন—পবিত্র জীবন দীর্ঘ হইলেই জগতের মঙ্গল ও গৌরবস্থল। প্রেমচন্দ্রের জীবনপ্রবাহ দূর দেশে বিলীন হইতে হইতেও বহুতর হৃদয়ক্ষেত্র প্লাবিত ও সংস্কৃত করিয়াছিল। বিলুপ্ত হইলে শাকনাড়ার অবসথী বংশের পাণ্ডিত্যপ্রস্রবণ শুষ্কপ্রায় হইয়া উঠিল। প্রেমচন্দ্রের পরবর্ত্তীদিগের মধ্যে তাঁহার চতুর্থ ভ্রাতা রামময় তর্করত্ন ব্যতীত আর কেহই প্রকৃত পণ্ডিত পদ প্রাপ্ত হইতে পারেন নাই।

এই প্রকাণ্ড জ্ঞানরাশি প্রেমচন্দ্রের সঙ্গে সঙ্গেই কবিত্ব ও সহৃদয়তা বঙ্গভূমি হইতে অন্তর্হিত হইতে বসিয়াছে বলিলে বেশী বলা হইল বোধ হইবে না। চারিদিগে দৃষ্টিপাত করিতেছি প্রেমচন্দ্রের সমকক্ষ সহৃদয় বঙ্গমধ্যে দেখিতে পাইতেছি না।

প্রথম মুদ্রণের পর কয়েক জন কৃতবিদ্য এই পুস্তকের সমালোচনা করিয়াছেন। ইহাঁদের মধ্যে এক বিচক্ষণ ব্যক্তি উপরি লিখিত কয়েকটী কথা অতিশয়োক্তি দোষে দূষিত বলিয়া আক্ষেপ প্রকাশ করিয়াছেন। ইংরাজীতে কৃতবিদ্য মহোদয়দিগের সমক্ষে অতিশয়োক্তি দোষ বড় দোষ বলিয়া লক্ষিত হইবে সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ যাঁহারা সাক্ষাতে প্রেমচন্দ্রের এই গুণবত্তাবিশেষের পরিচয় পান নাই তাঁহারা আমার এই কয়েকটী কথায় বিস্মিত হইবেন সন্দেহ নাই। আমিও এই কয় কথা তখন অমুদ্ধত ভাবেই বলিয়াছিলাম এবং যে ধারণাপরবশ হইয়া উহা বলিয়াছিলাম সেই ধারণার

অন্যথাভাব অদ্যাপি লক্ষিত হইতেছে না বলিয়া বিশেষ পরিবর্ত্তন করিলাম না। প্রতিভাশালী কবির নিকটে সহৃদয়তার অভাব নাই সত্য কিন্তু ভাবে কয় জন? ভাবের মাধুরীতে মত্ত হয় কত জন? আমরা কিছুকাল স্বর্গীয় জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের এবং বহুদিন ধরিয়া প্রেমচন্দ্রের সহৃদয়তা প্রকাশের যে সকল অকপট লক্ষণ দেখিয়াছিলাম তাহা এখন আর অন্যে প্রায় দেখিতে পাইতেছি না। মৃদঙ্গধ্বনি সঙ্গে হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনে গৌরাঙ্গের যেরূপ প্রেম ভাবের আবেশ লক্ষিত হইত, সেইটী তাঁহারই নিসর্গসম্ভূত ভাব বিকাশ; তাহা অপ্রেমিকের অনুকরণ যোগ্য নহে। আমরা দেখিয়াছি কোন স্থানে ভাবব্যাঞ্জক নূতন কবিতা, অথবা কোন ছাত্রের রচনায় কবিত্ব-সূচক পদ সমুচ্চয় দেখিতে পাইয়া তাহা রসিক শিরোমণি প্রেমচন্দ্রকে শুনাইবার নিমিত্ত তর্কালঙ্কার ভাবগদগদচিত্তে, স্খলিত পদে, অলঙ্কারশ্রেণীতে দৌড়িতেছেন, স্কন্ধের চাদর অলক্ষিত ভাবে বারাণ্ডায় লম্বমান হইয়া পড়িয়াছে, সংজ্ঞা নাই। প্রেমচন্দ্রও খাঁটি ভাবসূচক দুই চারিটি পদ শুনিলেই হা! সাবাস! বলিয়া নৃত্যোন্মুখ হইতেন, প্রেমানন্দে ভাসিতে ভাসিতে ভাবরসোদ্দীপক শব্দ বিন্যাসের ব্যাখ্যায় বিদগ্ধতা প্রকাশ করিতেন ও কবিহৃদয়ের বিচিত্র সৌন্দর্য্য দর্শন এবং উৎসাহ বর্দ্ধন করিতেন। এইগুলি উহাঁদের অস্থিমজ্জাগত গুণ বা ভাবময় হৃদয়প্রসূন বলিয়া বুঝা যাইত। "একঃ শব্দঃ সুপ্রযুক্তঃ স্বর্গে লোকে চ কামদুঘ্ ভবতি" এই শ্লোকের মর্য্যাদা উহাঁদের নিকটেই রক্ষিত হইত। উহাঁদের নিকটেই ভাবের আদর দেখিতাম এবং উহাঁদের হৃদয় ভাবময় দেখিতাম। হৃদয় লইয়াই সকল কথা। হৃদয়স্পর্শী দৃশ্যেই দর্শকের মন আবর্জ্জিত হয়। এইরূপ হৃদয়বান্ মহাপুরুষদ্বয়ের প্রযত্নেই কিছুদিন সংস্কৃত সাহিত্যের মৌলিক শক্তির স্ফূর্ত্তি এবং ছাত্রবৃন্দের মানসিক সমুন্নতি দেখা গিয়াছিল। উহাঁদের এই স্বাভাবিক গুণের ছায়া কাব্যরসপ্রিয় ৺মদনমোহন তর্কালঙ্কারে কিয়ৎ পরিমাণে প্রতিফলিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই। এক্ষণে সেইরূপ বিশুদ্ধ তানলয়ের বিলয় হইতে বসিয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হইবে বোধ হয় না। সংস্কৃত সাহিত্যে লোকের সম্যক্‌রূপ আস্থা না জন্মিলে বঙ্গভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধন হইবে না এবং জাতীয় ভাষার পুষ্টিসাধন না হইলে জাতীয় গৌরবের

আশা নাই এই কথা প্রেমচন্দ্র সর্ব্বদা বলিতেন এবং বলিয়াই নিশ্চিন্ত থাকেন নাই ; স্বয়ং বদ্ধপরিকর হইয়া এই বিষয়ে সর্ব্বপ্রথমে পথপ্রদর্শক হইয়াছিলেন এবং নিজ গুরু জয়গোপাল তর্কালঙ্কারকেও এই পথে আনিয়াছিলেন।

মৃত্যুর তিন মাস পূর্ব্বে মধ্যম ভ্রাতার অনুনয় ও অনুরোধসূচক পত্র সকলের উত্তরে প্রেমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন—বিসূচিকা রোগে তাহার জীবন শেষ হইবে। ইতিপূর্ব্বে যৌবনে দুইবার এই রোগ হইয়াছিল, পরিত্রাণও হইয়াছিল। আগামী বৈশাখের পূর্ব্বে যে এই রোগ ঘটিবে তাহার পরিণাম দেখিয়া একবার বাটীতে যাইবার ইচ্ছা রহিল। প্রেমচন্দ্রের গণনার ফল অব্যর্থ। এই ফল অবগত হইয়া তিনি ৫৭ বৎসর বয়স হইতে চরম সময়ের নিমিত্ত নিয়ত প্রস্তুত ছিলেন। এক দিনের নিমিত্ত তাঁহাকে বিষণ্ণ বা শোকদুঃখে ম্লান দেখা যায় নাই। শেষাবস্থায় দেখিলে তাঁহাকে সর্ব্বদা প্রসন্নাত্মা ও সমাহিতচিত্ত বোধ হইত। সমীপস্থ ব্যক্তির সহিত কথোপকথন কালে প্রতি বাক্যাবসানেই তাঁহাকে আবার তখনি মৌনী, নাসাপ্রণয়ন ও ধ্যানপরায়ণ দেখা যাইত।

প্রেমচন্দ্রের পত্নী বলেন—কর্ত্তা জীবনের শেষভাগ যে ভাবে যাপন করিয়া সংসারলীলা সমাপন করিয়া গিয়াছেন, তাহা এখন ভাবিলে তাঁহাকে দেবতুল্য জ্ঞান করিতে হয়। সকল কার্য্যে ও বাক্যে সরলতা, সাধুতা, উদারতা ও চিন্তাশীলতা দেখা যাইত। ভয়, ক্রোধ, বিদ্বেষভাব বা বিরক্তির কোন চিহ্ন দেখা যাইত না। কেবল অধ্যাপনা সময়ে তাঁহার হাস্যালাপ শুনা যাইত ও সন্তোষানুভূতির লক্ষণ দেখা যাইত কিন্তু গৃহে তাঁহার মুখমণ্ডল ভিন্ন মূর্ত্তি ধারণ করিত। সর্ব্বদাই তাঁহার মুখে প্রশান্তভাব ও চিন্তা গাম্ভীর্য্যের চিহ্ন দেখিয়া পত্নীভাবে যাওয়ার কথা দূরে থাকুক, পরিচারিকাভাবেও নিকটে যাইতে মনে শঙ্কা হইত। পাছে তাঁহার আন্তরিক চিন্তা বা ধ্যান ধারণার বিঘ্ন হয় এইরূপ আশঙ্কা জন্মিত। ফলে এই সময়ে তাঁহাকে অনুরাগশূন্য, ভয়শূন্য, ক্রোধশূন্য এবং পলায়নের নিমিত্ত যেন নিয়ত উদ্যত বলিয়া বোধ হইত। কাশীতে অবস্থান সময়ে তাঁহার স্বাস্থ্য সুখ বা ক্ষুধার অভাব দেখা যায় নাই। মধ্যাহ্নে যে অন্ন-

ব্যঞ্জন ও রাত্রিতে যে ফল মূল আদি দেওয়া হইত প্রায় তাহার অবশেষ থাকিত না। ইচ্ছাপূর্ব্বক খাদ্যের অল্প বা বেশী পরিমাণ দিয়া পরীক্ষা করা হইত তাহাতেও কোন কথা বলিতেন না। যে কিছু খাদ্য দেওয়া হইত তাহা একবারেই দিতে হইত। আহারে বসিবার পরে কোন সামগ্রী দেওয়ার নিষেধ ছিল। শীত গ্রীষ্ম আদি সকল সময়ে রাত্রি ৩। ৪ টার মধ্যে তিনি শয্যা ত্যাগ করিয়া নিত্য কর্ম্ম সম্পাদন করিতেন; পরে জপের ঘরে প্রবেশ করিতেন এবং প্রভাত সময়ে স্নানার্থে গঙ্গাতীরে যাইতেন। কোন কোন রাত্রিতে একজন সন্ন্যাসী বা সাধু আসিতেন এবং উভয়ে জপের ঘরে প্রবেশিয়া ধ্যান আদি করিতেন। সাধুটি কোন্ দেশীয় কি প্রকার লোক বলিতে পারি না। দিবাভাগে কখন তাঁহাকে দেখিতে পাই নাই। তিনি বেশী কথা কহিতেন না এবং যাহা কিছু বলিতেন তাহাও বুঝিতে পারিতাম না। তিনি রাত্রিতে দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া দণ্ডকাষ্ঠের শব্দ করিতেন এবং সঙ্কেত বুঝিয়া কর্ত্তা দ্বার খুলিয়া দিতেন। এক রাত্রিতে কর্ত্তার নিত্য ক্রিয়া সমাপনের পূর্ব্বে আসিয়া সাধু প্রথমতঃ দণ্ডকাষ্ঠের শব্দ পরে কি এক ভাষায় শব্দ করিতে থাকায় আমি দ্বার খুলিতে যাইতেছিলাম তখন কর্ত্তা কি বলিয়া উত্তর দেন এবং সাধুর সম্মুখে যাইতে আমায় নিষেধ করেন। তদবধি আমি তাঁহার সাক্ষাতে বাহির হইতাম না। অন্তরাল হইতে দুই চারিবার তাঁহাকে যে দেখিয়াছিলাম তাহাতে তাঁহার মাহাত্ম্য আদির বিষয় কিছুই বুঝিতে পারি নাই। আমি অজ্ঞ স্ত্রীলোক। এরূপ লোকের কার্য্যকলাপ বা প্রকৃততত্ত্ব কি বুঝিব? সর্ব্বশুদ্ধ তিনিও পাঁচ সাতবারমাত্র বাসায় আসিয়াছিলেন মনে হয়। মধ্যাহ্ণ ভোজনের পূর্ব্বে কিছু দান করা কর্ত্তার একটী নিত্যকর্ম্ম ছিল। প্রাতে স্নান করিয়া আসিবার সময়ে কোন কোন দিন যথাশক্তি দান করিয়া আসিতেন এবং কোন কোন দিন ভোজনের পূর্ব্বে দানের নিমিত্ত রাস্তায় যাইতেন এবং কখন কখনও বিলম্বও করিতেন। উপযুক্ত পাত্র পান নাই বলিয়া বিলম্বর কারণ বলিতেন। কিরূপ উপযুক্ত পাত্রে তাঁহার দান ছিল বলিতে পারি না। পীড়ার পূর্ব্বে এক রাত্রিতে অনিদ্রাব্যতীত অন্য কোন অনিয়মের কথা স্মরণ হয় না।

প্রেমচন্দ্রের লোকান্তর গমন সময়ে তাঁহার চারিটী পুত্র ও তিনটী কন্যা

জীবিত ছিলেন। পুত্রগণ কালগতিকে পণ্ডিতের পদবী ও ব্যবসায় অবলম্বন করেন নাই সত্য কিন্তু সকলেই শাস্ত্রজ্ঞানাপন্ন, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষোত্তীর্ণ, সুশিক্ষিত এবং বিনীত। পৌত্র দৌহিত্রের সংখ্যাও কম নহে এবং তাহাদের জ্ঞানার্জন বিষয়ে ন্যূনতা দৃষ্ট হয় না কিন্তু এখনকার পড়্তা পৃথক্ ও শিক্ষা-প্রণালী পৃথক্। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণের পাশাপাশি চলিতে থাকায় কেহ আর সূক্ষ্ম শাস্ত্রার্থদর্শী মহাজ্ঞানী হইবার বাসনা রাখেন না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

প্রেমচন্দ্রের প্রকৃতি ও ধর্ম্ম।

প্রেমচন্দ্রের অবয়বসংস্থান সুগঠিত ছিল। তিনি কিছু খর্ব্বাকৃতি ও কমনীয়কান্তি ছিলেন। ললাটদেশ দীর্ঘ উন্নত এবং মুখমণ্ডল মধুর ও গাম্ভীর্য্যপূর্ণ ছিল। আকার দেখিলেই তাঁহাকে শান্তিপ্রিয়, স্থিরচিত্ত এবং বিনীত ও প্রতিভাসম্পন্ন বোধ হইত। বিনয়ের সঙ্গে তাঁহার বিলক্ষণ তেজস্বিতা ছিল। কথোপকথনকালে তিনি বালকের সঙ্গে বালকের ন্যায়, কৃষিজীবীর সঙ্গে কৃষকের ন্যায় এবং পণ্ডিতের সঙ্গে পণ্ডিতের ন্যায় আলাপ ও ব্যবহার করিতেন। শাস্ত্রব্যবসায়ী হইলেও বৈষয়িক কার্য্যে তাঁহার বিলক্ষণ বিচক্ষণতা লক্ষিত হইত। ছাত্রগণ তাঁহাকে ভয় ও ভক্তি করিত। তিনি সকল ছাত্রকে সমভাবে সস্নেহ নয়নে দেখিতেন। ছাত্রসঙ্গে কেবল পাঠনামাত্র সম্বন্ধ ছিল এমত নহে। তাহাদের জ্ঞানোন্নতি ও চিত্তোন্নতি বিষয়ে তাঁহার যত্ন ছিল। সংস্কৃত ভাষায় রচনা করিবার শিক্ষা দান বিষয়ে তাঁহার নিরতিশয় আগ্রহ ছিল। তিনি বলিতেন,—সংস্কৃত রচনায় ইদানীন্তনদিগের ঐকান্তিক যত্ন ও প্রাবীণ্য না জন্মিলে এই মৃতকল্প ভাষার পুনরুজ্জীবনের আশা নাই। কোনও ছাত্রের রচনায় ভাবব্যঞ্জক ললিত পদাবলী দেখিতে পাইলে তাঁহার আনন্দের পরিসীমা থাকিত না। তাহা অন্য ছাত্রগণকে পড়িয়া শুনাইতেন এবং উৎসাহ বর্দ্ধন করিতেন। রচনা শিক্ষা সম্পর্কে তাঁহার প্রিয় ও প্রধান ছাত্র স্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যাহা কিছু লিখিয়াছিলেন তাহা এই স্থানে সন্নিবেশিত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। সংস্কৃত ভাষায় রচনা করা দুরূহ, এজন্য পরীক্ষার সময় উপস্থিত হইলে পলায়ন করিতেন বলিয়া বিদ্যাসাগর এইরূপ লিখিয়াছিলেন ;—

"১৮৩৮ খ্রীষ্টীয় শকে এই নিয়ম হয়, স্মৃতি, ন্যায়, বেদান্ত এই তিন উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রদিগকে বার্ষিক পরীক্ষার সময়ে গদ্যে ও পদ্যে সংস্কৃত রচনা করিতে হইবেক ; যাঁহার রচনা সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইবেক, সে গদ্যে এক

শত টাকা ও পদ্যে এক শত টাকা পারিতোষিক পাইবেক। এক দিনেই উভয়বিধ রচনার নিয়ম নির্দ্ধারিত হয়; দশটা হইতে একটা পর্য্যন্ত গদ্য রচনা, একটা হইতে চারিটা পর্য্যন্ত পদ্যরচনা। গদ্য পদ্য পরীক্ষার দিবসে দশটার সময়ে সকল ছাত্র পরীক্ষাস্থলে উপস্থিত হইয়া লিখিতে আরম্ভ করিলেন। অলঙ্কারশাস্ত্রের অধ্যাপক পূজ্যপাদ প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ মহাশয় আমায় অতিশয় ভাল বাসিতেন। তিনি পরীক্ষাস্থলে আমায় অনুপস্থিত দেখিয়া বিদ্যালয়ের তৎকালীন অধ্যক্ষ চিরস্মরণীয় কাপ্তেন জি, টি, মার্শল সাহেব মহোদয়কে বলিয়া বলপূর্ব্বক আমায় তথায় লইয়া গিয়া এক স্থানে বসাইয়া দিলেন। আমি বলিলাম,—আপনি জানেন সংস্কৃতরচনায় প্রবৃত্ত হইতে আমার কোনও মতে সাহস হয় না; অতএব কি জন্যে আপনি আমায় এখানে আনাইয়া বসাইলেন। তিনি বলিলেন,—যাহা পার কিছু লিখ; নতুবা সাহেব অতিশয় অসন্তুষ্ট হইবেন। আমি বলিলাম,—আর সকলে দশটার সময় লিখিতে আরম্ভ করিয়াছে; এখন এগারটা বাজিয়াছে, এই অল্প সময়ে আমি কত লিখিতে পারিব। এই কথা শুনিয়া সাতিশয় বিরক্তি প্রকাশ করিয়া তিনি যা ইচ্ছা কর বলিয়া চলিয়া গেলেন।

সত্য কথনের মহিমা গদ্যরচনার বিষয় ছিল। আমি এগারটা হইতে বারটা পর্য্যন্ত বসিয়া রহিলাম, কিছুই লিখিতে পারিলাম না। পূজ্যপাদ তর্কবাগীশ মহাশয় আমি কি করিতেছি দেখিতে আসিলেন; এবং কিছুই না লিখিয়া বিষণ্ণ বদনে বসিয়া আছি ইহা দেখিয়া নিরতিশয় রোষপ্রকাশ করিলেন। আমি বলিলাম,—মহাশয়! কি লিখিব কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। তিনি বলিলেন,—"সত্যং হি নাম" এই বলিয়া আরম্ভ কর। তদীয় আদেশ অনুসারে "সত্যং হি নাম" এই আরম্ভ করিয়া অনেক ভাবিয়া এক ঘণ্টায় অতি কষ্টে কতিপয় পংক্তিমাত্র লিখিতে পারিলাম। আমি স্থির করিয়া রাখিয়াছিলাম পরীক্ষক মহাশয়েরা আমার রচনা ও রচনার মাত্রা দেখিয়া নিঃসন্দেহ উপহাস করিবেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই আমিই গদ্যরচনায় পুরস্কার পাইলাম।

পারিতোষিক বিতরণের পর পূজ্যপাদ তর্কবাগীশ মহাশয় আমায় বলি-

লেন,—দেখ তুমি কোনও মতে রচনার পরীক্ষা দিতে সম্মত ছিলে না। আমি পীড়াপীড়ি করিয়া পরীক্ষা দিতে বসাইয়াছিলাম তাহাতেই তুমি একশত টাকা পারিতোষিক পাইলে। তোমার রচনা দেখিয়া সকলে সন্তুষ্ট হইয়াছেন। অতঃপর রচনাবিষয়ে আর তুমি পরাঙ্মুখ হইও না। এই সকল কথা শুনিয়া আমার কিঞ্চিৎ সাহস ও উৎসাহ হইল। তৎপরে আর আমি রচনা বিষয়ে পরাঙ্মুখ হইতাম না"।

তর্কবাগীশের অন্যতম ছাত্র ৺ মদনমোহন তর্কালঙ্কার সংস্কৃত বিদ্যালয়ে সাহিত্য শাস্ত্রের অধ্যাপক হইলে তিনিও তর্কবাগীশের প্রণালী অনুসারে সংস্কৃতরচনা শিক্ষা বিষয়ে যত্নবান্ হইয়াছিলেন। একদা মধ্যাহ্ন সময়ে পূর্ব্বপরিচিত একটী ভদ্রলোক সাহিত্যের শ্রেণীতে আসিয়া কোনও এক বিষয়ে একটী ভাল কবিতা রচনা করিয়া দিতে তর্কালঙ্কার মহাশয়কে অনুরোধ করিলেন। তর্কালঙ্কার মহাশয় বলিলেন,—মহাশয়! যখন আপনি এখান পর্য্যন্ত আসিয়াছেন, তখন আমার কবিতায় আর কাজ কি? আমার পূজ্যপাদ গুরুর সমীপে একবার চলুন। এই বলিয়া তাঁহাকে অলঙ্কারের শ্রেণীতে তর্কবাগীশের নিকটে লইয়া রাখিয়া আসিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরেই ঐ ব্যক্তি একখানি কাগজ হস্তে আসিয়া তাহা তর্কালঙ্কারকে দেখাইলেন। তর্কালঙ্কার দেখিলেন তর্কবাগীশ দীর্ঘচ্ছন্দে তিনটী কবিতা রচনা করিয়া দিয়াছেন। কবিতাগুলি তিনি উচ্চৈঃস্বরে আবৃত্তি করিলেন এবং বলিলেন, আমি তিন দিবস যত্ন করিলেও এইরূপ মনোহারিণী কবিতা রচনা করিতে পারিতাম কি না সন্দেহ। আমি জানিতাম, তর্কবাগীশ মহাশয়ের মস্তকরূপ মুচি নিয়ত তাওয়ান আছে, ভাবরূপ স্বর্ণ ফেলিয়া দিলেই গল্‌গল করিয়া বাহির হইয়া পড়ে; এই নিমিত্ত আপনাকে আসল খনিতে লইয়া গিয়াছিলাম।

একদা বীরভুম জেলার অন্তর্গত হেতমপুরের রাজবাটীতে কলিকাতার সংস্কৃত দ্যিালয়ের প্রধান্ প্রধান অধ্যাপকগণের সঙ্গে প্রেমচন্দ্রের নিমন্ত্রণ হয়। এই সময়ে নবদ্বীপ, ভাটপাড়া, বাঁশবেড়ে প্রভৃতি স্থানের বড় বড় পণ্ডিতগণ আহূত হয়েন। বঙ্গদেশ মধ্যে কোনও স্থানে এক সময়ে এতগুলি প্রধান প্রধান পণ্ডিতের সমাগম ও শ্রাদ্ধক্রিয়ার এরূপ সমারোহ দেখা যায়

নাই। সংস্কৃত বিদ্যালয়ের অন্যতম পণ্ডিত স্মরণীয় ৺ তারানাথ তর্কবাচস্পতি কলিকাতা অঞ্চলের পণ্ডিতগণের পক্ষে অধ্যক্ষতা করিয়াছিলেন। রাজবাটীর মনোনীত রামসুন্দর দরবেশ নামে একজন পণ্ডিত প্রধান অধ্যক্ষের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। রামসুন্দর দরবেশ দিগ্‌গজ পণ্ডিত। সর্ব্বশাস্ত্রে তাঁহার প্রগাঢ় অধিকার। ধর্ম্মে বামাচার এবং স্বয়ং দাম্ভিকতার একাধার। তাঁহার বয়স অশীতিবর্ষের অধিক হইয়াছিল। আহূত পণ্ডিতমণ্ডলী মধ্যে যিনি যত বড় বিদ্বান্ হউন্ না কেন বিদায়ের পরিমাণ ধার্য্য হইবার পূর্ব্বে দরবেশ শাস্ত্রীর নিকটে তাঁহার পরিচয় দিবার নিয়ম নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। এই পরীক্ষা সময়ে রামসুন্দরের অসুন্দর ব্যবহার, নিজ দাম্ভিকতা বিস্তার এবং মর্ম্মভেদী ব্যঙ্গোক্তিতে অনেক পণ্ডিতকে জড় সড় হইতে হইয়াছিল এবং কাহাকে কাহাকেও অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিতে করিতে আসিতে হইয়াছিল। প্রেমচন্দ্রের পূর্ব্বে অনেক পণ্ডিতের বিদায় হইয়া গিয়াছিল। উপস্থিত হইবার পর দিন প্রাতেই তিনি দরবেশ শাস্ত্রীর নিকটে উপনীত হয়েন এবং অলঙ্কারশাস্ত্রের অধ্যাপনা করেন, পূর্ব্বনৈষধের টীকা করিয়াছেন বলিয়া ৺ তারানাথ তর্কবাচস্পতি তাঁহার পরিচয় দেন। তৎকালে দরবেশ শাস্ত্রী আপন বাসায় ৬। ৭টী বামায় পরিবেষ্টিত হইয়া বসিয়াছিলেন এবং এক বামা তাঁহাকে তত প্রাতেই অন্ন ব্যঞ্জন আহার করাইতেছিলেন। আহারান্তে দরবেশ শাস্ত্রী প্রেমচন্দ্রের প্রতি সুতীক্ষ্ণ কটাক্ষ নিক্ষেপ পূর্ব্বক বলিলেন,—"নৈষধের টীকাকারক" এ আস্পর্দ্ধার পরিচয় দেওয়ার প্রয়োজনাভাব; তিনি উল্লিখিত টীকা দেখেন নাই; দর্শন শাস্ত্রের সহায়তা ব্যতীত কেহ নৈষধের টীকা করিতে পারে তাঁহার বিশ্বাস নাই এবং নৈষধের প্রকৃত ব্যাখ্যা করিতে সাহসী এরূপ কোনও পণ্ডিত বঙ্গমধ্যে আছে কি না জানেন না"। এই বলিয়া রামসুন্দর দর্শনঘটিত ৩টী নৈষধের কবিতা ক্রমে আবৃত্তি করিয়া প্রেমচন্দ্রকে অর্থ করিতে বলিলেন। প্রেমচন্দ্র অবিচলিত ভাবে দুইটী কবিতার বিশদরূপে ব্যাখ্যা করিলেন। তৃতীয় কবিতার বিশদরূপে ব্যাখ্যা করিতে করিতে ন্যায়ঘটিত সিদ্ধান্তের যেমন আলোচনা করিতেছেন অমনি রামসুন্দর অকস্মাৎ উঠিয়া বলা নাই কহা নাই একবারে আপন দক্ষিণ চরণ উত্তোলন পূর্ব্বক

প্রেমচন্দ্রের মস্তকে বুলাইয়া দিলেন এবং বলিলেন,—"অনেক ব্যাটাকে দেখিলাম, তোর ব্যাকরণ ও দর্শন আদিতে জ্ঞান ও কাব্যের ব্যাখ্যা বিষয়ে প্রবীণতা দেখিয়া বড়ই প্রীতিলাভ করিলাম, দীর্ঘজীবী হও"। প্রেমচন্দ্র রামসুন্দরের অদম্য দাম্ভিকভাব এবং অদ্ভুত অশিষ্টাচার দেখিয়া যেমন বিস্মিত হইলেন, তাঁহার সন্তোষ সমুৎপাদনে সমর্থ হইয়া নিস্তার পাইলেন বলিয়া মনে মনে তেমনি প্রীতিলাভ করিলেন। মস্তকে পদাঘাত বিনীত ভাবে সহ্য করিলেন।

একদা সৌরাষ্ট্র দেশীয় একজন পণ্ডিত কলিকাতার সংস্কৃত বিদ্যালয়ে আসিয়া ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সঙ্গে কথোপকথন করিতে করিতে পূর্ব্ব নৈষধের টীকাকারক প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ বঙ্গদেশের কোন স্থানের লোক ছিলেন? উত্তর ভাগের টীকা সমাপন না করিয়া তাঁহার লোকান্তরিত হওয়া অতি পরিতাপের বিষয়, ইত্যাদি বলিয়া আক্ষেপ করিতেছিলেন, এমন সময়ে ঈশ্বরচন্দ্র ব্যস্ত হইয়া বলিলেন,—আপনি আমার পূজ্যপাদ গুরু প্রেমচন্দ্রকে সুস্থশরীরে জীবিত থাকিতে থাকিতে স্বর্গীয় বলিয়া কেন গণনা করিতেছেন? পণ্ডিতজী বলিলেন,--কি প্রেমচন্দ্র জীবিত? এবং তিনি তোমার গুরু! রচনাপ্রণালী দেখিয়া আমি তাঁহাকে লোকান্তরিত প্রাচীন সম্প্রদায়ের একজন পণ্ডিত বলিয়া স্থির করিয়াছিলাম। ইচ্ছা হইলে এখনি আপনার সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ করাইতে পারি বলিয়া ঈশ্বরচন্দ্র বলিলেন। এইক্ষণে হইলে দ্বিতীয় ক্ষণের প্রতীক্ষা করি না, এই বিদ্যালয়ের পুস্তক দেখিবার ইচ্ছা ছিল তাহা এখন সংযত করিলাম বলিয়া পণ্ডিতজী কহিতে লাগিলেন। অবিলম্বে উভয়ের সম্মিলন হইলে শাস্ত্রীয় নানা বিষয়ে কথোপকথন চলিল। পরিশেষে উত্তর নৈষধের টীকা এপর্য্যন্ত কেন মুদ্রিত করেন নাই এই নিমিত্ত গুজরাটের পণ্ডিতগণের নিকটে আপনি কৈফীয়ত দিতে বাধ্য বলিয়া পণ্ডিতজী আক্ষেপ করিয়াছিলেন।

প্রেমচন্দ্র যে সময়ে সংস্কৃত বিদ্যালয়ের পদ পরিত্যাগ করেন তখন এই বিদ্যালয়ের সমুন্নত প্রৌঢ়াবস্থা বলিতে হইবে। তখন দর্শন বিভাগে অশেষ বিদ্যাপঞ্চানন জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন, স্মৃতিবিভাগে স্মার্ত্ত শিরোমণি

ভরতচন্দ্র শিরোমণি, ব্যাকরণ বিভাগে গীষ্পতিপ্রতিম তারানাথ তর্কবাচস্পতি প্রভৃতি পণ্ডিতগণ এবং অধ্যক্ষের পদে ডাক্তর ই, বি, কাউয়েল সাহেব মহোদয় অধিষ্ঠিত থাকিয়া বিদ্যালয়ের গৌরব বিস্তার করিতেছিলেন। এই পণ্ডিত মহোদয়গণ যে যে শাস্ত্রের অধ্যাপনা করিতেন, তাহাতে উহাঁরা অদ্বিতীয় বা উচ্চদরের পণ্ডিত ছিলেন, এইমাত্র বলিলে শাস্ত্রতত্ত্বে উহাঁদের সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার সঙ্কোচমাত্র করা হয়। বস্তুতঃ জ্ঞান বিজ্ঞান বিষয়ে উহাঁদের অগাধতা, গুণবত্তা, গুণগ্রাহিতা ও উদারতা আদি স্মরণ করিলে এবং আজকালের অবস্থার সঙ্গে তুলনা করিলে স্বর্গ মর্ত্ত্যের প্রভেদ জ্ঞান আসিয়া অন্তরকে বড়ই ব্যাকুলিত করে। এক একটী করিয়া এই সকল রত্ন যেমন খসিয়াছে, সেই পরিমাণে বিদ্যালয় মলিনপ্রভ হইয়া পড়িয়াছে সন্দেহ নাই। ভারতের এই শোচনীয় ভাব দাঁড়াইয়াছে। যেমন যাইতেছে—তেমন আর হইতেছে না।

কাউয়েল সাহেব মহোদয় উইলসন সাহেব প্রভৃতির ন্যায় প্রেমচন্দ্রের গুণপক্ষপাতী হইয়াছিলেন এবং তাঁহার প্রতি বড় শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন। সাহেব মহোদয় প্রেমচন্দ্র বিদায় লইয়া যাইবার সময়ে দুঃখসূচক এই কবিতাটী রচনা করিয়াছিলেন,—

"আশাঃ সর্ব্বাস্তিমিরবলিতা অস্তলীনোঽংশুমালী-
ভ্যুৎকণ্ঠাধোমুকুলিতদৃশোঽপ্যাকুলায়া নলিন্যাঃ।
অন্তঃপুষ্পং প্রতিনিধিরভূৎ স্বর্ণবর্ণাভরেণু-
শ্চিন্তারূঢ়া বিরহিহৃদয়ে প্রোষিতস্যেব মূর্ত্তিঃ"॥

প্রেমচন্দ্রের লোকান্তর গমনের বার্ত্তা শুনিয়া পরিতাপিত হৃদয়ে সাহেব মহোদয় বিলাত হইতে যে এক পত্র লিখিয়াছিলেন এবং প্রথম মুদ্রিত জীবনচরিত পাইয়া যাহা কিছু লিখিয়াছিলেন তৎসমুদায় পরিশিষ্টে—সন্নিবেশিত করা হইল।

কলুটোলানিবাসী কৃষ্ণমোহন মল্লিক মহোদয় তর্কবাগীশের প্রতি বড় শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতেন। তাঁহার নিকটে তর্কবাগীশ কিছুকাল নিয়মিতরূপে সেক্সপীয়র প্রভৃতি প্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য কবিগণের প্রণীত ভাল ভাল কাব্যগ্রন্থের

ব্যাখ্যা শুনিতেন। হ্যাম্‌লেটের পাগ্‌লামীর পারিপাট্য, ভারতবর্ষীয় ডাইন ও কামরূপী ভূত দানবাদির মত ম্যাকবেত ও টেম্পেষ্টে প্রদর্শিত ডাইন প্রভৃতির কার্য্যপ্রণালী এবং মন্ত্র তন্ত্রের ঘনিষ্ঠ সৌসাদৃশ্য, মার্চেণ্ট অব্ ভিনিসে ছদ্মবেশধারিণী ব্যবহারকুশলিনী পোর্‌সিয়ার অদ্ভুত তর্কচাতুর্য্য প্রেমচন্দ্রের বড় বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিল। তিনি বলিতেন, পাশ্চাত্য কবিগণের নাটকে যথাস্থানে মানবজাতির শারীরিক ও মানসিক বৃত্তি সকলের যেরূপ পূর্ণবিকাশ এবং বস্তুস্বভাবের যে প্রকার সর্ব্বাঙ্গীন স্ফূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে উহাদের দৃশ্য কাব্যগুলি সংস্কৃত নাটকাবলির ন্যায় এক সময়ে উৎকর্ষের চরম সীমায় উপস্থিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু এই দৃশ্য কাব্যগুলি অনেক বিষয়ে আমাদের অলঙ্কার শাস্ত্রের নিয়মসঙ্গত নহে। রঙ্গমধ্যে বধ ও যুদ্ধাদির অভিনয় শিষ্টাচার ও রুচির বিরুদ্ধ। তিনি ইহাও বলিতেন, সংস্কৃত নাটকগুলি পাশ্চাত্য নাটক সকল অপেক্ষা সমধিক প্রাচীন। পূর্ব্বতন মুনিগণ প্রণীত নটসূত্র আদি ইদানীন্তনদিগের দুর্ব্বোধ হইয়া উঠিতেছে। পাশ্চাত্য নাটক সকলের এখনও সে অবস্থা হয় নাই।

আচার ব্যবহার ও কথোপকথন আদি বিষয়ে কোনও ছাত্রের সাহেবি ধরণ বুঝিতে পারিলে তর্কবাগীশ নিরতিশয় বিরক্তি প্রকাশ করিতেন। তিনি একবার কয়েকটী ছাত্রকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন,—ইংরাজদিগের যেমন কতকগুলি অসাধারণ গুণ আছে, তেমন কতকগুলি অসামান্য দোষও লক্ষিত হইয়া থাকে। যে জাতীয় লোক ব্যবসায়কুশল ও দাক্ষিণ্যশূন্য দোকানদার, যাহাদের প্রকাশ্য ও গূঢ়রূপ দুইটী চরিত্র; যাহাদের পশ্চাতে একরূপ এবং সম্মুখভাগে অন্যরূপ পরিচ্ছদ, তাহাদের অনুকরণচেষ্টা কেন? দেশের অবস্থানুসারে আমরা সকল বিষয়ে যখন খাঁটি সাহেব হইতে পারিব এরূপ আশা নাই, যখন সর্ব্বজাতি সমক্ষে আর্য্যসন্তান বলিয়া এবং মুনিগণসঞ্চিত রত্নরাশির উত্তরাধিকারী বলিয়া পরিচিত থাকিলে আমাদের অতুল গৌরব; যখন আমরা কোনও বিষয়ে আকণ্ঠ অভাবগ্রস্ত নহি. তখন এরূপ অনুকরণ-লালসার প্রয়োজন কি? অনুকরণলোলুপ ব্যক্তিগণ ইংরাজদিগের কেবল দোষগুলিরই অনুকরণ করিতেছেন,

গুণগ্রামের পক্ষপাতী নহেন কেন? চতুর্দ্দিকে বহুতর প্রলোভনের সামগ্রী বর্ত্তমান; দিন দিন পাশ্চাত্য প্রথার প্রাদুর্ভাব হইতে চলিল, সর্ব্বদা সকলেরই সাবধান থাকা আবশ্যক দাঁড়াইতেছে। ফলতঃ তর্কবাগীশের অনুশাসন প্রায় নিষ্ফল হইত না।

সাহিত্যদর্পণ নামক অলঙ্কার-গ্রন্থের রামচরণকৃত টীকা তৎকালে মুদ্রিত হয় নাই পূর্ব্বে বলা হইয়াছে (১)। তর্কবাগীশের নিজের যে একখানি হস্ত-লিখিত টীকা ছিল তাহা ছাত্রদের ব্যবহার নিমিত্ত অলঙ্কারশ্রেণীতে রাখিতেন। ছাত্রেরা পুথির এখানকার সেখানকার পাতা বাহির করিয়া আপন আপন বাসায় লইয়া যাইতেন। অধ্যাপনা সময়ে কখন কখন দেখিবার আবশ্যক হইলে পত্র মিলিত না। এই নিমিত্ত পুথির পাতা সকল কেহ আপন বাসায় লইয়া যাইতে পারিবেন না বলিয়া তর্কবাগীশ নিষেধ করিয়াছিলেন।

এই নিষেধ আজ্ঞার অল্প দিন পরেই এক দিবস অপরাহ্নে নিয়মিত সময়ের কিছু পূর্ব্বে তর্কবাগীশ বিদ্যালয় হইতে বহির্গত হইয়া যান। এই সময়ে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ঐ পুথির কতকগুলি পাতা লইয়া আপন বাসায় যাইতেছিলেন। তৎপূর্ব্বেই প্রবলবেগে এক পস্‌লা বৃষ্টি হওয়ায় পথিমধ্যে পদস্খলিত হইয়া ঈশ্বরচন্দ্র পড়িয়া যান এবং নিজের পরিধেয় বস্ত্র ও অন্যান্য পুস্তকের সঙ্গে পুথির পাতাগুলিও ভিজিয়া যায়। ঈশ্বরচন্দ্র শশব্যস্ত হইয়া একজন ভুনোওয়ালার দোকানে প্রবেশ পূর্ব্বক তাহার উত্তপ্ত দীর্ঘ চুলার একপার্শ্বে আপনার আর্দ্র চাদরখানির কিয়দংশ বিস্তৃত করিয়া তাহার উপর সর্ব্বাগ্রে অধ্যাপকের পুথির পত্রগুলি শুষ্ক করিতেছেন, এমন সময়ে তর্কবাগীশ ঐ পথ দিয়া নিজ বাসায় ফিরিয়া আসিতেছিলেন, ঈশ্বরচন্দ্র পূর্ব্বোক্ত অবস্থায় তাঁহার নয়নপথে পতিত হইলেন। একি ঈশ্বর? বলিয়া তর্কবাগীশ জিজ্ঞাসিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র একেবারে তটস্থ। পরিশেষে আপন পর্য্যাকুলতা সংযত করিয়া যাহা ঘটিয়াছিল তাহা বলিলেন এবং গুরুর আজ্ঞা লঙ্ঘনের হাতে হাতে ফল বলিয়া অনুতাপ প্রকাশ করিলেন। দেখিতেছি তুমি আর্দ্র বস্ত্রে অনেকক্ষণ আছ, পীড়া হইবে, এইখানি পরিধান কর বলিয়া তর্কবাগীশ আপন উত্তরীয়খানি ঈশ্বরচন্দ্রের গাত্রে ফেলিয়া দিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র কোন-

(১) শুনিলাম ঐ টীকা শ্রীভুবনমোহন বসাক সম্প্রতি মুদ্রিত করিয়াছেন।

মতে তাহা পরিধান করিতে সম্মত হইলেন না। অবশেষে ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিয়া তর্কবাগীশ একখানি গাড়ী সংগ্রহ করিলেন ও ঈশ্বরচন্দ্রকে সঙ্গে করিয়া আপন বাসায় আসিলেন এবং আর্দ্রবস্ত্র ত্যাগ করাইয়া বিশ্রান্ত ও আশ্বস্ত করিলেন। পরদিন বিদ্যালয়ে উপস্থিত হইয়া ঈশ্বরচন্দ্র অতঃপর আর গুরু আজ্ঞার অবমাননা করিবেন না বলিয়া স্বয়ং প্রতিজ্ঞা করিলেন এবং সহাধ্যায়ীদিগকে প্রতিজ্ঞা করাইলেন।

বিদ্যাসাগর যখন কলেজের প্রিন্‌সিপাল তখন একদিন রচনা আদি বিষয়ক কাগজ দেখিতে দেখিতে তর্কবাগীশ একখানি কাগজ লইয়া অকস্মাৎ দ্রুতপদে অপর এক পণ্ডিতের ঘরে উপস্থিত হইয়া রাগভরে বলিলেন "এই দেখ তোমার এমন্ পুত্র একবারে মাটি! (কাশীস্থিতগবাং) লিখিয়াছে, আর যাহারা ব্যাকরণে পাকা তাহাদের মধ্যে অনেকেই (কাশীস্থিত গবানাং) লিখিয়াছে—উপক্রমণিকায় সব্ মাটি হলো দেখ্‌চি"। ঐ পণ্ডিতটী তর্ক-বাগীশের ভূতপূর্ব্ব ছাত্র মধ্যে একজন বিখ্যাত ছাত্র। তিনি তখন অপর শ্রেণীতে পণ্ডিত নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রটী তখন অলঙ্কার শ্রেণীতে পড়িতেছিলেন। তর্কবাগীশ ঐ বালকটীকে বিলক্ষণ বুদ্ধিমান ও যত্নশীল বলিয়া জানিতেন। উপক্রমণিকা ব্যাকরণ পাঠ করায় কাঁচা বুনিয়াদ হইতেছে, ঘরে তাহাকে কেন মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ আদি পড়ান হয় না—বলিয়া পণ্ডিতটিকে উপদেশ দিতেছেন ইত্যবসরে বিদ্যাসাগর তথায় অকস্মাৎ উপস্থিত। তর্কবাগীশ বলিয়া উঠিলেন ঈশ্বর! কলেজটী মাটি করলে—ছেলেগুলির মাথা খেলে বাপু! বিদ্যাসাগর সবিস্তর শুনিয়া বলিলেন—না মহাশয়! আর ভয় নাই—এইবার "ব্যাকরণকৌমদী" বাহির হইয়াছে, ইতঃপর আপনার শ্রেণীতে ব্যাকরণে পরিপক্ক বালকেরই রচনাখানি দেখিতে পাইবেন।

তর্কবাগীশের নিকট ব্যাকরণে ভ্রমপ্রমাদের মার্জ্জনা ছিল না। উল্লিখিত পণ্ডিতটী অদ্যাপি জীবিত এবং তাঁহার পুত্রটী তর্কবাগীশের গুণানুকরণে যত্নপর ছিলেন, এক্ষণে প্রকৃত কবিত্বশক্তি বলে প্রতিষ্ঠাভাজন হইয়াছেন।

সময়ে সময়ে বিদ্যালয়ের অনাথ ও অসহায় ছাত্রেরা তর্কবাগীশের বাসায় অবস্থান করিতেন। একদা রাঢ়শ্রেণীর একটী ছাত্র প্রস্রাব ত্যাগ করিয়া

জল ব্যবহার করিলেন না দেখিতে পাইয়া তর্কবাগীশ তাঁহার প্রতি অতিশয় বিরক্তি প্রকাশ করেন এবং বাসার নিয়মাবলির বিপরীত কার্য্য করিয়াছেন বলিয়া কিছুদিন তাঁহাকে আপন পূজার উপকরণ ও কোন প্রকার খাদ্য সামগ্রী স্পর্শ করিতে দেন নাই।

আর এক সময়ে বৈদিকশ্রেণীর একটী ছাত্র তর্কবাগীশ বাসায় নাই জানিয়া জলপাত্র গ্রহণ না করিয়াই প্রস্রাব ত্যাগ করিতে বসিয়াছেন এমন সময়ে সদর দ্বারের নিকটে তর্কবাগীশের চটি জুতার শব্দ তাঁহার কর্ণ-গোচর হইল। যে স্থানে তিনি বসিয়াছিলেন, তাড়াতাড়ি উঠিলেও বিনা জলপাত্রে তথা হইতে আসিয়া তর্কবাগীশের সম্মুখেই পড়িবেন ও তিরস্কৃত হইবেন ভাবিয়া অমনি খানিক প্রস্রাব নিজ দক্ষিণ করপুটে ধরিয়া লইলেন। তখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়াছিল। তর্কবাগীশ ছাত্রের হস্তে জলগণ্ডূষ বলিয়া জ্ঞান করিলেন কিন্তু বলিলেন, অনতিদূরে কূপের নিকটে জলপাত্র ছিল তাহা লইয়া বসিলেই ভাল ছিল। অতঃপর তাহাই করিবেন বলিয়া ছাত্রটী অঙ্গীকার করিলেন এবং অল্পে অল্পেই মহা বিপদ হইতে নিস্তার পাইলেন। এই উভয় ছাত্রই পরিণামে খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন।

প্রেমচন্দ্র আত্মনিষ্ঠ ও কুলপাবন ছিলেন। গুরুজনে তাঁহার অচলা ভক্তি ছিল। নিয়ত সদাচারনিরত হইয়া তিনি পিতৃলোকের তৃপ্তি নিমিত্ত যথাসময়ে পূপাষ্টকা. মাংসাষ্টকা আদি সমুদায় শ্রাদ্ধকার্য্য বিধিপূর্ব্বক সম্পাদন করিতেন। পিতামাতাকে প্রত্যক্ষ দেবতা জ্ঞানে তাঁহাদের চরণ পূজা ও ভক্তিভরে সেবা করিতেন। কলিকাতা হইতে গৃহে প্রত্যাগমন করিলে পিতা মাতা যথায় যে অবস্থায় থাকিতেন তথায় উপস্থিত হইয়া তিনি দণ্ডবৎ সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত পূর্ব্বক বিনীতভাবে আশীর্ব্বাদ ও আদেশ প্রতীক্ষা করিতেন। তাঁহাদের আদেশ প্রতিপালনে ও প্রিয় কামনা পূর্ণকরণে সর্ব্বদা যত্নশীল থাকিতেন। গুরুনিন্দা তাঁহার অসহ্য ছিল। তাঁহার কলিকাতার বাসায় স্বদেশস্থ একটী বয়োবৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বহুকাল হইতে থাকিতেন, তিনি সংস্কৃত পুস্তক লেখকের কার্য্য করিতেন। এক সময়ে ঐ ব্রাহ্মণটী কথায় কথায় তর্কবাগীশের পূজনীয় গুরু নিমাইচাঁদ শিরোমণির সাংসারিক ব্যাপার সম্বন্ধে নিন্দা করিয়াছিলেন। ইহাতে তর্কবাগীশ এরূপ পরিতাপিত ও

ক্রোধান্বিত হয়েন যে ঐ ব্রাহ্মণটীকে বাসা হইতে তৎক্ষণাৎ বাহির করিয়া দেন এবং স্বয়ং অভুক্ত অবস্থায় রাত্রি যাপন করিয়া পরদিন প্রাতে গঙ্গাস্নান করেন। কিছুকাল অতীত হইলে অপর অধ্যাপক স্মরণীয় ৺ হরনাথ তর্কভূষণের আদেশ ও অনুরোধক্রমে ঐ ব্রাহ্মণকে পুনর্ব্বার বাসায় থাকিতে স্থান দেন।

হুরাড়গ্রামে অধ্যাপক [illegible] তর্কভূষণের টোলে পড়িবার সময়ে অধ্যাপকের পিতার একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধোপলক্ষ্যে এক হাট হইতে ফলমূল তরকারি আদি খরিদ করিবার নিমিত্ত প্রেমচন্দ্র আদিষ্ট হইয়াছিলেন। জিনিসপত্রগুলি বহিয়া আনিবার নিমিত্ত অধ্যাপক মহাশয় যে ব্যক্তিকে বলিয়াছিলেন সে প্রেমচন্দ্রকে চিনিত না ও তাঁহার সঙ্গেও যায় নাই। প্রেমচন্দ্র স্বয়ং জিনিসের বোঝা মস্তকে করিয়া আনিতেছিলেন; পথিমধ্যে পতিত হইয়া আঘাতপ্রাপ্ত হয়েন। অপর এক পথিক প্রেমচন্দ্রের সাহায্য নিমিত্ত অগ্রসর হইয়াছিল, কিন্তু প্রেমচন্দ্র তাঁহাকে চিনিতেন না; পাছে গুরুর দ্রব্যের অপচয় হয় এই আশঙ্কায় প্রেমচন্দ্র কাহাকেও বোঝাটী দেন নাই। কাতর অবস্থায় স্বয়ং মস্তকে করিয়া জিনিসগুলি আনিয়া গুরুর সমীপে উপস্থিত করিয়াছিলেন।

শাস্ত্রানুমোদিত হিন্দু ধর্ম্মে তর্কবাগীশের নিরতিশয় নিষ্ঠা ছিল। ধর্ম্ম বিষয়ে কপটাচার তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। তিনি বলিতেন,— ধর্ম্ম বিষয়ে কপটাচারী আত্মাপহারী, সত্যার্জ্জববিহীন এরূপ ধর্ম্মধূর্ত্ত ব্যক্তি পার্শ্বস্থ লোকদিগকে বঞ্চনা করিতে গিয়া ঈশ্বরেরও সঙ্গে চাতুরী খেলেন, ইহার ফল অতি শোচনীয়। ধর্ম্মতত্ত্ব অতীব গহন। জ্ঞানযোগে যিনি যে প্রকার ধর্ম্ম অবলম্বন করুন না কেন, শুদ্ধসত্ত্ব হইয়া তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করুন; নচেৎ সকলই তাঁহার নিষ্ফল। ধর্ম্মবিষয়ে বিশ্বাসহীন ব্যক্তি ছিন্নমূল তরুতুল্য। কখন্ কোনদিকে চলেন নিশ্চয় থাকে না।

এক সময়ে কলিকাতা মলঙ্গানিবাসী কায়েস্থ বংশীয় বিদ্যাবুদ্ধি সম্পন্ন এক যুবা পুরুষ ইংরাজীতে কৃতবিদ্য সমবয়স্ক আর কয়েকটী ব্রাহ্মণ যুবক সঙ্গে তর্কবাগীশের বাসায় আইসেন। উহাঁরা সকলে তর্কবাগীশের মধ্যম সহোদরের বন্ধু বা পরিচিত ছিলেন। উহাঁদিগকে তর্কবাগীশের নিকটে

বসাইয়া মধ্যম ভ্রাতা কার্য্যান্তর ব্যপদেশে বাসার মধ্যে অন্য ঘরে যান। এদিকে অন্যান্য কথাপ্রসঙ্গে এক ব্রাহ্মণ যুবক তর্কবাগীশকে জিজ্ঞাসা করিলেন—মহাশয়! যতদূর বুঝা যায় ব্রাহ্মণদের গায়ত্রীটী ত সূর্য্যদেবের উপাসনার মন্ত্র; তবে ইহা শূদ্রের দৃষ্টি ও শ্রুতিপথ হইতে সংগোপনে রাখিবার নিমিত্ত ব্রাহ্মণদের এত আঁটাআঁটির আড়ম্বর কেন? এবং শূদ্রের প্রতি ব্রাহ্মণদের এত অনিষ্টাচরণ কেন? কোন দেশের কোন ধর্ম্মযাজক সম্প্রদায়ের এরূপ একচেটে ধর্ম্ম কর্ম্ম দেখা যায় না। তর্কবাগীশ বলিলেন—এই প্রশ্নটী আপনার মুখ হইতে বাহির হইতেছে দেখিতেছি কিন্তু বোধ হইতেছে ইটী প্রকৃতপক্ষে ইহাঁর (কায়স্থ যুবককে দেখাইয়া) প্রশ্ন। যাহাহউক এসকল আদিকালের কথা; এখন আর ইহা তুলিবার প্রয়োজন কি? জিজ্ঞাসুর ভ্রম দূর করা ও কুতূহল নিবারণ করা পণ্ডিতের কর্ত্তব্য, জানিবার নিমিত্তই আমরা আপনার নিকটে আসিয়াছি বলিয়া সকলে বলিতে লাগিলেন। প্রেমচন্দ্র বলিলেন—এই সকল কথা লইয়া ইংরাজীওয়ালারা নানা কুতর্ক তুলিতেছেন ও ব্রাহ্মণদিগকে গালি দিতেছেন; আমার মত ব্রাহ্মণপণ্ডিত এইরূপ প্রশ্নের পর্য্যাপ্ত উত্তর দিতে সমর্থ কিনা জানি না; এই সম্বন্ধে বিচার বিতণ্ডার ইচ্ছা থাকিলে কোন কথা না বলাই ভাল। এই সময়ে তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা তথায় আসিলে সকলে মুখ তাকাতাকি করিতে লাগিলেন। তর্কবাগীশ ভাবিলেন উহাঁরা সকলে যোট বাঁধিয়া আসিয়াছেন। একটু ভাবিয়া আবার বলিলেন—তবে এই বিষয়ে আমার যে ধারণা তাহা বলিলে আপনাদের মনস্তুষ্টি জন্মিবে বলিয়া বোধ হয় না। আপনার যে ধারণা তাহা জানিলেই আমাদের পর্য্যাপ্ত উপদেশ হইবে বলিয়া সকলে প্রকাশ করিলেন।

তর্কবাগীশ বলিলেন—গায়ত্রীটী মন্ত্র বটে। ব্রাহ্মণদের পূজ্যপদার্থ বেদ সকল ও মন্ত্রমূলক। ঋক্ বেদই সর্ব্বপ্রধান। ঋক্ শব্দের অর্থই মন্ত্র। এক এক ঋকের এক বা অনেক দেবতা আছেন। সেই দেবশক্তির উপাসনার নিমিত্ত মন্ত্র। গায়ত্রীটী কেবল দ্যোতমান্ সূর্য্যের উপাসনার মন্ত্র বলিয়া জানি না। বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতি যাঁহারা পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মতের অনুমোদন করেন; তাঁহারা বলেন আর্য্যঋষিরা সূর্য্য, অগ্নি, বায়ু

আদির উপাসনা করিতে করিতে ক্রমে জ্যোতিঃ স্বরূপ পরব্রহ্মে উপনীত হইয়াছিলেন। আজ কাল যাঁহার যে ইচ্ছা বলিতেছেন, প্রতিবাদের প্রয়োজন দেখি না। মহর্ষিগণ যে কখন জড় সূর্য্যের ও জড় অগ্নি আদির উপাসনায় ব্যাপৃত ছিলেন এরূপ বোধ করিবার কোন কারণেরই উপলব্ধি হয় না। জড় বস্তুর অনুশীলনের এরূপ উৎকৃষ্ট পরিণাম হইতে পারে না। পৃথিবীর সমস্ত জাতিমধ্যে মহর্ষিগণ মনুষ্যের মঙ্গল নিমিত্ত প্রথমাবধি দৈবী শক্তি বা দেবতাতত্ত্ব এবং আধ্যাত্মিক তত্ত্বের গবেষণা লইয়া শুদ্ধ বিজ্ঞানস্বরূপের উপাসনার অধিকারী হইয়াছিলেন। বিশেষতঃ যখন গায়ত্রী মন্ত্রটি রচিত হয় তখন মহর্ষিগণ প্রাথমিক অবস্থায় পড়িয়া ছিলেন না। গায়ত্রীটি ভগবান্ বিশ্বামিত্র ঋষির রচনা বলিয়া জানা যায়। এই ঋষির সময় মহানুভাব আর্য্যগণের পরমোন্নতির সময়। গায়ত্রীটি সাবিত্রী বা ব্রহ্মগায়ত্রী নামে অভিহিত। সবিতা শব্দে সূর্য্য, বিষ্ণু বা জগৎ প্রসবিতা বলা যায়। মহামতি সায়নাচার্য্য সবিতা শব্দে সর্ব্বান্তর্যামী সর্ব্বোৎপাদক বা সর্ব্বপ্রেরক বলিয়া অর্থ করিয়াছেন। দ্বিজেরাই অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যেরাই সায়ং প্রাতর্ম্মধ্যাহ্নে পাপধ্বংস ও সদ্‌বিদ্যা, সদ্ধর্ম্ম আদি কামনায় এই স্তোত্রদ্বারা জ্যোতিঃস্বরূপ ব্রহ্মের বরণীয় তেজের ধ্যান করিবেন বলিয়া শাস্ত্রে বিধি দেখা যায়। এই বিধানে শূদ্রের পরিগণনা নাই। আমার বিবেচনায় তাৎকালিক শূদ্রের আকণ্ঠ অজ্ঞতাই ইহার কারণ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। শূদ্র হইতে এই সকল স্তোত্র গোপন করিবার সম্বন্ধে বেদে কোন নিষেধ বিধি দেখিয়াছি এমত স্মরণ হইতেছে না কিন্তু বৈদিক তান্ত্রিকদের মতে এই সকল বিষয় অতি গুহ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বেদে চাতুর্ব্বর্ণের বিধান দেখা যায়। গুণবত্তা ও কর্ম্মের তারতম্য অনুসারে বর্ণবিভাগ ব্যবস্থা হইয়াছিল এবং তৎকালে তমো মোহান্ধ শূদ্রের অবস্থা অতি হীন ছিল বলিয়া বুঝা যায়। সমাজের প্রাথমিক অবস্থায় সকল বিষয়ে সাম্যনীতির প্রত্যাশা করা যায় না। নতুবা বর্ণবিশেষের প্রতি অনিষ্টাচরণ উদ্দেশে এইরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছিল এরূপ বোধ হয় না। এখন এই দোষ দিয়া ব্রাহ্মণদিগকে যে তিরস্কার করা হয় তাহা অসঙ্গত। এখনকার কথা ছাড়িয়া দিউন, আমাদের মত ব্রাহ্মণদের কথা ছাড়িয়া

দিউন, সত্ত্বগুণাবলম্বী উন্নতমনা পূর্ব্বতন ব্রাহ্মণদের অসীম আধিপত্যের কথা স্মরণ করুণ—দেখিবেন—তাঁহাদের প্রতি এরূপ দোষারোপ করিবার কারণের একান্ত অভাব। স্বার্থসাধন চেষ্টা থাকিলে ব্রাহ্মণেরা ক্ষত্রিয়দিগকে বিশাল আধিপত্য দিতেন না, আপনারাই তাহা যথেচ্ছরূপে সম্ভোগ করিতেন। কালক্রমে বর্ণসাঙ্কর্য্যে গুণসাঙ্কর্য্য ঘটিয়াছে। শ্রেষ্ঠ বর্ণের অধঃপতন হইয়াছে। সত্ত্বগুণ চ্যুতিতে ব্রাহ্মণেরা পূর্ব্বতন উন্নতভাব হারাইতেছেন। শূদ্র শব্দের অর্থই অজ্ঞ। প্রকৃত সংস্কারবিহীন ব্রাহ্মণও শূদ্রপদবাচ্য। শূদ্র বলাতে এই বর্ণের প্রতি কোন অনিষ্টাচরণ করা হয় নাই। অজ্ঞতাস্থলে বিজ্ঞতা লাভ করায় এক্ষণে শূদ্রের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে সন্দেহ নাই। তবে এখনকার শূদ্রেরা শাস্ত্রের দুই চারি পাতা অথবা বেদাদির অনুবাদ পড়িয়াই পূর্ব্বতন ব্রাহ্মণদের সেই অনুপম সাত্ত্বিকভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন ইহা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। আজ কাল ব্রাহ্মণেরাই ঘোর অন্ধকারে পড়িয়া কষ্ট পাইতেছেন, সত্যালোকের স্ফুলিঙ্গও দেখিতে পাইতেছেন কি না সন্দেহ।

প্রেমচন্দ্র যোগবেত্তা ছিলেন। প্রতিদিন সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্য কার্য্য সমাপন করিয়া ঘরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া কিয়ৎক্ষণ প্রাণায়াম সাধন করিতেন। কলিকাতায় অবস্থান সময়ে সদ্‌গুরুর উপদেশ পাইয়া ক্রমে তিনি আসনসাধন, প্রাণায়াম সাধন ও প্রত্যাহার সাধনে সমর্থ হইয়া ধারণা অভ্যাস করিয়াছিলেন। এই বিষয়ে যোগবিৎ গুরুর উপদেশ প্রাপ্তি সম্পর্কে একটী সুযোগ ঘটিয়াছিল। সংস্কৃত বিদ্যালয়ে পদপ্রাপ্তির কিছুকাল পরে একবার ফাল্গুন মাসে সূর্য্যগ্রহণ হয়। সর্ব্বগ্রাস হওয়ায় গ্রহণকাল বিস্তীর্ণ ও মধ্যাহ্নকাল অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়। প্রেমচন্দ্র বড়বাজারের নিকটবর্ত্তী গঙ্গাতীরে স্নান ও জপ সমাপন করিয়া লোকের দানাদি কার্য্য দেখিতেছিলেন এবং অধ্যাপক হরনাথ তর্কভূষণের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। তর্কভূষণ মহাশয় পুরশ্চরণ করিতে বসিয়াছিলেন। তাঁহার অনতিদূরে এক বিষয়ী লোক বেগুনেরঙের একখান বস্ত্র দ্বারা আপন মস্তক ও দেহের অধিকাংশ আচ্ছাদিত করিয়া জপে বসিয়াছিলেন। এই সময়ে পাগলের মত এক ভিক্ষুক তথায় আসিল এবং আপন ছিন্ন বস্ত্রখণ্ড মেলিয়া ভিক্ষালব্ধ শশা, শাঁকআলু প্রভৃতি

ফলমূল আহার করিতে লাগিল। শশায় কামড় দিবায় তৃপ্তিকর আভ্রাণ পাইয়া ঐ বাবুটী বিচলিতচিত্তে ক্রোধভরে "মলো ব্যাটা পাগ্‌লা! আর জায়গা পেলেনা, সম্মুখে এসে খেতে বস্‌লো, দূর হ" বলিয়া উঠিলেন। ইহা শুনিয়া ফলাহারী ভিক্ষু আর একটা শশায় কামড় মারিয়া কচ্ কচ্ চিবাইতে চিবাইতে সমীপবর্ত্তী প্রেমচন্দ্র প্রভৃতি কয়েক ব্যক্তির দিকে ভ্রূক্ষেপ পূর্ব্বক দৃষ্টিপাত করিয়া কহিতে লাগিল,—আমি পাগল! বাবুটী জপে মগ্ন! কি জপ কচ্চেন জান? কাল কুঠী হ'তে ফিরে যাবার বেলায় জোড়াশাঁকোর বাজারে এক জোড়া জুতা কিনিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, দরে বনে নাই, আর দুই আনা বেশী দিয়া ঐ জোড়াটী আজ লয়ে যাবেন এই জপ কচ্চেন। এই বলিতে বলিতে ভিক্ষু আপন ছিন্নবস্ত্রস্থিত ফলমূলগুলি বাঁধিতে বাঁধিতে উঠিয়া চলিল। বাবুটী অকস্মাৎ বেগুনেরঙের গাত্রবস্ত্রখানি আসনে ফেলিয়া ভিক্ষুর পাছে পাছে দৌড়িলেন এবং তাহার পায়ে ধরিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ভিক্ষু এক একবার তাঁহাকে পদাঘাত করিতে করিতে দৌড়িতে লাগিল। মনের কথা টানিয়া বলিয়াছে, বাবুটীর প্রাণে আঘাত লাগিয়াছে, আর কি তিনি স্থির থাকিতে পারেন? প্রেমচন্দ্র কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া ভিক্ষুর পার্শ্বে পার্শ্বে বেগে চলিলেন। ক্রমে হাটখোলার বাঁধাঘাটের নিকটে উপস্থিত। তথায় এক স্থানে নর্দ্দামার মাটি ও আবর্জ্জনা রাশীকৃত ছিল। ভিক্ষু তাড়াতাড়ি ঐ ময়লারাশির উপরে আরোহণ করিল এবং মুটো মুটো ময়লা লইয়া বাবুটীর মুখে ও গাত্রে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। পরিশেষে প্রেমচন্দ্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া মুখভঙ্গী দ্বারা বাবুটীকে বিরত ও স্থানান্তরিত করিতে সঙ্কেত করিল; পাগলের সঙ্গে আর এরূপ কেন? বলিয়া সকলে কহিতে থাকায়, এবং ভিক্ষু তাঁহার প্রতি অসীম ঘৃণা প্রকাশ করায় বাবুটী ক্ষান্ত হইয়া ফিরিলেন, কিন্তু তাঁহার মন অলক্ষিতভাবে পশ্চাতে দৌড়িতে লাগিল। লোকে ভিক্ষুককে পাগল বলিতে লাগিল কিন্তু বাবুটী তাহাকে অন্তর্যামী যোগী বোধ করিলেন। প্রেমচন্দ্রের চিত্তও দোলায়মান, তিনি, বাবু ও ভিক্ষু উভয়ের তাৎকালিক অবস্থা সম্পূর্ণরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন। ভিক্ষুককে সিদ্ধ মহাত্মা বোধে তাঁহার সঙ্গ ও শিক্ষার নিমিত্ত লোলুপ হইলেন। ফিরিয়া আসিয়া অধ্যাপক তর্কভূষণ মহাশয়ের সঙ্গে মিলিত হইলেন এবং

এই বৃত্তান্ত বলিলেন। গোপনে ভিক্ষুর সন্ধান লওয়া ও সাক্ষাৎকার লাভের চেষ্টা করা নিতান্ত আবশ্যক বলিয়া তর্কভূষণ বলিলেন। প্রেমচন্দ্র সায়ং প্রাতে দৌড়াদৌড়ি করিয়া হাটখোলার বাঁধাঘাটের এক পার্শ্বে পাগল কয়েক দিবস হইতে রহিয়াছে এইমাত্র সন্ধান জানিয়া আসিলেন। একদিন সূর্য্যাস্তসময়ে তর্কভূষণ মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া প্রেমচন্দ্র উক্ত ঘাটের নিকটে উপস্থিত হইলেন। উভয়ে দূর হইতে দেখিলেন সায়ংকালীন স্নানক্রিয়া সমাপন করিয়া ভিক্ষু আর্দ্র কৌপীন পরিবর্ত্তন করিতেছেন। দেহ পবিত্র কান্তিপূর্ণ। গঙ্গাসলিলসিক্ত শরীরে সন্ধ্যাকালীন পাশ্চাত্য মেঘের রক্তিমা লাগিয়া আরও সমুজ্জ্বল হইয়াছে। বদনমণ্ডল প্রেমানন্দপূর্ণ। কোনও ব্যক্তি তাঁহাকে একদৃষ্টে দেখিতেছে বুঝিতে পারিলে ভিক্ষু অমনি হস্ত পদাদির পরিচালনা বিশেষ দ্বারা পাগ্‌লামি প্রকাশ করিয়া থাকেন। তর্কভূষণ ও প্রেমচন্দ্র অলক্ষিতভাবে ভিক্ষুর প্রতি লক্ষ্য রাখিতে লাগিলেন। ক্রমে চারিদিক্ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইল। উহাঁরা উভয়ে ঘাটের স্তম্ভের অন্তরাল হইতে দেখিলেন,—ভিক্ষু পদ্মাসনে সমাসীন হইয়া প্রাণায়াম করিতেছেন। পরে জপ করিতে করিতে একটী ভগ্ন ভাণ্ড হইতে মটর কলাই লইয়া অপর পাত্রে জপসংখ্যা রাখিতেছেন। তর্কভূষণ ও প্রেমচন্দ্র ঐ যোগীর সঙ্গে কথোপকথন করিবেন ভাবিয়া ক্রমে তাঁহার পার্শ্বে ও সম্মুখে দাঁড়াইলেন। যোগী তখনি জপ ও পদ্মাসন ভঙ্গ করিয়া পদ দ্বারা ভাঁড় টাটি প্রভৃতি ছড়াছড়ি করিয়া দিলেন এবং পাগ্‌লামি আরম্ভ করিয়া এলোমেলো বকিতে লাগিলেন। দোকানদারদিগের দীপমালার যে আলোক আসিয়া ঘাটের চাঁদনীতে পতিত হইতেছিল তাহাতে ভিক্ষু প্রেমচন্দ্রের মুখপানে বারম্বার চাইতে লাগিলেন, এবং তর্জ্জনী অঙ্গুলী তুলিয়া ৩।৪ বার নাড়িলেন। কোনও কথা কহিলেন না, বরং উহাঁরা নিকটে থাকায় বিরক্তি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। উহাঁরা উভয়ে চলিয়া আসিলেন। প্রেমচন্দ্র ভাবিলেন তাঁহার মুখ দেখিয়া ভিক্ষু বোধ হয় তাঁহাকে চিনিতে পারিয়াছে;—একাকী আসিলে কথাবার্ত্তা হইতে পারিবে, এই আশায় তিনি ভিক্ষুর নিকটে যাতা-য়াত করিতে লাগিলেন। একদিন প্রেমচন্দ্র বিনীতভাবে পার্শ্বে দণ্ডায়মান আছেন, ভিক্ষু তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কি উদ্দেশ্য বলিয়া সহাস্য-

বদনে জিজ্ঞাসা করিলেন। আপনি যোগবিৎ জ্ঞানী, সর্ব্বতাপশান্তিকামনায় শিষ্যভাবে প্রতীক্ষা করিতেছি এই বলিয়া প্রেমচন্দ্র উত্তর করিলেন। তুমি গৃহী ও যুবা, এ মুনিবৃত্তির আকাঙ্ক্ষা কেন? বলিয়া যোগী বলিতে লাগিলেন। জ্ঞানাভ্যাস ও ধ্যান ধারণায় গৃহী অনধিকারী ইহা জানিনা ও কখনও শুনি নাই-বলিয়া প্রেমচন্দ্র উত্তর করিলে, যোগী তাঁহার সঙ্গে কিয়ৎক্ষণ কথোপকথন করিলেন। পরিশেষে বলিলেন, দেখিতেছি তুমি শাস্ত্রবিৎ ও শান্তচিত্ত, মনুপদিষ্ট নিয়ম প্রতিপালন কর, আগামী মাঘীপূর্ণিমার সময়ে এই স্থানে অথবা বরাহনগরের বাগানে আমায় দেখিতে পাইবে। এই বলিয়া যোগী আসনসাধন আদি বিষয়ে কি কি উপদেশ দিয়া প্রেমচন্দ্রকে তখন বিদায় দিলেন। যোগসাধন শিক্ষার এই তাঁহার প্রথম দীক্ষা। কলিকাতায় অবস্থান সময়ে প্রেমচন্দ্র তিনবার ঐ যোগীর সাক্ষাৎকার পাইয়া কি যেন হারাণ ধন বা কাম্য বস্তু পাইবেন ভাবিয়া উন্মনা হইয়া উঠিলেন। এই সময়ে কালু ঘোষের বাগান অঞ্চলবাসী ভগবান্ ঘোষ নামক এক বয়োবৃদ্ধ কায়স্থ এবং কালীঘাটের হালদারদিগের পুরোহিত রামধন ঘটকের সঙ্গে প্রেমচন্দ্রের মিলন হয়। উহাঁরা উভয়েই যোগী ও জপসিদ্ধ ছিলেন। সময়ে সময়ে উহাঁরা তর্কবাগীশের কলিকাতার চাঁপাতলার বাসায় আসিয়া মিলিত হইতেন এবং নির্জ্জন গৃহে বসিয়া যোগসাধন বিষয়ে যে আলাপ ও যে সকল আসনবন্ধন আদি প্রক্রিয়া করিতেন তাহা অন্তরাল হইতে অনেকে শুনিত এবং দেখিতে পাইত। কাশীধামে যাত্রা করিবার পূর্ব্বে প্রেমচন্দ্র প্রাণায়াম সাধন বিষয়ে অনেকদূর উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন। অনেকক্ষণ ব্যাপিয়া কুম্ভক করিতে করিতে শরীরে এরূপ লঘুতা জন্মিত যে কয়েকবার কুশাসন সহ কখন বা আসন পরিত্যাগ করিয়া কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত তিনি ঊর্দ্ধে উঠিয়া পড়িয়াছিলেন।

গৃহত্যাগের পূর্ব্ব হইতে প্রেমচন্দ্র সর্ব্বদা সদ্‌ গুরুর সঙ্গকামনা করিতেন। কলিকাতায় অবস্থান সময়ে গঙ্গাতীরে আর একবার এক দীর্ঘাকার বয়োবৃদ্ধ সাধুকে দেখিতে পাইয়া চাঁপাতলার বাসায় আনিয়া অভ্যর্থনা করেন। সাধুর বর্ণ রক্তগৌর, মূর্ত্তি সৌম্যগম্ভীর, মস্তক বিশাল, লোচনযুগল সজীব ও সমুজ্জ্বল, ললাটদেশ বিস্তৃত ও সমুন্নত, বামস্কন্ধে রজতনির্ম্মিত যজ্ঞোপবীত,

কটিদেশে কৌপীনের উপরিভাগে কতকখানা মলমল থান জড়ান। মুখ-মণ্ডল দেখিলেই তাঁহাকে উত্তরপশ্চিম দেশীয় পুরুষপুঙ্গব বলিয়া অনুমান করা যাইত কিন্তু এই প্রকার রৌপ্য উপবীত কোন দেশীয় কোন বর্ণে কখন দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল কি না স্মরণ হয় না। তিনি সংস্কৃত ভাষাতেই সমস্ত কথাবার্ত্তা কহিতেন, সুতরাং প্রেমচন্দ্র ব্যতীত বাসার অপর কেহ সমস্ত কথা সম্যক্‌ রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেন না। তাঁহার মুখ হইতে সংস্কৃত কথা অনর্গলভাবে বিনির্গত হইত এবং তাহা অতি মধুর বোধ হইত। যতদূর বুঝা গিয়াছিল তাহাতে দর্শন ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলাপ হইয়াছিল মনে হয়। এইরূপ বক্তা ও শ্রোতার নিকটে কিয়ৎক্ষণ থাকিবার পরে যেন পূর্ব্বর্ত্তন মহর্ষিগণের পবিত্র আলাপ শ্রবণোন্মুখ হইয়া রহিয়াছি বোধ হইয়াছিল। সিংহলদ্বীপ হইতে হ্যাট্‌ কোর্ট্‌ধারী কৃষ্ণকায় পণ্ডিত ও দ্রাবিড় দেশের ব্রহ্মচারিগণ শাস্ত্রতত্ত্ব নির্ণয় নিমিত্ত সময়ে সময়ে প্রেমচন্দ্রের বাসায় আসিতেন ও সংস্কৃত ভাষায় কথোপকথন করিতেন শুনিতাম কিন্তু এই সাধুর মত মধুরভাষী পণ্ডিত দেখি নাই। এই সাধু তিন বার প্রেমচন্দ্রের বাসায় আসিয়াছিলেন ও এক এক রাত্রি মাত্র অবস্থান করিয়াছিলেন। দিবাভাগে তিনি আতপ চাউল মুগ, তরকারি, ঘৃত সৈন্ধবাদি সমস্ত দ্রব্য একত্রে গঙ্গাজল সহ এক হাঁড়িতে দিয়া পাক করিতেন। সিদ্ধ অন্ন লইয়া চুলার অগ্নিতে তিনবার আহুতি প্রদান করিতেন এবং অবশিষ্ট অন্ন ভোজন করিতেন। এক দিবস চুলীতে হাঁড়ি বসাইয়া সাধু আর খানিক গঙ্গাজল চাহিলেন। ভৃত্য জালা হইতে যে জল আনিয়া দিল তাহা অতি ঘোলা ও অপবিত্র দেখিয়া সাধু তাহা গ্রহণ করিলেন না। আর জল ছিল না, ভারী জল আনিতে গিয়াছিল আসিয়া পৌছে নাই, ভৃত্য সঙ্কেত করায় সাধু পিতলের একটা বড় কলস লইয়া দ্রুতপদে নীচের তলায় নামিয়া গেলেন। নিকটবর্ত্তি পুষ্করিণী হইতে জল আনিতে গেলেন বলিয়া ভৃত্য মনে করিল। প্রেমচন্দ্র তখন অন্য গৃহে পূজা করিতেছিলেন। পূজাশেষে উঠিয়া তিনি নিকটবর্ত্তী দীঘীর ঘাটে লোক পাঠাইলেন, সাধুকে তথায় পাওয়া গেলনা। এদিকে চুলীর অন্নে জলাভাব হইল। প্রেমচন্দ্র ও বাসার অপর সকলেব্যস্ত হইয়া পড়িলেন ইত্যবসরে সাধু এক কলস গঙ্গাজল

সহ অকস্মাৎ উপস্থিত হইলেন। চাঁপাতলা হইতে নিকটবর্ত্তী গঙ্গার ঘাট যাতায়াতে এক ক্রোশের অধিক সন্দেহ নাই। গাড়িতে যাতায়াত করিলেও তত অল্প সময় মধ্যে গঙ্গার ঘাট হইতে প্রত্যাবর্ত্তন অসম্ভব! অন্যে এই বিষয়ের রহস্য বুঝিতে পারিলেন না। প্রেমচন্দ্র ঈষত্ হাস্যবদনে নীরব রহিলেন এবং সাধুর প্রতি সমধিক ভক্তি প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। কলসে যে গঙ্গাজলই আনিত হইয়াছিল, পুষ্করিণীর জল ছিলনা তাহা সকলের পরীক্ষায় সাব্যস্ত হইয়াছিল। এই সাধুর সঙ্গলাভে প্রেমচন্দ্রের কি মঙ্গল সাধন হইয়াছিল তাহা জানা যায় নাই। শেষবার বিদায় গ্রহণ সময়ে সাধু দক্ষিণ হস্ত তুলিয়া অন্য শুভাসংশা সঙ্গে দীর্ঘজীবী হও বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলে প্রেমচন্দ্র সসম্ভ্রমে বলিলেন—আশীর্ব্বাদের ফল অমোঘ হইলেও যখন মর্ত্যভূমিতে আসিয়াছি, তখন মৃত্যুর ভয় ঘুচিবেনা বুঝিতেছি, —জীবনের উৎপত্তি ও সমাপ্তি নিশ্চিত, কিন্তু পথ অতিদুর্গম ও প্রকৃতির লীলা রহস্য দুর্বোধ্য জ্ঞানে চিন্তাকুল—দীর্ঘজীবনের আকাঙ্ক্ষী নহি; পবিত্র জীবন এবং আধিব্যধি ভয় রাহিত্যের বাসনায় শরণাপন্ন। ইহা শুনিয়া সাধু "যথাসময়ে উপস্থিত হইবেন" বলিয়া চলিয়া গেলেন।

কাশীতে অবস্থান সময়ে প্রেমচন্দ্র সদাই সদ্‌গুরুর অন্বেষণ করিতেন। সারনাথে একবার এক বিচক্ষণ সন্ন্যাসী দেখিতে পান এবং কয়েক দিবস ধরিয়া ছাত্রগণ মধ্যে তাঁহার বেদান্ত পাঠনা শ্রবণ করেন। পবিত্র উপদেশ শুনিয়া এবং মনোমুগ্ধকর বাহ্যাকার দেখিয়া ঐ সন্ন্যাসীর আধ্যাত্মিক জীবন ঐরূপ পবিত্র হইবে ভাবিয়া তাঁহার নিকটে দীক্ষাগ্রহণ করিবেন মনে মনে সংকল্প করিয়া নিকটস্থ হয়েন কিন্তু ঐ দিবস পাঠনা সময়ে সন্ন্যাসী মহোদয় একস্থানে অর্থবিকার ঘটাইতেছেন বুঝিয়া বিস্মিত ভাবে প্রতিবাদ করিতে থাকেন এবং বিচার সময়ে দাম্ভিকতা ও ক্রোধপরবশতা দেখিয়া তাঁহাকে আড়ম্বর প্রিয় ও অন্তঃসার শূন্য অবধারণ করিয়া বিরত হয়েন। প্রেমচন্দ্র সর্ব্বদা বলিতেন নিপুণ আচার্য্যের উপদেশ ব্যতীত সম্যক্‌রূপে জ্ঞানচক্ষুর উন্মীলন হয় না এবং উপদেশ মত সাধনা করিতে না পারিলে আত্মজ্ঞানে উপনীত হওয়া যায় না। আজকাল এইরূপ শ্রেষ্ঠ উপদেষ্টা দুর্লভ এবং কেবল জ্ঞানচক্ষুদ্বারা আত্মদর্শন ও সুদুর্লভ। মনুষ্যের ক্রমোন্নতির কথা

লইয়া অনেকে মত্ত কিন্তু তত্ত্বজ্ঞান বিষয়ে ভারতের ব্রাহ্মণ বংশ অধঃপতনের চরম সীমায় উপনীত বোধ হইতেছে।

যে সাধু প্রেমচন্দ্রের কাশীর বাসায় কয়েকবার আসিয়াছিলেন তিনি তাঁহার পূর্ব্ব পরিচিত কথিত দীর্ঘাকার সাধু অথবা হাটখোলার ঘাটে পূর্ব্বদৃষ্ট সেই সিদ্ধ পুরুষ কিনা এবং যোগসাধন বিষয়ে তাঁহার কতদূর উন্নতি হইয়াছিল এই সম্বন্ধে প্রকৃত কথা সকল জানিতে পারা যায় নাই।

দারুণ বিসূচিকা ব্যতীত জ্বর প্রভৃতি সামান্য রোগে প্রেমচন্দ্র কখনও উদ্বেজিত হয়েন নাই। শরীরের জড়তা বোধ করিলে তিনি প্রাতে মুখ প্রক্ষালন সময়ে জলসিক্ত অঙ্গুলিদ্বয় দিয়া নাসাদণ্ড এবং কর্ণমূল কয়েকবার ঘসিয়া কণ্ঠনালী দিয়া রাশি রাশি শ্লেষ্মা অনায়াসে বাহির করিয়া ফেলিতেন এবং প্রাণায়াম করিয়া সুস্থ বোধ করিতেন। প্রাণায়ামই সামান্য রোগের প্রকৃত ঔষধ জ্ঞান করিতেন। মাতৃবিয়োগের পর হইতে তিনি হবিষ্যাশী হইয়াছিলেন। দিনান্তে একবার খাইতেন। ক্ষুধাবোধ করিলে রাত্রিতে ফলমূল ও দুগ্ধ খাইতেন। প্রায় তাঁহার ক্ষুধার অভাব দেখা যায় নাই। মধ্যাহ্নে উৎকৃষ্ট আতপ তণ্ডুলের অন্ন, গব্য ঘৃত মুদ্গ প্রভৃতি খাইতেন। আহার সামগ্রীর আয়োজনে যত্ন ছিল না, কেবল তণ্ডুল নির্ব্বাচন বিষয়ে তিনি বড় খুঁৎখুঁতে ছিলেন। পরিষ্কৃত লম্বা দানাদার আতপ চাউল ভাল বাসিতেন। উৎকৃষ্ট চাউল না পাইলে কষ্ট বোধ করিতেন। ফলমূলে বিশিষ্ট তৃপ্তি অনুভব করিতেন। তিনি বলিতেন,—ফল মূলাদি মনুষ্যের সাত্বিক ও স্বাভাবিক ভোজন। যে প্রদেশে কৃষিলভ্য খাদ্যের অসদ্ভাব তথায় প্রকৃতির নিয়মানুসারে এইরূপ ফলমূলাদি প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। মধুর ফলমূল পাইলে তাহা তৎক্ষণাৎ আহার্য্যরূপে পরিণত করিতে ভোক্তার যেমন আসক্তি, ভক্ষণেও তেমন তৃপ্তি জন্মিয়া থাকে। মৎস্য মাংস খাদ্যরূপে পরিণত করিতে যে সকল কার্য্য করিতে হয় তাহাতে তৃপ্তির কথা দূরে থাকুক, প্রতি পদে বীভৎস রসেরই উদয় হইয়া থাকে।

সার রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর প্রেমচন্দ্রের প্রতি অতিশয় শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন। কোনও জটিল শাস্ত্রার্থের মীমাংসা সময়ে প্রেমচন্দ্রের মত না পাইলে তাঁহার মনস্তুষ্টি হইত না। তিনি সর্ব্বদা বলিতেন,—প্রেমচন্দ্র তর্ক-

বাগীশ তাঁহার সম্প্রদায়মধ্যে উন্নতমনা তেজস্বী, অতলস্পর্শ লোক। আপনা হইতেই তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা জন্মিয়া থাকে।

প্রথম বিধবাবিবাহের অনুষ্ঠান সময়ে কিছুদিন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর নিয়ত ব্যস্ত থাকিতেন। সংস্কৃতবিদ্যালয়ের নিতান্ত প্রয়োজনীয় কার্য্য করিতে যে সময় পাইতেন তাহার মধ্যে সুবিধামতে এক দিন তর্কবাগীশ বিদ্যাসাগরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া বলেন,—ঈশ্বর! বিধবাবিবাহের অনুষ্ঠান হইতেছে বলিয়া প্রবল জনরব। কতদূর কি হইয়াছে জানি না। এক্ষণে জিজ্ঞাসা এই যে, দেশের বিজ্ঞ ও বৃদ্ধমণ্ডলীকে স্বমতে আনিতে কৃতকার্য্য হইয়াছ কি না? যদি না হইয়া থাক তবে অপরিণামদর্শী নব্যদলের কয়েক জন মাত্র লোক লইয়াই এইরূপ গুরুতর কার্য্যে তাড়াতাড়ি হস্তক্ষেপ করিবার পূর্ব্বে বিশেষ বিবেচনা করিবে। বিদ্যাসাগর বলিলেন,—"মহাশয়! আপনার প্রশ্নভঙ্গীতে আমার উদ্যমভঙ্গের আশঙ্কা দেখিতেছি;—আপনাকে অন্তরের সহিত শ্রদ্ধা করিয়া থাকি, নচেৎ আপনাকে"—তর্কবাগীশ তাঁহার কথা শেষ না হইতেই বলিলেন, নচেৎ আমাকে এই আসন হইতে এখনি উঠাইয়া দিতে। ঈশ্বর! তুমি এই কার্য্যে যেরূপ দৃঢ়সংকল্প এবং একাগ্রচিত্ত হইয়াছ তাহাতে আমি এইরূপ উত্তর পাইব বলিয়া প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছি। ইহাতে অনুমাত্র ক্ষুব্ধ নহি। বিদ্যাসাগর বলিলেন, আমি তত সাহসের কথা বলিতেছিলাম না। আপনি বিজ্ঞ ও বৃদ্ধমণ্ডলী বলিয়া যাহা কহিতেছেন ইহাতে কলিকাতার রাধাকান্ত দেব বাহাদুর প্রভৃতি আপনার লক্ষ্য কি না? আমি উহাঁদের অনেক উপাসনা করিয়াছি, অনেককেই নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিয়াছি, সকলেই ক্ষীণবীর্য্য ও ধর্ম্মকঞ্চুকে সংবৃত বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছি; যাঁহারা মুক্তকণ্ঠে সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছিলেন এখন তাঁহাদের আচরণ দেখিয়া নিতান্ত বিস্মিত হইয়াছি। মহাশয়! আমি অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছি এখন আমায় আর প্রতিনিবৃত্ত করিবার কথা বলা না হয়। তর্কবাগীশ বলিলেন,—ঈশ্বর! বাল্যাবধি তোমার প্রকৃতি ও অদম্য মানসিক শক্তির প্রতি আমার লক্ষ্য রহিয়াছে, তোমার ভগ্নোদ্যম ও প্রতিনিবৃত্ত করা আমার সংকল্প নহে। তুমি যে কার্য্যটাকে লোকের

হিতকর বলিয়া জ্ঞান করিতেছ এবং যাহার অনুষ্ঠান বিষয়ে প্রগাঢ় চিন্তা করিয়াছ; সেই কার্য্যের মূলবন্ধন সম্যক রূপে দৃঢ়তর হয় এবং তাহা অৰ্দ্ধ-সম্পন্ন হইয়াই বিলীন না হয় ইহাই আমার উদ্দেশ্য। কেবল কলিকাতার কয়েকটী বৃদ্ধ আমার লক্ষ্য নহে। উত্তরপশ্চিমপ্রদেশ, বোম্বে, মাদ্রাজ প্রভৃতি স্থানে যথায় হিন্দুধৰ্ম্ম প্রচলিত—ততদূর দৌড়িতে হইবে, ধৰ্ম্মবিপ্লব ও লোকমর্য্যাদার অতিক্রম করা হইতেছে বলিয়া যাঁহারা মনে করিতেছেন তাঁহাদিগকে সম্যক্‌রূপে বুঝাইতে হইবে; সকলকে বুঝান সহজ নহে সত্য; প্রধান প্রধান স্থানের সমাজপতিদিগকে অন্ততঃ স্বমতে আনিতে হইবে। এইরূপে সমাজসংস্কার করা কেবল রাজার সাধ্য। অন্য লোকে এরূপ কার্য্যে হাত দিতে গেলে বিপুল অর্থ ও লোকবল আবশ্যক। বিজাতীয় রাজপুরুষ দ্বারা এইরূপ সংস্কারের সম্ভাবনা নাই। বিধবাগর্ভজাত সন্তান দায়ভাক্ হইবে বলিয়া যে বিধি হইয়াছে তাহাই পর্য্যাপ্ত জ্ঞান করিতে হইবে। যখন তুমি রাজপুরুষদের সাহায্যে এই বিধি প্রচলিত করাইতে সমর্থ হইয়াছ তখন পূর্ব্বকথিত দেশবিভাগের সমাজপতিদিগের সহায়তা লাভে যে কৃতকার্য্য হইবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ জন্মিতেছে না। ইহাতে যেমন কালবিলম্ব ঘটিবে তেমন সময়ের স্রোত তোমারই অনুকূলে বহিবে। লোকবলের নিকটে অর্থাভাব অনুভূত হইবে না। ত্বরার প্রয়োজন দেখি না। হিন্দুসমাজ এ পর্য্যন্ত অনেক সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়াছে। দুই চারিটী বিধবা বিবাহ দিলে আর একটী থাক বাড়ান মাত্র হইবে; সমাজবন্ধন এইরূপে আরও শিথিল করিবার প্রয়োজন নাই। ঈশ্বর! যাহা বক্তব্য বলিলাম। তুমি বড় ব্যস্ত দেখিতেছি, চলিলাম, বিবেচনা করিও।

প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ অতি স্থিরমতি ও গম্ভীর প্রকৃতি ছিলেন। সারমর্ম্ম গ্রহণ না করিয়া তিনি কোনও বিষয়ে হঠাৎ মতামত প্রকাশ করিতেন না, চিরসেবিত নিজ মত প্রকাশ করিতে গিয়া কাহারও অন্তরে ক্লেশ দিতেন না। পাইকপাড়ার রাজবাটীতে যখন রত্নাবলী নাটকের অভিনয় হয় তাহার কিছু পূর্ব্বে নাটকমধ্যে সন্নিবেশিত করিবার নিমিত্ত গুরুদয়াল চৌধুরী নামক তর্কবাগীশের একটী ছাত্র বাঙ্গালাভাষায় কয়েকটী সঙ্গীত রচনা করিয়া দেন। গীতগুলি শুনিয়া সকলে অত্যন্ত প্রশংসা করেন এবং

রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ রচয়িতার সমুচিত পুরস্কার প্রদানের প্রস্তাব করেন। এই রচনায় তাঁহার গুরুর মনস্তুষ্টি হইল কি না অগ্রে না জানিয়া তিনি কাহারও প্রশংসার সম্মান করেন না বলিয়া গুরুদয়াল বাবু অভিপ্রায় প্রকাশ করেন, এবং গীতগুলি তর্কবাগীশকে দেখাইয়া লইয়া যান। ইহার কিছু দিন পরে বঙ্গকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত শর্ম্মিষ্ঠানাটক মুদ্রিত করিতে আরম্ভ করিলে রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহের অভিপ্রায় অনুসারে নাটকখানি তর্কবাগীশকে একবার দেখাইবার প্রস্তাব হয়। দত্ত মহোদয় এই নাটকের কয়েক ফর্ম্মা একটী বন্ধুর হস্তে তর্কবাগীশের নিকটে পাঠাইয়া দেন। তর্কবাগীশ তাহা মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ করিয়া ফেরত দেন। মহাশয়! আপনি যে দেখিলেন তাহার কোনও চিহ্ন রহিল না বলিয়া বাবুটী কহিতে থাকিলে তর্কবাগীশ বলিলেন, মহাশয়! চিহ্ন রাখিতে হইলে অনেক চিহ্ন থাকিয়া যাইবে, তদপেক্ষা যেরূপ আছে তদ্রূপ থাকিলে কোনও হানি নাই। বন্ধুমুখে এই কথা শুনিয়া দত্ত মহোদয় তর্কবাগীশকে নিরতিশয় আত্মাভিমানী দাম্ভিক বলিয়া বোধ করেন। পরিশেষে রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহের অভিপ্রায় অনুসারে তর্কবাগীশের সঙ্গে এক দিবস সাক্ষাৎ ও কথোপকথন করিয়া কবিবর দত্ত মহোদয় অতিশয় প্রীতিলাভ করেন এবং আপনার পূর্ব্বসিদ্ধান্ত তৎক্ষণাৎ দূর করেন। সাক্ষাৎকারের ফল কি হইল বলিয়া রাজাবাহাদুর জিজ্ঞাসিলে দত্ত মহোদয় বলেন, টিকিধারি মধ্যে জন্‌সনের মত এরূপ প্রকাণ্ড বিচক্ষণ লোক আছে বলিয়া আমার ধারণা ছিল না; যে স্থল অভ্রান্ত বলিয়া বোধ ছিল, তাহা ভ্রমসঙ্কুল বলিয়া বুঝিতে বাধ্য হইয়াছি; সংস্কৃতভাষায় অলঙ্কারগ্রন্থ না পড়িয়া বাঙ্গালায় নাটক লেখার চেষ্টা বিড়ম্বনা হইয়াছে; অধিকাংশ স্থলে ইংরাজী ধরণ হইয়াছে, নাটকমধ্যে গর্ভাঙ্কশব্দের প্রকৃত অর্থই বুঝা হয় নাই; উপমান উপমেয় প্রভৃতির সৌসাদৃশ্য ও স্থায়ীভাব প্রকৃতির সূক্ষ্ম সম্বন্ধ জানা হয় নাই; চিত্রে বিভিন্ন রঙ্ সাজাইবার প্রণালীর মত নাটকে যথাস্থানে বিভিন্ন রসের সঙ্গতরূপ অবতারণার প্রতি তাদৃশ লক্ষ্য রাখা হয় নাই। এখন সমুদয় ছাঁচ না বদলাইলে তর্কবাগীশের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আর সাহস হয় না। তবে এইমাত্র সাহস যে এই সকল বিষয়ে তাঁহার ন্যায় সূক্ষ্মদর্শী লোক বোধ হয় অতি বিরল এবং ব্যবহার ও

রুচির পরিবর্ত্তন অনুসারে বাঙ্গালা দৃশ্যকাব্যে এই সকল দোষ তাদৃশ ধর্ত্তব্য হইবে না বলিয়া তর্কবাগীশ বারবার বলিয়া দিয়াছেন। ইহাই এখন আমার পক্ষে যথেষ্ট।

প্রেমচন্দ্রের অনুপম ভ্রাতৃস্নেহ ছিল। তিনি অনুজগণকে পুত্রাধিক স্নেহ করিতেন, অনুজেরাও তাঁহার নিতান্ত অনুরক্ত ও বশম্বদ ছিলেন, তাঁহাকে দেবতার ন্যায় ভক্তি ও সেবা করিতেন। কেহ কখনও তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতেন না। সংস্কৃত বিদ্যালয়ে রঘুবংশ পড়াইবার সময়ে রাম লক্ষ্মণ আদির ভ্রাতৃস্নেহের দৃষ্টান্তস্থলে পণ্ডিতেরা সময়ে সময়ে প্রেমচন্দ্র ও তাঁহার অনুজদিগের দৃষ্টান্ত দেখাইতেন।

একদা কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অন্যতম অধ্যাপক মফঃসলের দুই জন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত সঙ্গে তর্কবাগীশের চাঁপাতলার বাসায় উপস্থিত হয়েন। অন্যান্য কথা প্রসঙ্গে তর্কবাগীশ কত টাকা সঞ্চয় ও কত গবর্ণমেণ্টের কাগজ করিতে সমর্থ হইয়াছেন বলিয়া প্রশ্ন হয়। তর্কবাগীশ তৎক্ষণাৎ উহাঁদিগেকে আর এক গৃহে আনয়ন করিয়া আপনার দুইটী কনিষ্ঠ সহোদর ও পুত্র প্রভৃতিকে দেখাইয়া বলিলেন এই সকল তাঁহার জীবন্ত ধনসম্পত্তি ও গবর্ণমেণ্টের কাগজ, মরা কাগজে তাঁহার আস্থা নাই। অত্মীয়বর্গ ব্যতীত বিদ্যার্থী বিদেশীয় ছাত্রগণকে বাসায় রাখিয়া পড়াইতে হইত। ফলতঃ তর্কবাগীশের আয় এই সকল কার্য্যে পর্য্যাপ্ত হইত না। সময়ে সময়ে মধ্যম ভ্রাতার সাহায্য লইতে হইত।

পিতা রামণারায়ণের ন্যায় প্রেমচন্দ্র দয়ার্দ্রচিত্ত ছিলেন। সাধ্যানুসারে পরের দুঃখ মোচনে নিয়ত জাগরূক থাকিতেন। ইং ১৮৬৬ অব্দে দেশে দুর্ভিক্ষের সমাচার পাইয়া প্রেমচন্দ্র কাশী হইতে সসম্ভ্রমে মধ্যম সহোদরকে লিখিয়াছিলেন—"দেশে অন্নাভাবের সম্বাদে যারপর নাই চিন্তাকুল হইয়াছি, গ্রামের লোকগুলি অন্নের নিমিত্ত স্থানান্তরে এবং অন্নার্থীরা বাটী হইতে বিমুখ হইয়া না যায় ইহার বন্দোবস্ত করিবে এবং পৈতৃক ধর্ম্ম ও কর্ম্ম স্মরণ করিবে।"

এদিকে উঁহার মধ্যম সহোদরও নিশ্চিন্ত ছিলেন না। দেশে হাহাকার রব উঠিবার সমকালেই তিনি গোলা হইতে ধান্য বাহির করিয়া গ্রামের

দুঃস্থ লোকদিগকে বিতরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। বুভুক্ষাকাতর অন্নার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে থাকায় কয়েক মাসের নিমিত্ত রীতিমত অন্নছত্র খুলিয়াছিলেন। দেশে পুনরায় অন্নসংস্থান হইলে পরিশোধ করিবে বলিয়া যাহারা ধান্য লইয়াছিল তাহাদের নিকট হইতেও সমস্ত ধান্য গ্রহণ করেন নাই। এই বন্দোবস্তে প্রেমচন্দ্র অতিশয় প্রীতি লাভ করিয়াছিলেন।

কলের জল ব্যবহার বিষয়ে আন্দোলন হইলে তর্কবাগীশ বলিয়াছিলেন,—কলিকাতায় দিন দিন যেরূপ জনতা বৃদ্ধি হইতেছে ইহাতে এই সহরটীর চতুর্দ্দিকে ভাগীরথীপরিবেষ্টিত হইলে সাজিত ও সুবিধা হইত। কলের জলে সাধারণের অনেক উপকার সাধিত হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু যে প্রণালীতে জল উত্তোলিত ও বিতরিত হইবে বলিয়া শুনা ও অনুমান করা যাইতেছে তাহাতে এই জল ব্যবহার আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে তাঁহার মৃত্যু অথবা কলিকাতা পরিত্যাগ করা ঘটিলেই ভাল হইবে। বস্তুতঃ এই চিন্তায় তর্কবাগীশ বড় ব্যাকুলিতচিত্ত এবং কলিকাতা পরিত্যাগ করিবার নিমিত্ত ত্বরান্বিত হইয়াছিলেন।

এক সময়ে প্রেমচন্দ্রের অন্যতম ভ্রাতা পারিবারিক এক দুর্ঘটনা উপলক্ষে কাশীতে পত্র লিখিলে তিনি তদুত্তরে লিখিয়াছিলেন,—এইপ্রকার শোকজনক সংবাদে আমায় আর পর্য্যাকুল করিও না। বাটীর অপরেও যেন এইরূপ সমাচার না লেখেন বলিয়া দিও। এরূপ মানসিক দুঃখ মোচনের নিমিত্ত আমার বিবেক এখনও প্রচুর হয় নাই। ইহলোক অবিচ্ছিন্ন সুখশান্তির স্থান নহে এবং শোক হইতে কেহই উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই জানিও। ইহা ব্যতীত অন্য সান্ত্বনাবাক্য নিষ্ফল জানিও।

শেষাবস্থায় প্রেমচন্দ্র নিজের শারীরিক অবস্থার বিষয়ে কোন কথা কাহাকেও লিখিতেন না এবং পারিবারিক অশুভ সমাচার শুনিতেও ভাল বাসিতেন না। পুরীতে অবস্থানসময়ে এক নিশাশেষে উহাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা অকস্মাৎ জাগৃত ও চকিত হইয়া উঠিলেন এবং মস্তক প্রদেশে প্রেমচন্দ্রকে দেখিবেন ভাবিয়া নিদ্রাজড় লোচনযুগল সতৃষ্ণভাবে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। গৃহে আলোকসত্বেও কিছুই দেখিতে পাইলেন না। স্বপ্নে দেখিলেন তাঁহার শিরোভাগে তক্তাপোষের উপরে দক্ষিণ পদ তুলিয়া এবং কতক খানি

ফালি কাপড় ধরিয়া প্রেমচন্দ্র শক্তভাবে পুল্‌টিস বাঁধিয়া দিবার নিমিত্ত কনিষ্ঠ সহোদরকে সঙ্কেত করিতেছেন। ঐ রাত্রিতে আর তাঁহার নিদ্রা হইল না! পরদিন তিনি কাশীতে এক পত্র লিখিলেন এবং জিজ্ঞাসিলেন —আপনার কটিদেশের অধোভাগে কোন স্থানে কোন প্রকার ক্ষত হই-য়াছে কি না ও তাহাতে পুল্‌টিস্ লাগান হইতেছে কি না? কল্য রাত্রিতে স্বপ্নানুভূত একটী বিষয়ের যাথার্থ্য জানিবার নিমিত্ত এই জিজ্ঞাসা। এপ্রশ্নের অন্য উদ্দেশ্য নহে জানিবেন। ইহার উত্তরে প্রেমচন্দ্র কনিষ্ঠ সহোদরকে এইরূপ লিখিয়াছিলেন—দেখিতেছি তোমার স্বপ্নটি অতি অদ্ভুত। সত্যই আমার দক্ষিণ উরুর অধোভাগে একটী বড় ফোড়া হইয়াছে। বড় বধু ভালরূপে পুল্টিস বাঁধিতে পারেন না। বিশেষতঃ কথিত রাত্রিতে পুল্টিসটী মনমত ভাবে বাঁধা না হওয়ায় তাহা টিপিয়া ধরিয়া তাকিয়ার উপরে হেলিয়া পড়ি এবং ভ্রাতৃবিয়োগের পরে বাম উরুতে এইরূপে যে এক ফোড়া হইয়াছিল তাহাতে পুল্টিস আদি বাঁধিয়া তুমি যথোচিত সুশ্রূষা করিয়াছিলে এক্ষণে নিকটে থাকিলে বিশেষ যত্ন করিতে এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে নিদ্রিত হই। ইহাই তোমার স্বপ্ন দর্শনের কারণ জানিবে। বোধ হয় সব কথা বিশদভাবে বলা হইল না। প্রকৃততত্ত্ব আমি এইরূপে বুঝি— তুমি সমস্ত দিন আপন কার্য্যে ব্যাপৃত; হয় ত দিবাভাগে বা রাত্রিতে শয়নকালে আমার বিষয়ে তোমার কোন চিন্তাই ছিল না; কাজেই আমার পীড়ার বিষয় স্বপ্নযোগে জানিবার কোন সম্ভাবনা ছিল না, কিন্তু তোমায় স্মরণ করিতে করিতে আমি নিদ্রিত হই ও আমার ব্যাকুলিত অন্তরাত্মা তড়িৎ বেগে অতি দূরে উপনীত হইয়া আপন অবস্থা তোমার আত্মার নিকটে বিজ্ঞাপন করিয়াছে; তুমি অকস্মাৎ জাগৃত হইয়া আত্মোপদেশ উপলব্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছ। আমরা উভয়েই তখন বাহ্যত্যাগে স্বপ্না-বস্থা অনুভব করিতেছিলাম কিন্তু অন্তঃক্রিয়াবিশিষ্ট আত্মার ব্যাপার অব্যা-হতরূপে চলিতেছিল। আত্মার এই অদ্ভুত গতি ও তত্ত্ব ঐন্দ্রজালিকব্যাপার-বৎ বিস্ময়জনক বোধ হয়। পরিমিত দেহধারী মানবের জ্ঞানও পরিমিত। কাজেই বিস্ময়ও পদে পদে জন্মিয়া থাকে। অনন্ত ব্রহ্মের অংশ আত্মারূপে জীবশরীরে বিদ্যমান, এই জ্ঞান থাকিলে আত্মার গতি ও শক্তিতে বিস্মিত

হইতে হয় না। যদি তুমি দেহাত্মবাদী হও তবে আমার কথা সম্যক্‌রূপে বুঝিতে পারিবে না। কারণ দেহাত্মদর্শী দেহের সহিত আত্মার দর্শন করিয়া অপার ভ্রমে পতিত হইয়া থাকেন। বিশুদ্ধ চিত্ত, জ্ঞানীগণ আত্মাকে দেহে নির্লিপ্ত ভাবে অবস্থান করিতে দেখিয়া থাকেন। স্বপ্নে বা স্থূলদেহাত্যয়ে আত্মার গতি ও শক্তি সংহৃত হয় না। এই শক্তিবলে তুমি দূরবর্ত্তী হইয়াও আমার শারীরিক অবস্থা জানিতে সমর্থ হইয়াছ।

কাশীতে অবস্থান সময়ে স্বদেশীয় এক বয়োবৃদ্ধ বিচক্ষণ * ব্যক্তি প্রেমচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া প্রশ্ন করিয়াছিলেন—মরণের প্রতীক্ষায় এইরূপে এক স্থানে দীর্ঘকাল বসিয়া থাকার প্রয়োজন কি? যদি এই স্থানেই থাকাই স্থির হয় তবে শাস্ত্রান্তর পরিত্যাগ করিয়া এখানেও আবার ছাত্রগণ লইয়া কাব্যালঙ্কারের আলোচনা ও নায়ক নায়িকার রূপ আদি বর্ণনায় মত্ত থাকা কেন?

প্রেমচন্দ্র বলিলেন—প্রশ্নগুলি সাধারণ জনের মত করা হইল। কাব্যরসজ্ঞ হইলে এরূপ প্রশ্ন করিতেন না। আমার মরণ কামনা বা জীবনবাসনা নাই। সময় সমাগত জানিয়া মর্ত্ত্যভূমির অগ্রবর্ত্তী এই এক পান্থশালায় আসিয়াছি। স্বগৃহ এবং এই স্থানের মধ্যে বৈলক্ষণ্য জ্ঞান নাই। এখানে স্বচ্ছন্দচিত্তে সদা অপ্রমত্ত অবস্থায় আছি। সঙ্কেতমাত্রে প্রফুল্লচিত্তে যাত্রা করিব। যাত্রাকালে কাহারও সাহায্য বা পার্থিব কোন পাথেয়ের অপেক্ষা রাখি নাই। আত্মনির্ভরই আমার সম্বল। প্রথমাবধি তীর্থভ্রমণের

---

* এই সম্পর্কে কথাবার্ত্তাগুলি মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের স্বর্গীয় পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে হইয়াছিল। তর্কবাগীশ ৺ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে বড় একরোকা ও আত্মাভিমানী বলিয়া জানিতেন। তিনি উঁহার মনঃপ্রীতির নিমিত্ত প্রশ্নগুলির যথোচিত উত্তর দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন বোধ হয় না। প্রেমচন্দ্রের লোকান্তর গমনের পরে তাঁহার অতি আদরের জিনিষ পাকা বেতের একটী উৎকৃষ্ট ছড়ি লইয়া উঁহার তৃতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ব্যবহার নিমিত্ত অর্পণ করিয়াছিলেন। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাহা গ্রহণ করেন নাই, বলিয়াছিলেন—তর্কবাগীশ কাব্যরসিক বিলাসী বাবু পণ্ডিত ছিলেন; এই ছড়িটী তাঁহার হাতেই বেশ সাজিত; আমি সাদাসিদে লোক এই ছড়ি হাতে করিলে পাছে বিলাসী হইয়া পড়ি মনে এই ভয়।

অভিলাষ রাখি নাই। আপনি সকল তীর্থে পর্য্যটন করিয়াছেন। এক স্থানে থাকা আপনার মনঃপূত হইতেছে না। চিত্ত শুদ্ধির উদ্দেশে পবিত্র তীর্থে গমন আবশ্যক। যদি এক তীর্থে বসিয়া ইন্দ্রিয় সংযম দ্বারা চিত্তশুদ্ধি ও জ্ঞানবৈশদ্য জন্মে তাহাতেই তীর্থপর্য্যটনের ফল লাভ হইতে পারে, তদ্বিষয়ে যত্ন করিতেছি। বিশুদ্ধ মন ও বিশুদ্ধ জ্ঞানই পবিত্র তীর্থ।

অদ্যাপি কাব্যালঙ্কারের অধ্যাপনা কোন প্রকার পার্থিব ভোগতৃষ্ণার তৃপ্তি নিমিত্ত নহে। এই প্রকার প্রবৃত্তিস্রোত একবারে পরিশুষ্ক। সমস্ত জগতের নায়ক নায়িকায় আর চিত্তবিনোদ হয় না। বাল্যাবধি যাহা শিখিয়াছিলাম তাহা আমরণ অন্যকে শিখান উদ্দেশ্য। ইহাই পণ্ডিতের পক্ষে প্রশস্ত দান। বিতরণ নিমিত্ত অন্য ধন সঞ্চয় করি নাই। ফলে কাব্যানুশীলনের অনেক উৎকৃষ্ট উদ্দেশ্য। কাব্যমধ্যে বেদ, দর্শন, বিজ্ঞান, রাজনীতি, অর্থনীতি, ইতিহাস আদি সকল শাস্ত্রেই সুসংশ্লিষ্ট ভাবে প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। কাব্যের দিব্যালোকেই সমস্ত জগৎ এইরূপ মনোহর মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। কাব্যামৃতরসাস্বাদেই মনুষ্যসমাজের আভ্যন্তরীণ প্রকৃতির এইরূপ কমনীয় উন্নতি সাধিত হইয়াছে। কাব্যবলেই বাল্মীকি, ব্যাস, কালিদাস, ভবভূতি প্রভৃতি কবিগণ লোকসমাজে উচ্চ আসন পাইয়াছেন। কাব্যই ভারতীয় আর্য্য জাতির অতুল বল ও গৌরবস্থল। ভারতীয় ক্ষত্রিয়-বংশের বীর্য্য ও ঐশ্বর্য্যের অন্তর্ধানে এবং জাতীয় স্বাধীনতার অপগমেও ভারতীয় আর্য্যজাতি এখনও পৃথিবীর সভ্যজাতির মধ্যে যে পরিগণিত হইতেছে তাহা কেবল সংস্কৃত কাব্যালঙ্কারের মাহাত্ম্য জানিবেন। যে দেশের সাহিত্য শাস্ত্রের দোষ গুণ আদির সমালোচনা নিমিত্ত এরূপ উৎকৃষ্ট ও পূর্ণাবয়ববিশিষ্ট অদ্ভুত অলঙ্কারশাস্ত্র প্রণীত হইয়াছিল, সে দেশের সাহিত্য-শাস্ত্রের উৎকর্ষের পরিচয় দিবার প্রয়োজনাভাব। বস্তুতঃ সংস্কৃত সাহিত্যই ভারতীয় আর্য্যজাতির উন্নত জীবনের প্রকৃত চিত্র অদ্যাপি উজ্জ্বল বর্ণে প্রকটিত করিতেছে এবং মধুর ঝঙ্কারে সমস্ত সাধু সমাজকে মাতাইয়া তুলি-তেছে। এইরূপ কাব্যালঙ্কারে আপনার বিরাগের কারণ বুঝিতে পারি-তেছি না। বোধ হয় বৈষ্ণবকুলোদ্ভূত কবিগণের কলুষিত কাব্য পড়িয়াই সমুদায় কাব্যশাস্ত্রের উপরে আপনার এরূপ বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছে। ফলে

সংস্কৃত কাব্যালঙ্কারে যত দিন লোকের অনাস্থা থাকিবে ততদিন বঙ্গদেশ ও বঙ্গভাষার উন্নতিসাধন হইবে না জানিবেন। কাব্যালঙ্কারের অনুশীলন ও উন্নতিসাধন করিতে করিতে জীবন শেষ হয় বড়ই বাসনা।

ইহাই ঘটিয়াছিল। এই মহাপুরুষের পবিত্র জীবন এইরূপ জ্ঞানানুশীলন ও জ্ঞান বিতরণ কার্য্যেই পর্য্যবসিত হইয়াছিল।

তর্কবাগীশের সঙ্গে কাব্যশাস্ত্র সম্বন্ধে বাদানুবাদের আর একটী সুযোগ ঘটিয়াছিল। একবার গ্রীষ্মাবকাশে কলিকাতা হইতে শাকনাড়ার বাটীতে যাওয়া হয়। দুইটী ছাত্র, দুই সহোদর ও পুত্র প্রভৃতি তর্কবাগীশের সমভিব্যাহারে যাইতে ছিলেন। সাঁক্‌টিকর ষ্টেশনে নামিয়া দামোদর নদের দক্ষিণ পার্শ্বে মোহনপুর গ্রামের বাঁধের নিকটে বসিয়া সকলে কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করেন। গ্রীষ্ম সময়ে দামোদরের জল অতি নির্ম্মল ও মধুর হয়। নিকটবর্ত্তী দহের সুশীতল জল ও ছায়াবহুল বৃক্ষতল বিশ্রাম করিবার নিমিত্ত পথিকদিগকে যেন আহ্বান করিতেছিল। নিকটে একটী দেবালয়। তাহার আসে পাশে কতকগুলি রক্তাশোক এবং পাটল বা পারুল গাছে ফুল ফুটিয়াছিল। ঘন নীল পত্রাবলিমধ্যে রক্তাশোকের গুচ্ছ অতি মনোহর দৃশ্য। পারুল গাছগুলি বড় বড়। তাহার ফুল খসিয়া ইতস্ততঃ পড়িতেছিল। তর্কবাগীশ একটী পারুল ফুল লইয়া বলিলেন, এই ফুল বসন্ত সময়েই প্রচুর পরিমাণে ফুটিয়া থাকে; কবিরা ইহাকে কন্দর্পের তূণ বলিয়া যে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা প্রকৃত। বোধ হয় তোমরা কেহই পূর্ব্বতন যোদ্ধাদিগের চর্ম্মনির্ম্মিত তূণ দেখ নাই; তাহার গঠন ঠিক্ এই ফুলের মত; ইহার পশ্চাদ্ভাগ ও সম্মুখবর্ত্তী পর্দ্দা এবং উভয় পার্শ্বে উন্নতানতভাবে যে তারতম্য রহিয়াছে, এইরূপ ঢেউখেলান গোচ তারতম্য বিশিষ্ট বাণাধার পৃষ্ঠদেশে বাঁধিলে যুদ্ধ সময়ে ইচ্ছামত বাণ টানিয়া লইবার সুবিধা হইত। সকলেই এক এক বা ততোঽধিক পারুল ফুল হাতে লইয়া তর্কবাগীশের ব্যাখ্যার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে সমর্থ হইলেন। এই সময়ে উহাঁর অন্যতর ভ্রাতা বলিলেন কতকগুলি ফুল ও স্ত্রীলোকের বর্ণনা লইয়া এদেশের কবিগণ যে সময় নষ্ট করিয়াছেন; তাহার অর্দ্ধাংশ উন্নত বিষয়ের বর্ণনায় ব্যয় করিলে সমধিক মঙ্গল সাধন হইত। ইহা শুনিবামাত্র তর্কবাগীশ কিছু বিরক্তচিত্তে বলিয়া উঠিলেন—

দেশান্তরের কবিসঙ্গে স্বদেশীয় কবিগণের তুলনা করিবার নিমিত্ত তোমার কিরূপ সামর্থ্য জন্মিয়াছে জানি না। পাঠশালার নিয়মিত পরীক্ষার উপযোগী শাস্ত্রজ্ঞান এবং শাস্ত্রতত্ত্ব সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিবার বিশিষ্ট জ্ঞান মধ্যে অনেক বৈলক্ষণ্য আছে ;—সংস্কৃত-সাহিত্যের সংখ্যা অনেক, সমস্ত গ্রন্থের সার মর্ম্ম অবগত না হইয়া বিজাতীয় কাব্যসঙ্গে তুলনায় ইহার উৎকর্ষাপকর্ষ বিষয়ে সিদ্ধান্ত করা সাহসের কার্য্য ; তবে জগতের ললামভূত দুইটী পদার্থ অর্থাৎ কুসুম ও কামিনীর বর্ণনায় এতদ্দেশীয় কবিরা কৃতিত্ব প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন বলিয়া যে প্রশংসা করা হইল, ইহাই তাঁহাদের পক্ষে যথেষ্ট শ্লাঘা মানিতে হইবে। এই সময়ে ছাত্রমধ্যে একজন কনিষ্ঠ ভ্রাতার পক্ষ অবলম্বন করিয়া বলিলেন—ইংরাজী কাব্যের স্থানে স্থানে যে সকল সাহিত্যোচিত উচ্চভাব দেখিতে পাইয়াছেন এবং সংস্কৃত কাব্যের স্থানে স্থানে যে সকল অশ্লীলতা দোষ লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহা স্মরণ করিয়াই বোধ হয়, ইনি এইরূপ বলিতেছেন ; এই ফুলটীকে কন্দর্পের তূণরূপে বর্ণনা আদি আজ কালের মার্জ্জিতরুচির বিরুদ্ধ, মহাকাব্যে মহদুচ্চ ভাবের প্রত্যাশা করা যায় ; ইহাতেই কবির মহত্ত্ব ও প্রতিভা জানা যায় ও কাব্যের প্রকৃত মূল্য বৃদ্ধি হইয়া থাকে ; গ্রাম্য অশ্লীলতা আদি দোষ এই সকল উন্নতভাবের অন্তরায়। ইহা শুনিয়া তর্কবাগীশ বলিলেন—ভালই হইয়াছে, তোমরা সকলেই এক দলের লোক দেখিতেছি—বেলা অবসন্ন হইতেছে, আইস, পথে যাইতে যাইতে এই বিষয়ে আমার বক্তব্য কয়েক কথা বলিতেছি—তোমরা সকলেই অলঙ্কার গ্রন্থ সকলে রস, ভাব ও কাব্য আদির লক্ষণ পড়িয়াছ ও স্মরণ করিতেছ ; অলঙ্কার শাস্ত্রসঙ্গত কাব্য যদি রসের উৎস বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, তবে কবিসৃষ্ট নায়কনায়িকার চরিত্রই সেই রসের আধার বলিতে হইবে ; নায়ক নায়িকার সুসঙ্গত চরিত্রের গঠন, [illegible] অবস্থার এবং বস্তুস্বভাবের বা জগৎতত্ত্বের যথাবদ্‌বর্ণনই কবির গুণপণা ; ইহাতেই ভাবের স্ফূর্ত্তি ও রসের উৎপত্তি ; ভূপৃষ্ঠে রমণী একটী মনোহর দৃশ্য ; প্রেমই জগতে জীবসৃষ্টির পরম মঙ্গলসাধন ; এই সকল উপাদান পরিত্যাগ করিলে কবি একান্ত দরিদ্র ; যে স্ত্রী ধর্ম্মকামার্জ্জনে সঙ্গিনী বলিয়া উল্লিখিত, সংসার মরুস্থলীতে যিনি স্নেহময়ী হ্লাদিনী অমৃত স্রোতস্বিনী, সেই স্ত্রীর রূপ গুণ

বর্ণনে কাব্য অপবিত্র, ইহা শুনিয়া বিস্মিত হইতে হয়; শ্রব্যকাব্যে এরূপ বর্ণনে কবি দোষার্হ নহেন; দৃশ্যকাব্যে লজ্জাকর কতকগুলি বিষয়ের বর্ণন অলঙ্কার নিয়ম বিরুদ্ধ সন্দেহ নাই; প্রাচীন মহাকবিদিগের সকলপ্রকার কাব্য মধ্যে সমুদ্রতীরে স্ত্রীলোলুপ রাক্ষসরাজের অন্তঃপুরেই দেখ, অথবা গঙ্গা, যমুনা, দৃষদ্বতী, সরস্বতী, সরযূ, সিপ্রা, ম্যালিনী তীরে রাজন্যগণের শুদ্ধান্ত মধ্যে এবং মুনিগণের আশ্রমপদেই দেখ, সর্ব্বত্রই বিশুদ্ধ দাম্পত্য সুখ ও স্ত্রী-চরিত্রের যে পবিত্র পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা জগতের কোন জাতির মধ্যে খুজিয়া, পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। এখন সেই স্ত্রী-চরিত্র বিষয়ক গুণগান অরুচিকর ও অপ্রীতিকর ইহা কম বিস্ময়ের বিষয় নহে; বুঝিলাম এসকলই সময় ও রুচির পরিবর্ত্তনের ফল; ফলে লোকের আভ্যন্তরীণ দৌর্বল্য ও সমাজবন্ধনের শৌথিল্যই ইহার কারণ; দিন দিন লোকের চরিত্রের পবিত্র তেজ ও ধর্ম্মভাবের হ্রাস হইতেছে; সকল বিষয়েই সেই সাত্বিকভাব ও সাত্বিকপ্রেমানন্দের অভাব দেখা যাইতেছে; সংস্কৃত সাহিত্যে যে একটা ধর্ম্মভাবের আভাস ছিল তাহা ক্রমেই মলিন হইয়া পড়িতেছে; সকল বিষয়েই বাড়াবাড়ি অমঙ্গলের কারণ; পরবর্ত্তী বৈষ্ণব কবিরা সস্তাদরে প্রেম বিলাইতে গিয়া বাজার একবারে খারাপ করিয়া দিয়াছেন; এখন ব্যাকরণের অঙ্গ ক্ষত বিক্ষত; মহাকাব্য কর্ত্তিত হইয়া খণ্ডকাব্যে পরিণত; ইহাতেই যদি বাবুদের "মরেল" শিক্ষা হয়, হউক; আজকাল অনেকে স্তন্য দুগ্ধ বলেন কিন্তু "স্তনমণ্ডল" নাম শুনিলেই মুখ বাঁকাইয়া থাকেন; অশ্লীলতাপূর্ণ বাইবেলের কদর্য্য অংশ পাঠ করেন কিন্তু অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বর্ণন আছে বলিয়া শক্তিদেবীর ধ্যান মুখে আনেন না; জাতীয় স্বাধীনতার অভাবে সংস্কৃত সাহিত্যের অবসান সময় সমাসন্ন ভাবিয়া সঙ্কিতচিত্ত ও নিরুৎসাহ হইতেছি।

পরিচ্ছদ বিষয়ে প্রেমচন্দ্র সর্ব্বদাই পরিষ্কৃত ও পরিচ্ছন্ন থাকিতেন। গ্রীষ্মে উত্তম ধুতি ও উড়ানী, শীতকালে এক শাল এবং পীতবর্ণের পা-গেলা চটি জুতা এইমাত্র তাঁহার পরিচ্ছদ ছিল। মধুর মূর্ত্তি বলিয়া ইহাতেই তাঁহাকে বেশ দেখাইত। কেহ কখন তাঁহাকে মলিন বেশে দেখিয়াছিলেন একথা বলিতে পারিবেন না। ধুতি উড়ানীর সংখ্যা বিস্তর ছিল এবং তাহা নিয়ত পরিষ্কৃত থাকে এই বিষয়ে তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল।

হারা নামে একটী প্রাচীন ধোপা তর্কবাগীশের কাপড় ধোলাই করিত। সে কাপড় অতি পরিষ্কাররূপে ধোলাই করিত এবং কাপড়ের ধাৎ রাখিতে পারিত, এমন কি খুব পুরাতন কাপড়ও ধোপের পরে নূতন বলিয়া বোধ হইত; কিন্তু সে কাপড় আনিতে বড় বিলম্ব করিত। এঁড়েদহ হইতে তাহাকে যাতায়াত করিতে হইত। ইহাতেও কতক বিলম্ব ঘটিত। মাতৃ-পীড়া ও মাতৃবিয়োগ আদি বিলম্বের ওজর হারার মুখে বাঁধা গৎ ছিল। অনেক দিন বিলম্বের পরে একদা গ্রীষ্মকালের মধ্যাহ্ন সময়ে তর্কবাগীশ আহারান্তে আচমন করিতেছেন এমন সময়ে কাপড়ের বস্তা ফেলিবার মত একটা শব্দ তাঁহার কর্ণগোচর হইল। ধোপা কাপড় আনিয়াছে ভাবিয়া চাকরকে উদ্দেশ করিয়া তর্কবাগীশ বলিয়া উঠিলেন, "ওরে কাপড় গণেগেঁতে লয়ে হারাকে দূর করে দে, আর কাপড় চোপড় দিস না"। হারা অক্ষুব্ধ। সে এক থামের অন্তরালে বসিয়া চাদরের একপাশ ধরিয়া মুখে ও মাথায় বাতাস করিতে করিতে জনান্তিকে কহিতে লাগিল,—আজ কাল ধোপার ব্যবসা ভাল! যার বাড়ী যাই, জামাই আদর পাই; সকলেই খড়্গহস্ত! তবে পণ্ডিতের মুখে এরূপ কথা ভাল লাগে না। পণ্ডিতের অগোচর কিছুই নাই। না-না, কেমন কোরেই বা পণ্ডিতের দোষ দি? পণ্ডিত যাকে একবার পাঠ দেন, সে পড়ো অম্‌নি গোলাম; পথে ঘাটে যেখানে তাঁরে দেখে, অম্‌নি গুরু বলে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে, একেই ত বলে ওস্তাদি। কিন্তু ধোপা, দর্জি ও যাত্রাওয়ালার সাকরেদ্ যে সেরূপ নয়, পণ্ডিতের এ জ্ঞানটুকু নাই। যারে একবার ধরণ ধারণ বলে দিলাম, ইস্ত্রি ধর্ত্তে শিখালাম, সে অমনি মিস্ত্রি হয়ে দাঁড়ালো। আলাহিদা ব্যবসা খুলে বস্‌লো, হয় ত আবার দুঘর খদ্দের ভাঙ্গাইয়া নিলো। তেমনি খলিফার নিকটে এক রকম কাট্-ছাট্ শিখ্‌লো, অম্‌নি দর্জি হয়ে চৌমাথায় এক নূতন দোকান ফাঁদলো। যাত্রার দলের প্রধান বালক দূতীসেজে অধিকারীর সঙ্গে গোটাদুই আসর যদি ফির্‌লো, অম্‌নি সে নূতন দল বেঁধে বস্‌লো। এ সব লোকের সাক্‌রেদ্ যে ওস্তাদ্ বলে মানে না! নচেৎ আজ আমার ভাবনা কি? আমার সাকরেদ্ কত! গঙ্গার এ পারে হারার কাছে কাজ শিখেনেই এমন ধোপাই নাই, আমারও আজ্ এককালেজ পড়ো

বল্‌লে চলে, কিন্তু হলে হয় কি, কাজের সময়ে কাহাকেও পাওয়া যায় না!

হারা ধোপার এই সকল কথা শুনিতে শুনিতে তর্কবাগীশ তাহার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং বলিলেন, হারান্! তুমি যে এরূপ জ্ঞানী ও বহুদর্শী তাহা জানিতাম না, আজ হইতে আমি তোমার সাক্‌রেদ হইলাম; কাপড় কাচিতে পারিব না কিন্তু তোমায় ওস্তাদ্ বলিয়া মানিতে থাকিব; আজ তুমি আমায় বড় জ্ঞানের পাঠ দিলে, তুমি, এই যাহার কিছুই অগোচর নাই বলিয়া কহিতেছিলে, সে তোমার নিকটে এখনও অতি অজ্ঞ। আমি আর কয়েকস্থুট কাপড় বেশী করিব, বিলম্ব করিলেও তোমায় আর তিরস্কার করিব না। রৌদ্রে তুমি বড় ক্লান্ত হইয়াছ, প্রথমে তোমার মুখ দেখিলে কোন দুর্ব্বাক্য বলিতাম না; যাহা বলিয়াছি তাহার নিমিত্ত মনে বড় কষ্ট পাইতেছি; কাপড় আনিতে পার বা না পার, মাসকাবার হইলেই তোমার বেতন লইয়া যাইও। ইহার পর তর্কবাগীশ হারাকে ওস্তাদ্‌জী বলিয়া ডাকিতেন। তাহার মৃত্যুর পরেও তাহার কন্যাদিগকে ডাকাইয়া কাপড় ধোলাই করাইয়া লইতেন এবং অঙ্গীকৃত বেতন অপেক্ষা কিছু কিছু বেশী দিতেন।

কলেজে অধ্যাপনা সময়ে তর্কবাগীশ চাঁপাতলা বা মৃজাপুরের দীঘীর নিবটবর্ত্তী কয়েকটী বাটীতে ক্রমে বহুকাল বাস করিয়াছিলেন। যে সময়ে কথিত দীঘীর নিজ পূর্ব্বদক্ষিণ কোণের বাটীতে তাঁহার বাসা ছিল তখন তাঁহার বাল্যবন্ধু ও টোলের সহাধ্যায়ী রামব্রহ্ম ভট্টাচার্য্য নামে এক পণ্ডিত সাক্ষাৎ করিতে আইসেন। তখন তিনি কথকের ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। তর্কবাগীশ ঐ পণ্ডিতের যথোচিত অভ্যর্থনা করিলেন। কথক পণ্ডিত মহাশয়ও কয়েকটী উত্তম গীত গাইয়া সকলের আনন্দ উৎপাদন করিলেন। পরে সংসারিক বিষয়ের কথোপকথন কালে তর্কবাগীশকে মাস মাস ২৪৲ টাকা ঐ বাঁসার ভাড়া দিতে হয় শুনিয়া পল্লীগ্রামের পণ্ডিত মহাশয় সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন। যে ঘরে বসিয়া কথাবার্ত্তা হইতেছিল ঐ ঘরের দক্ষিণে ও উত্তরের জানালা খোলা ছিল। পশ্চিমের জানালাটী বন্ধ ছিল। কথক স্বয়ং উঠিয়া পশ্চিমের জানালাটী খুলিলেন এবং "ও

তর্কবাগীশ! এই খানেই যে মজা, এই জানালার মূল্যই যে চব্বিশ টাকা দেখ্‌চি” বলিয়া উঠিলেন। তখন দিবাবসান ও সূর্য্য অস্তগত হইয়াছিল। ঐ জানালা দিয়া দীঘীর দক্ষিণের বাঁধাঘাট, সাঙ্কলপূর্ণ পাড় এবং পাড়ার জেলে মালা আদি ইতর লোকের সালঙ্কৃতা স্ত্রীলোকেরা কলস কক্ষে উঠিতেছে ও নামিতেছে দেখা যাইতেছিল। কথক মহাশয়ের আমোদ চড়িবার প্রকৃত কারণ বুঝিতে পারিয়া তর্কবাগীশ যেখানে বসিয়া তামাক খাইতেছিলেন তথায় বসিয়াই গম্ভীর ভাবে বলিলেন—এইটী পশ্চিমের জানালা—অপরাহ্নে প্রায় খোলা হয় না, রাত্রিতে শয়ন কালে যখন এই জানালা খোলা হয় তখন কয়েক খণ্ড কাষ্ঠ ফলকের মূল্য অপেক্ষা উহার এত বেশী মূল্য থাকে না। ইহা শুনিয়া কথক মহাশয় ঈষৎ হাসিয়া নীরব রহিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

কবিত্ব।

প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ কবি ছিলেন। কি প্রকার কবি, এই বিষয়টী তাঁহার সমানধর্ম্মা কোনও সহৃদয় ব্যক্তিই বর্ণনা করিতে সমধিক সমর্থ। এই সম্পর্কে ভয়ে ভয়ে কয়েকটী মাত্র কথা বলা আমার উদ্দেশ্য। বাগ্‌-বৈভব, রচনাশক্তি, ললিত পদবন্ধনকৌশল, ভাবুকতা, হৃদয়মধ্যে অকস্মাৎ আনন্দনিস্যন্দনশক্তি প্রভৃতি কবির গুণপরম্পরা বাল্মীকি, ব্যাস, কালিদাস, ভারবি, ভবভূতি প্রভৃতি প্রাচীন কবিগণের রচনায় লক্ষিত হয়। রচনাচাতুর্য্যে কবির প্রকৃতি ও ভাবতরঙ্গ সহৃদয় পাঠকের হৃদয়ে সমুত্থিত হয় এবং অলক্ষিত ভাবে তাহার মন, প্রাণ মোহিত ও পুলকিত করে। বিশ্ববিখ্যাত পূর্ব্বতন কবিগণের সঙ্গে বর্ণনীয় কবি প্রেমচন্দ্রের তুলনায় অনেক তফাৎ পড়িবে সন্দেহ নাই। এইরূপ তুলনায় তাঁহার স্পর্দ্ধাও ছিল না এবং আমরাও সাহসী নহি। স্পর্দ্ধার কথা দূরে থাকুক প্রেমচন্দ্র বলিতেন পাঠ ও পাঠনা সময়ে নিখিল গুণোন্নত কালিদাসের কবিতা সকল সরল ও প্রাঞ্জল বোধ হয়। কিন্তু প্রকৃত সাহিত্যসেবক প্রাণপণে যত্ন করিলেও আজ কাল যে কেহ এই কবিগুরুর রচনা চাতুর্য্যের অনুকরণে সফলকাম হইতে পারেন এরূপ বোধ হয় না। বোধ হয় কালিদাসের মস্তক নির্ম্মাণের উপাদান সামগ্রী একবারে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। ফলতঃ এই কবিবরের অক্ষয্য বাক্‌সম্পত্তি, বিশ্বব্যাপিনী জ্ঞান-বিজ্ঞানবিস্তৃতি ও রসমাধুর্য্যের সুন্দর অভিব্যক্তি শক্তির বিষয়ে নির্জ্জনে চিন্তা করিতে বসিলে পদে পদে বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইতে হয়। এক স্থানে প্রেমচন্দ্র আপনাকে বঙ্গের কবি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু এই কথা তিনি অতিমৃদুভাবে ও বিনীতভাবে বলিয়াছেন। কবিত্ববিষয়ে বঙ্গের বর্ত্তমান হীন অবস্থা লক্ষ্য করিলে প্রেমচন্দ্রের এইরূপ বচন নিতান্ত অসঙ্গত বোধ হয় না। পাণ্ডিত্য, ভাষাধিপত্য রচনাচাতুর্য্য ও কোমলপদবন্ধনকৌশল প্রভৃতি

বিষয়ে প্রেমচন্দ্র যে অতি কুশল ছিলেন তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। সাহিত্য-দর্পণের টীকাকার স্ববংশীয় রামচরণ বিদ্যালঙ্কার এবং স্বদেশস্থ অর্থাৎ রাঢ়-দেশীয় অনর্ঘরাঘব নামক নাটকের রচয়িতা মুরারিমিশ্রের রচনার সঙ্গে তুলনা করিলে প্রেমচন্দ্রের গদ্য ও পদ্য রচনা যে অনেকাংশে সমধিক মার্জিত, পরিণত ও প্রগাঢ় তদ্বিষয়ে সন্দেহ জন্মে না। প্রেমচন্দ্রের সমকালীন কতকগুলি পণ্ডিতের যে সকল রচনা আমরা দেখিতে পাইয়াছি তাহার সঙ্গে তুলনা করিলেও প্রেমচন্দ্রের রচনাচাতুর্য্য সমধিক মনোহর বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যালয়ে সমস্যাপূরণ করিবার নিয়ম অনুসারে পণ্ডিত ও ছাত্রগণ যে কবিতাবলী রচনা করিয়াছিলেন তৎসমুদয় পাঠ করিলে প্রেমচন্দ্রের কবিতাগুলি প্রকৃত কবিত্বশক্তির পরিচায়ক বলিয়া বোধ হয়। অন্যে যে স্থলে সংস্কৃত ভাষায় কেবল পাদপূরণপ্রয়াসে পর্য্যাকুল হইয়াছেন, সে স্থলে প্রেমচন্দ্রের লেখনী হইতে সমধিক মধুর ও ভাবপূর্ণ বিষয়গুলি অনায়াসে বিনির্গত হইয়াছে বলিয়া স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। স্থানে স্থানে তাঁহার কবিতায় অতিশয়োক্তি দোষ লক্ষিত হয়, কিন্তু তাঁহার রচনায় যেমন ললিত পদবন্ধনকৌশল তেমনি প্রসাদগুণযুক্ত প্রগাঢ় মধুর বর্ণনায় তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা লক্ষিত হয়। গদ্য অপেক্ষা তাঁহার পদ্যগুলি সমধিক মধুর ও মনোহর বোধ হয়।

প্রেমচন্দ্রের সমকালীন পণ্ডিতেরা তাঁহাকে সুকবি বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন। তাঁহার লোকান্তর গমনে কবিত্বদেবীর অবসাদ সময় উপস্থিত হইল বলিয়া তাঁহার প্রিয়তম ছাত্র শ্রীমান্ তারাকুমার কবিরত্ন আক্ষেপ-পূর্ব্বক এই শ্লোকটী লিখিয়াছিলেন—

"যা প্রেমচন্দ্রে জগদেক চন্দ্রেঽ-
প্যস্তং গতে ভারত ভাগ্যদোষাৎ।
সমাগতা হা! প্রিয়-পুত্র-শোকাৎ
কবিত্বদেবীহ মুমূর্ষুভাবম্ ॥"

এদিগে ছাত্রমণ্ডলীর মধ্যে লব্ধপ্রতিষ্ঠ ছাত্রগণ প্রেমচন্দ্রকে কবিত্বশক্তিসম্পন্ন বলিয়া মান্য করিতেন এবং তাঁহার গুণানুকরণে যত্নবান হইতেন। কাশীতে

লোকান্তরিত হইলে তাঁহার এক কবি ছাত্র বঙ্গে কবিত্ব ও অলঙ্কারের অবসাদ সম্বন্ধে বিলাপসূচক যে ছয়টী কবিতা রচনা করিয়াছিলেন তাহা পরিশিষ্টে দেওয়া হইল। আমরাও বাল্যাবধি উহঁার কবিত্বশক্তির পরিচয় পদে পদে পাইয়াছিলাম, কাজেই আমরাও উহঁাকে "কবি" বলিয়া উল্লেখ করিলাম। কিছুদিন পরে হয় ত এই কথাটা অসঙ্গত বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। প্রেমচন্দ্রের রচিত কতকগুলি শ্লোক ব্যতীত তাঁহার প্রণীত কোন কাব্য গ্রন্থ আমরা পাঠকগণের সমক্ষে প্রদর্শন করিতে পারিলাম না; অথচ তাঁহাকে "কবি" বলিয়া বর্ণনা করিলাম এই কথাটা খাপছাড়া লাগিতে পারে। প্রেমচন্দ্রের সমকালীন পণ্ডিতবর্গ ক্রমে স্বর্গারোহণ করিলেন। তাঁহার ছাত্রদল সময়ক্রমে বিরল হইতে চলিল। ইতঃপর পণ্ডিত সম্প্রদায় ইহঁাকে কবি বলিয়া গ্রহণ করিবেন বোধ হয় না, কিন্তু টীকাকারক বলিয়া ইনি যে সাহিত্য ব্যবসায়িগণের নিকটে চিরদিন পরিচিত থাকিবেন তদ্‌বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইহঁার প্রণীত পূর্ব্বনৈষধ, রাঘব পাণ্ডবীয় ও কাব্যাদর্শের টীকার সাহায্য যে বহুমূল্য ইহাতে সংশয় জন্মে না। যে সময়ে ইনি পূর্ব্বনৈষধ ও রাঘবপাণ্ডবীয় গ্রন্থের টীকা রচনা করেন তখন বঙ্গদেশে কোন কাব্যগ্রন্থের মল্লিনাথকৃত টীকা প্রকাশিত হয় নাই এবং মল্লিনাথ মহোদয় যে উক্ত দুই-খানি কাব্যের টীকা রচনা করিয়াছিলেন তাহা অদ্যাপি জানা যায় নাই। সুতরাং প্রেমচন্দ্রের অবলম্বিত টীকা রচনার প্রণালী যে অভিনব ও উৎকৃষ্ট তদ্‌বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই সকল কাব্য বিশেষতঃ কাব্যাদর্শের টীকায় যে প্রকার পাণ্ডিত্য প্রকটিত হইয়াছে, তদ্দৃষ্টে প্রেমচন্দ্র প্রাচীন সম্প্রদায়ের লোক বলিয়া অনুমিত হইয়া থাকেন। রচণাপ্রণালী দৃষ্টে এই অনুমান অমূলক বোধ হয় না। তাই একবার ভাবি প্রেমচন্দ্র সংস্কৃত রচনায় এইরূপ অসামান্য শক্তি লাভ করিয়া ও রাঘব পাণ্ডবীয় কাব্যের প্রত্যেক শ্লোকের রঘু ও পাণ্ডুবংশের রাজগণের চরিতোপযোগী কূটার্থ নিষ্কাষণে যে সময় অতিবাহিত করিয়াছেন তাহা কাব্যান্তর রচনায় ব্যয়িত হইলে সমধিক ফললাভ হইতে পারিত। আবার ভাবি এইরূপ কাব্যরচনায় তিনি যথোচিত উৎসাহ পান নাই। এই বর্ত্তমান সময়ের এইপ্রকার সাহিত্য সেবকদিগের অবস্থা শোচনীয় ছিল বলিতে হইবে। তাঁহার নিজের যত্নের ত্রুটি দৃষ্ট হয়

না। তিনি যে প্রণালীতে পুরুষোত্তম রাজাবলী নামক কাব্যের রচনা আরম্ভ করিয়াছিলেন সম্যক্‌রূপ উৎসাহ পাইলে তাহা অসম্পূর্ণ—থাকিত না। উইলসন্ সাহেব প্রভৃতি উন্নতপদস্থ মহোদয়দিগের নিকটে যখন যে বিষয়ে তিনি উৎসাহ পাইয়াছেন তখনই বদ্ধপরিকর হইয়া এক একটী উৎকৃষ্ট কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন।

সংস্কৃত বিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক পণ্ডিতাগ্রগণ্য নির্ম্মলমনীষা-সম্পন্ন ৺জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন মহাশয় মুক্তকণ্ঠে বলিতেন, আজকাল্ যিনি যাহা রচনা করুন, মুদ্রাযন্ত্রে যাইবার পূর্ব্বে তর্কবাগীশের সঙ্গে সাক্ষাৎ না করিয়া কাহারও পদক্ষেপ করিবার সাধ্য নাই।

প্রেমচন্দ্র কাহারও প্রার্থনানুসারে, কখনও স্বেচ্ছানুসারে ভাবের উদয় হইলেই কবিতা রচনা করিতেন। বসিয়া তামাক খাইতে খাইতে অথবা পদচারণা করিতে করিতে যে সকল কবিতা রচনা করিতেন, তাহা কখনও স্বয়ং কোনও সামান্য কাগজে টুকিয়া রাখিতেন কখনও বা সংস্কৃতজ্ঞ অপরকে লিখিয়া রাখিতে বলিতেন। দুর্ভাগ্যক্রমে ইহার অধিকাংশই বিনষ্ট হইয়াছে। নানাস্থানে খুঁজিয়া ও কাব্যরসপ্রিয় তাঁহার কতিপয় ছাত্রকে জিজ্ঞাসিয়া যতদূর সংগ্রহ করিতে পারিলাম তাঁহার রচিত কতকগুলি কবিতা নিম্নে সন্নিবেশিত করিলাম। রচনাকালীন আনুষঙ্গিক বৃত্তান্তও স্থানে স্থানে লিখিত হইল। তাঁহার প্রিয়তম ছাত্র শ্রীযুত তারাকুমার কবিরত্ন "কবিবচন-সুধা" নামক যে একখানি গ্রন্থ সঙ্কলিত ও প্রচারিত করিয়াছেন তাহাতে তর্কবাগীশের রচিত অনেকগুলি কবিতা বাঙ্গালা পদ্যানুবাদসহ উদ্ধৃত করিয়াছেন। বাঙ্গালা পদ্যগুলি এরূপ প্রাঞ্জল ও চিত্তহারী হইয়াছে যে পদ্যানুবাদগুলিও সন্নিবেশিত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্রের আলোড়ন না করিলে বঙ্গভাষায় অঙ্গভূষা সম্পাদনের সম্ভাবনা নাই বলিয়া তর্কবাগীশ সর্ব্বদাই বলিতেন। তাঁহার এই বাক্যটী কবিরত্নের ঐ পদ্যগুলি এবং অন্যান্য গ্রন্থের বাঙ্গালা পদ্যগুলি দ্বারা সমর্থিত হইয়াছে।

কবিতাসংগ্রহবিষয়ে রসের বিচার করা হয় নাই, প্রায় সকল রসের কবিতাই সমভাবে সংগৃহীত ও সন্নিবেশিত হইল। এ সংগ্রহের প্রকৃত উদ্দেশ্য পাঠক মহোদয় বুঝিয়া লইবেন।



প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশের রচিত কবিতা।

রঘুবংশের টীকার শেষে।

कोम्पानीरखिलक्षमातलभृत: सम्मानितो विश्रुत:
श्रीयुक्तो जगतीतले विजयतासूइल्सन: साहव: ।
यस्यानन्तगुणावलीविलसितं प्रेक्षावतां प्रीतिदं
मन्ये मन्थरतां व्रजन्ति भणितुं वाचोऽपि वाचस्पते: ॥ १ ॥
तस्याज्ञामधिगम्य तादृशगुणप्रैषस्य च श्रीमत:
काव्येऽस्मिन् रघुवंशके कविगुरुश्रीकालिदासोदिते ।
टीकेयं द्रुतबोधिका शिशुगणस्यात्यन्तहर्षार्पिका
विद्वद्भि: क्रमशस्त्रिभिर्विरचिता भूयात् सतां प्रीतये ॥ २ ॥
कृत्वा किञ्चिद्रामगोविन्दसूरौ
नाथुरामे प्राज्ञवर्य्येऽप्यनल्पं ।
याते स्वर्गं, प्रेमचन्द्रो मनीषी
टीकामेतां पूर्णतामानिनाय ॥ ३ ॥

পূর্ব্বনৈষধের টীকার প্রথমে।

या काङ्क्षितामलपदा नियतं जनानां
शक्तार्थसञ्चयसमन्वयने च योग्या ।
व्यक्तीकरोति निखिलं हृदि भावजातं
वाग्देवतामभिमतामहमाश्रये ताम् ॥ ४ ॥

अन्यासु भावबहुलासु सदर्थिकासु
टीकासु चेदिह भवेद् विफलप्रयत्नः।
सद्भिस्तथापि मृदुबोधविबोधनार्थं
जातोद्यमोऽहमिह सम्प्रति नावबुध्ये ॥ ५ ॥

অবসানে।

राढ़े गाढ़प्रतिष्ठः प्रथितपृथुयशाः शाकराढ़ानिवासी
विप्रः श्रीरामनारायणइति विदितः सत्यवाक् संयतात्मा।
तत्सूनुः सुकृतेनाखिलजनदयितः श्रीयुतः प्रेमचन्द्र-
श्चक्रे चक्रिप्रसादान्नलचरितमहाकाव्यपूर्व्वार्द्धटीकाम् ॥ ६ ॥

রাঘবপাণ্ডবীয় কাব্যের টীকার প্রথমে।

दधन्मरकतस्थलीद्युतिविडम्बिकान्तिच्छटां
पुरःप्रबलमारुतो निहितजिष्णुचापोज्ज्वलः।
हरन् सपदि दुःसहां रविजतापभीतिं नृणां
मदीयहृदयाम्बरे स्फुरतु कोऽपि धाराधरः ॥ ७ ॥

आसीदसोमगरिमास्पदकश्यपर्षि-
वंशप्रशंसितजनुर्मनुतोऽप्यनूनः।
सर्व्वेश्वरोऽनवरतक्रतुकर्म्मनिष्ठा-
निर्वर्त्तितावसथिसंज्ञतया प्रतीतः ॥ ८ ॥

तदन्वयसुधाम्बुधेरजनि रामनारायणः
शशीव विमलाम्बरो द्विजवरः श्रिया भासुरः।

यदीयगुणचन्द्रिकोल्लसितराढ़भीराश्रये
सतां हृदयकैरवं कलितगौरवं मोदते ॥ ९ ॥

श्रीप्रेमचन्द्रेण तदात्मजेन काव्योत्तमे राघवपाण्डवीये।
बालावबोधाय सतां मुदे च वितन्यते सद्विवृतिः स्फुटार्था ॥१०॥

अर्थान् ग्रहीतुमिह काव्यपुरे प्रविश्य
युष्माकमस्ति यदि चेतसि सत्यमिच्छा।
काठिन्यदुर्द्धरकपाटविपाटिकां मे
टीकां तदा प्रथममेव करे कुरुध्वम् ॥ ११ ॥

अगर्व्वाः पूर्व्वेषामतिगहनवाणीचतुरता-
प्रकाशक्लेशज्ञा जगति विजयन्ते कतिपये।
खलास्तु स्वच्छन्दं परभणितिदोषानुसरणै-
रवज्ञायां विज्ञा विदधति न केषामपयशः ॥ १२ ॥

রাঘবপাণ্ডবীয় টীকার শেষে।

यस्याभवज्जननभूः किल शाकराढ़ा
राढ़ासु गाढ़गरिमा गुणिनां निवासात्।
ग्रामो निकामसुखवर्द्धनवर्द्धमान-
राष्ट्रान्तरालमिलितः सरितः प्रतीच्याम् ॥ १३ ॥

अधीयानस्तर्कविद्यां विद्यामन्दिरमध्यगः।
अलङ्काराध्यापनायां राज्ञा यो विनियोजितः ॥ १४ ॥

देशमेतं परित्यज्य प्रस्थाने विहितोद्यमम्।
पुनर्यदनुरोधेन कवित्वं स्मातुमिच्छति ॥ १५ ॥

सोऽयं कौणपकण्ठकण्टकवनीसंहारदावद्युतेः
श्रीरामस्य पदाम्बुजप्रणयतः सम्पन्नवाग्वैभवः ।
शाके सायकखसिशैलकुमिते वर्षेऽतिहर्षप्रदां
चक्रे राघवपाण्डवीयविवृतिं श्रीप्रेमचन्द्रो द्विजः ॥ १६ ॥

কাব্যদর্শের টীকার প্রথমে।

सर्व्वानर्थान् सूते काममपि सद्यैव निर्वृतिं तनुते ।
वाग्देवीं तां सन्तः सादरवन्तः सदा भजत ॥ १७ ॥
सगुणा सालङ्कारा सम्मदयन्ती पदे पदे ध्वनिभिः ।
सत्कविभणितिः सरसा कस्य न वा मानसं हरति ॥ १८ ॥
द्विजश्रीप्रेमचन्द्रस्य व्याख्यानप्रोञ्छनाञ्चिते
काव्यादर्शे सुदर्शेऽस्मिन् सन्तः सन्तु समुन्मुखाः ॥ १९ ॥

টীকার অবসানে।

उद्दण्डै लण्डपृथ्वीपतिविजितमिदं भारतं वर्षमस्मिन्
कल्काता राजधानी धनिगुणिवणिजां धामभूर्भूविभूषा ।
यस्यामस्यातिकाख्या समितिरमितधीभिर्भव्यैः कारजीर्य्यत्-
प्राच्याचार्य्यप्रमेयोद्धृतिपरमतिभिः सभ्यैः सज्जिताऽभूत् ॥ २० ॥
आदेशएव तस्याः कृशमतिरवशोऽपि [illegible]
व्याख्यानेऽस्मिन् प्रवृत्तिं गमयति हि [illegible] परि[illegible] [illegible]ताम् ॥२१॥
क्व वयं मन्दमतयः क्व च प्रज्ञा वचोऽम्बुधिः ।
मन्ये त्रिलोकनाथस्य [illegible] [illegible] ॥ २२ ॥

याचे नतः कविवरानवरापि यायाद्-
युष्माकमीक्षणपथं विवृतिर्ममेयम्।
नाङ्गीकृतं क्षपयदङ्गमनङ्गजेत्रा
सम्प्रार्थितेन गरलं सरलात्मना किम् ॥ २३ ॥

उत्कर्षौ काश्यपर्षेर्बलबलिजयिनोर्जन्मनोज्जृम्भितश्री-
र्वंशो विश्वावतंसोऽवमथिकुलमितश्चामलं प्रादुरासीत्।
एतस्मान् मध्यराढ़ाविततगुणगणो ग्रामणीः सज्जनानां
सम्भूतो रामनारायणधरणिसुरः शाकराढ़ानिवासी ॥ २४ ॥

तस्यात्मजेन जनदुर्गमकाव्यमार्ग-
सातत्यसञ्चरणलब्धसमादरेण।
रोपद्विपाश्वग्रग्रभृद्विमिते शकाब्दे
श्रीप्रेमचन्द्रकविना विवृतिः कृतेयम् ॥ २५ ॥

काठिन्यमालिन्यनिवारणेन
सुदर्शमादर्शमसौ चकार।
पुरस्कृतेऽस्मिन् प्रतिविम्बमासान्
पश्यन्तु भावान् सुधियः सुखेन ॥ २६ ॥

মুকুন্দ-মুক্তাবলীর টীকার প্রথমে।

विषयासवमास्वाद्य मुधा माद्यसि किं मनः।
श्रीमुकुन्दपदाम्भोजरसेन मदमाप्नुहि ॥ २७ ॥
व्याख्यानरसचर्च्चाभिः सिक्तां मुक्तावलीमिमां।
श्रीमन्मुकुन्दसंप्रीत्यै विशदीकरवाण्यहम् ॥ २८ ॥

টীকার শেষে।

शाके शशाङ्कमातङ्गतुरङ्गममहीमिते ।
मुक्तावलीयं कृष्णस्य व्याख्यया विशदीकृता ॥ २८ ॥

চাটুপুষ্পাঞ্জলির টীকার প্রথমে।

मनो विषयकान्तारे भ्रमणं यदि ते प्रियं ।
कृष्णकल्पाङ्घ्रिपच्छायां विश्रम्य भ्रम्यतां मुहुः ॥ ३० ॥
चाटुपुष्पाञ्जलावस्मिन् ये सन्ति पद्कुड्मलाः ।
श्रीराधाप्रीतये तेषां विदधे संविकासनम् ॥ ३१ ॥

অন্তে।

महीद्विपमहीध्रेन्दुमितेऽब्दे शकभूपतेः ।
एषा सात्त्वतमुख्यानां प्रीतिकृद्विवृतिः कृता ॥ ३२ ॥

অষ্টমকুমারের প্রথমে।

चापल्यादिह वः सदास्मि विधुरा यास्यामि तातालयं
तातस्ते जननि ! को ? गिरिगणश्रेष्ठो हि तातो मम ।
मातस्त्वं किमहो ! गिरीशदुहितेत्याभाषमाणे गुहे
प्रीत्योत्तृष्टितमुग्धनम्रवदना गौरी चिरं पातु वः ॥ ३३ ॥
भावभावनपरा रसोत्तरा कोमला मृदुपदक्रमोज्ज्वला ।
कालिदासकविता गुणोन्नता कस्य वाद्य न हरत्यहो मनः ॥३४॥

কুমারসম্ভবমিদং কাব্যং তস্য কৃতিঃ কবেঃ।
দুষ্প্রাপমাসীৎ সম্পূর্ণং কুতশ্চিৎ কারণাৎ পুরা ॥ ২৫ ॥
অতোঽষ্টমাদিসর্গাণাং ব্যাখ্যা বিখ্যাতিমাগতা
ন কাচিদ্বীক্ষ্যতে পূর্ব্বৈর্যাবদ্ভির্বিনির্ম্মিতা ॥ ২৬ ॥
তদর্থেঽস্মিন্ মমারম্ভে সংরম্ভো নোচিতঃ সতাং।
জীর্ণোদ্ধারে সদোষেঽপি নোদ্ধর্ত্তার্হতি বাচ্যতাং ॥ ২৭ ॥

সপ্তশতীসারের টীকার প্রথমে।

নির্ম্মাণপালনবিনাশনবাললীলাং
যন্মোহিতোঽনুবিদধাতি পিতামহোঽপি।
তামেব দেবমনুজাদিসমস্তসেব্যাং
দুর্গাং নতোঽস্মি বিদধাতু শুভাং মতিং মে ॥ ২৮ ॥

অন্তে।

শাকে শিলীমুখরসাম্বরশশাঙ্কমানে
হেলৌ তুলালয়বিলাসিনি সপ্তমেঽগ্নৌ।
শ্রীপ্রেমচন্দ্রকৃতিনা কৃতিনাং নিতান্ত-
সন্তোষসন্ততিধিয়া বিবৃতিঃ কৃতেয়ং ॥ ২৯ ॥

প্রেমচন্দ্র পুরুষোত্তম রাজাবলী নামক যে এক নূতন কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন; তাহা হইতে বাছিয়া বাছিয়া নিম্নলিখিত কয়েকটী কবিতা উদ্ধৃত করা হইল। এই কাব্যের এক এক সর্গের শেষে "ইতি শ্রীপ্রেমচন্দ্র

ন্যায়রত্ন বিরচিতায়াং পুরুষোত্তম রাজবল্যাং” প্রথম ও দ্বিতীয় আদি পরিচ্ছেদের সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল দেখা যায়। ইহাতে স্পষ্টরূপে বুঝা যাইতেছে যে তিনি “তর্কবাগীশ” উপাধি পাইবার পূর্ব্বে যে সময়ে ন্যায়রত্ন উপাধিতে পরিচিত ছিলেন অথবা তাঁহার লোকান্তর গমনের ২৮।২৯ বৎসর পূর্ব্বে এই নূতন কাব্যের প্রণয়ন কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন। এই দীর্ঘকালের মধ্যে এই গ্রন্থখানি যে কেন সমাপন করেন নাই ইহার সম্যক্‌রূপ কৈফিয়ৎ পাঠকগণের নিকটে প্রদর্শন করিতে অসমর্থ। অলঙ্কারের অধ্যাপকের পদ পাইয়া প্রেমচন্দ্র আলস্যপরবশ হইয়াছিলেন একথা বলিতে পারি না। দেখিতেছি এই কয়েক বৎসর মধ্যে তিনি অন্যান্য অনেক উৎকৃষ্ট কার্য্যসম্পাদনে বিলক্ষণ যত্নবান্ ছিলেন। যতদূর বুঝিতেছি তাহাতে অনুৎসাহই ইহার কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিব। প্রেমচন্দ্র মধ্যে মধ্যে বলিতেন—চিরদিনের নিমিত্ত ভারতের স্বাধীনতার পর্য্যবসান হইয়াছে; সংস্কৃতশাস্ত্রে বর্ত্তমান রাজগণের আস্থার হ্রাস হইয়াছে; কেবল প্রাচীন গ্রন্থনিচয়ের সমুদ্ধরণ বিষয়েই আসিয়াটিক্ সোসাইটীর অধ্যক্ষবর্গের যত্ন দেখা যাইতেছে, এখন আর ইদানীন্তনদিগের সংস্কৃতরচনায় সমাদর দৃষ্ট হয় না ইত্যাদি। যে কারণই হউক্ এক্ষণে এই অসম্পূর্ণ গ্রন্থের মুদ্রণে তাদৃশ ফললাভ দৃষ্ট হয় না। গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ ও ভূমিকায় এই কয়েকটী সরস শ্লোক পাওয়া গিয়াছে—

निरुध्येवाध्वानं यमसदनयानं तनुभृतां
निषेद्धुं कारुण्यादधिवसति यो दक्षिणदिशं।
स मे कामग्राहाकुल-चपल-भोग-भ्रमि-युते
जगन्नाथो नाथो भवतु भव-पाथोनिधिजले ॥ ४० ॥

दोःशालिनां नयवतां सुयशोधनानां
राज्ञां न चेत् कविगणाः सुहृदो भवेयुः।
केवा तदीयचरितानि महाद्भुतानि
लोकोत्तराण्यपि जना भुवि कीर्त्तयेयुः ॥ ४१ ॥

तस्मात् कुलं विजयतां सुचिरं कवीनां
येषां वचांसि सततं सुखयन्ति लोकान्।
भूपावली च निहताखिलशात्रवाली
भूमण्डलीमवतु नित्यमुपद्रवेभ्यः ॥ ४२ ॥
दोर्द्दण्डाद्भुतभीमविक्रमहतप्रत्यर्थिनामुल्लसत्-
सत्कृत्याञ्चितकीर्त्तिदीपितदिशां राज्ञां चरित्रे सति।
कष्टं याति निरर्थकार्णवनदीग्रावाद्रिभूभामरुद्
वन्यावारिधरादिवर्णनवशात् कालः कवीनां मुधा ॥४३॥
येषान्तूत्कटभक्तिभावितभवव्यामोहभव्यौषध-
श्रीनाथाङ्घ्रिसरोरुहानवरतध्यानेन यातं वयः।
तेषां धन्यधराभुजां सुचरितव्याख्यानपुण्यावली
कल्पान्तां तनुतेऽत्र कीर्त्तिममुतः कल्पद्रुमाख्यायते ॥४४॥

ইহার পরে—

"कलेर्द्दादशवर्षान्तं राज्यं राजा युधिष्ठिरः।
पालयित्वा ससोदर्य्यः सहभार्य्यो दिवं ययौ" ॥ ४५ ॥

এই শ্লোকে কাব্য আরম্ভ করিয়া কবি, পরীক্ষিৎ, জনমেজয় প্রভৃতি রাজগণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ বর্ণনা করিয়াছেন। অনন্তর পাণ্ডুবংশীয় রাজা ইষ্টদেবের পুত্র সেবক দেবের উড়িষ্যা যাত্রার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। ইনিই সর্ব্বপ্রথমে জগন্নাথ দেবের মন্দিরের সংস্কারকার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন জানা যায়। এই সম্বন্ধে কবির বর্ণনা এইরূপ আছে—

दृष्ट्वा पुरी-परिगतां परमात्मनस्तां
मूर्त्तिं विमुक्तिजनिकां भवभीमदात्मः।
मेने धरापरिवृढो मनसा स्वकीयां
पुण्यावलीं बलवतीं सफलं कुलञ्च ॥ ४६ ॥

श्रीमन्दिरं भगवतश्च ततोऽतिभक्त्या
कीर्त्त्यैव साधुसुधया धवली चकार।
यत्नेन रत्नमय-भूषण-वीथिकाभिः
श्रीमूर्त्तिमप्यलमलङ्कृतवान् कृतार्थः॥ ४৭॥

অনন্তর কবি উজ্জয়িনী রাজ বিক্রমাদিত্যের উৎকলরাজ্য বিজয়ের বর্ণনা উপলক্ষে যাহা কিছু লিখিয়াছেন তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটী শ্লোক অতি সুন্দর বোধ করিলাম।

श्रीत्कण्ठादिवसाम्राज्यलक्ष्मी स्त्यक्त्वान्यभूपतीन्।
पद्मानुरागा गुणिनं भेजे यं पुरुषोत्तमं॥ ४৮॥
यवनान् शकसंज्ञातान् विनाश्य युधि यो बली।
साहाय्यमकरोत् पूर्व्वं कल्किनेऽवतरिष्यतः॥ ४৯॥
यस्योद्दामगुणग्रामो लोकातीता क्रियास्तथा।
अद्यापि वृद्धसंलापे यान्ति दृष्टान्तभूतताम्॥ ৫০॥
पर्य्याप्तकविकर्म्मत्वादेकान्तध्यानतत्परः।
मन्ये यच्चरितं व्यासो नेतिहासेष्ववर्णयन्॥ ৫১॥
यस्मिन् शासति निर्व्वैरा निर्भया निरुपद्रवाः।
अन्वभूवन् प्रजाः सर्व्वा रामराज्योत्थितं सुखम्॥ ৫২॥
अत्यर्थमर्थान् ददतो यशो यस्यार्थिनां गणान्।
आख्यातु मिव भूचक्रे भ्रमतिस्म निरन्तरम्॥ ৫৩॥
काव्यानुहिम्न-चित्तस्य यस्य काव्यानुशीलनैः।
कालो यातो महाकालसेवया च समृद्धया॥ ৫৪॥
विदग्ध-जन-मण्डल्या-मण्डितं पण्डितैर्वृतं।
धर्म्माधिकरणं यस्य सुधर्म्माधर्म्ममावहत्॥ ৫৫॥

सोऽखिलान् पृथिवी-पालान वशीकृत्य निजौजसा।
एकातपत्रं बुभुजे राज्यमार्य्यगणाग्रणी: ॥ ५६ ॥

उत्कलं सुतभूपाल मधिकृत्य सुकृत्यकृत्।
पितेव पालयामास स्वप्रजा इव स्वप्रजा: ॥ ५७ ॥

दुष्टेष्वत्युग्र दण्डत्वान् मानदानाद्गुणिष्वपि।
औड़्रा दूरस्थमपि तं मेनिरे सविध-स्थितम् ॥ ५८ ॥

माहात्म्य मात्मजनतो जनताधिनाथ:
श्रुत्वोच्चकै र्भगवत: पुरुषोत्तमस्य।
अत्युच्छलल्लवणवारिधिवारिधौत-
प्रान्तां मुरान्तक-पुरीं मुदितो जगाम ॥ ५९ ॥

तस्यां विलोक्य भवनिग्रहहानिहेतुन्
श्रीविग्रहान् विविधभूषणभूषणीयान्।
उद्गच्छदच्छनयनाम्बुरमन्दभक्त्या
रोमाञ्चसञ्चिततनु र्नृपतिर्बभूव ॥ ६० ॥

देवस्य चन्द्रशिरस: सतताधिवासात्
सम्बाधमप्यतितरां हृदयं मुरारे:।
सद्य:प्रविश्य नवनीरद-नीलवेश:
काशास्वभूव हृदभाववशो रमेश: ॥ ६१ ॥

अथ सुविमलरत्नैर्यत्नतो नि:सपत्नो
भगवदखिलमूर्त्ती र्भूषयामास भूप:।
अपचितिपरिपाटी मर्थकोटिप्रदाने
र्व्यधित च विधिपूर्व्वं सद्विधीनां विधिज्ञ: ॥ ६२ ॥

इत्थं सोऽत्यर्थमर्थ-प्रकरवितरणान् मोदयन्नर्थि-सार्थान्
स्वार्थीकुर्व्वन् स्वनामाक्षरमरितिमिरोत्सारिसारप्रकाशैः ।
मान्यान् मानेन युञ्जन् कविकुल मखिलं रञ्जयन्नादराद्यै
र्भूञ्जानो राज्यमृद्धं नवतिपरिमितान् यापयामास वर्षान् ॥६३॥

ज्ञात्वा पादं प्रथम मखिल-क्ष्माभृतां मूर्द्धसूयन्
पङ्काकीर्णानमल महसा लोकमार्गान् विशोध्य ।
उच्चैस्तुङ्गं प्रकृतिसुखदं मण्डलं सन्दधानः
पश्चादस्तं स खलु गतवान् विक्रमादित्यदेवः ॥ ६४ ॥

ইতঃপর তর্কবাগীশ শকরাজ্ শালিবাহন ও তৎপুত্র দেবরাজ প্রভৃতির চরিত বর্ণনোপলক্ষে যে কতকগুলি শ্লোক রচনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে শালিবাহন সম্বন্ধে কয়েকটী রসাল শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া এই খণ্ডিত কাব্যের সমালোচনা শেষ করিব।

अयमेव जनै र्निगद्यते नयशाली किल शालिवाहनः ।
यमनन्यगुणं गुणप्रिया नृपलक्ष्मीः स्वयमेत्य सङ्गता ॥ ६५ ॥
जननावधि साधुजन्मनश्चरितं यस्य यशस्विनः श्रुतं ।
विदधाति न कस्य मानसं कुतकालीतरलं धरातले ॥६६॥
विदिता भुवि नर्म्मदातटे सुप्रतिष्ठान-पुरी प्रतिष्ठिता ।
किल तत्र पवित्रकीर्त्तिमानवसन्नाटसमाख्यभूपतिः ॥६७॥
निरपत्यतया सुदुःखितो हरमाराधयतो निरन्तरं ।
तनयाऽस्य महीभृतोऽभवद्भुवनानन्यसदृग्गुणोदया ॥६८॥
तनयाय कृतेश्वराच्चर्नं तनया-जन्म-विषण्णचेतसं ।
अवदत् सहसा स्वयप्रदा नृपमाकाशभवा सरस्वती ॥ ६९ ॥
नृपते ! न भवेह दुर्म्मना दुहितेयं तव सौम्यलक्षणा ।
तनयं नृपचक्रवर्त्तिनं जनयिष्यत्यचिराच्चिरायुषम् ॥ ७० ॥

कलयन्निति देवकीं गिरं मुदितोऽभूद्वसुधाधिपस्तदा।
तनयाञ्च मनोरथैः शतैः सुतबुद्ध्या किल ता मपालयत् ॥ ७१ ॥

अथ चन्द्रकलेव सा शुभा
परिवृद्धा यदभूद्दिने दिने।
भुवि चन्द्रकलेति संज्ञया
गमिता ख्याति मतः सुहृज्जनैः ॥ ७२ ॥

क्रमशः शिशुता मतीत्य सा
स्मरराज्ये वयसि प्रवेक्ष्यती।
रमणीगण-गर्व्व-खर्व्व-कृत्
प्रतिपेदेऽद्भुतरामनीयकम् ॥ ७३ ॥

स्मर मत्र विचिन्वती सती
रतिरेषा भुवि किं समागता।
इति संशय-शायिताशयं
विदधे सा नहि कं विलोकिनम् ॥ ७४ ॥

अथ ता मभिवीक्ष्य भूपतिः पतिपाणिप्रतिपादनोचितां।
अनुरूपवरं गवेषयन्नतिचिन्तान्तरितान्तरोऽभवत् ॥ ७५ ॥

इयमात्मगुणानुकारिणं वरमाप्तुं तनया ममार्हति।
नृपकण्ठगतैव शोभते मणियष्टिर्भुवमाकरोद्भवा ॥ ७६ ॥

दुहितेयमनन्यसन्तते र्ममजीवाधिकतामुपगता।
तदिमां नयनप्रमोदिनीमतिदूरे नहि दातुमुत्सहे ॥ ७७ ॥

अधमोऽपि वरं गुणान्वितो नतु मूर्खो धनवान् वरो मतः।
गुणिने हि समर्पिता सुता न कदाचित् कदनाय कल्पते ॥७८॥

দেখা যাইতেছে প্রেমচন্দ্র আপন জীবন সময়ের মধ্যভাগে এই নূতন কাব্যের প্রণয়ন কার্য্যে হস্তার্পণ করিয়াছিলেন। তখন তাঁহার বয়ঃ পরিণামের পরিপক্কতা লাভ হয় নাই। তথাপি উপরি সমুদ্ধৃত প্রসাদগুণ যুক্ত কবিতাগুলি পাঠ করিলে সুরুচিসম্পন্ন সহৃদয়দিগের অন্তরে যে আনন্দ জন্মিবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ হয় না।

সময়ে সময়ে ইচ্ছানুসারে তর্কবাগীশ নিম্নলিখিত কবিতাগুলি রচনা করিয়াছিলেন।

শ্রীরাম! তে নামপদং পদং দত্তে বিধেরপি।
ন জানে জানকীজানে পদং তে কিং পদপ্রদম্॥ ৩৯॥

কলুটোলা নিবাসী প্রসিদ্ধ সেনবংশজ রামকমল সেন মহোদয় কিছুকাল সংস্কৃত বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি জরাগ্রস্ত হইলে মেজর মার্সেল সাহেব মহোদয় অধ্যক্ষতার পদে প্রতিষ্ঠিত হয়েন। তৎপরে কলিকাতার ছোট আদালতের ভূতপূর্ব্ব জজ রসময় দত্ত মহোদয় অধ্যক্ষ হয়েন। এই সময়ে প্রেমচন্দ্র এই কবিতাটী রচনা করেন।

চ্যুতদলে কমলে জড়তাকুলে ব্রজতি মারমলে চ মধুব্রতে।
বিধিবশাদধুনা মধুনাহৃতঃ রসময়ঃ সময়ঃ সমুপাযযৌ॥ ৮০॥

কবিতাটী শ্লিষ্ট। মধুসূদন তর্কালঙ্কার মারশল সাহেবের প্রিয় পণ্ডিত ছিলেন। তিনিই আবার দত্ত মহোদয়কে অধ্যক্ষতার পদ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন।

(মারমলে—কন্দর্পপর্য্যায়ান্নায়াং অথবা রলয়োরৈক্যমিতি ন্যায়েন মার-মরে—মধুব্রতে। মধুঃ—মধুসূদনস্তৈব)।

কলিকাতার এক ধনীর বাটীতে প্রেমচন্দ্র নিমন্ত্রিত হইয়া গিয়াছিলেন। উহাঁর উপস্থিতির পূর্ব্বে বহুতর পণ্ডিত আসিয়া বৈঠকখানায় মিলিত হইয়াছিলেন। ধনীমহোদয় কয়েক জন পণ্ডিত বেষ্টিত হইয়া বিদায়ের ফর্দ্দ প্রস্তুত বিষয়ে ব্যস্ত ছিলেন। বসিবার স্থানও ছিল না। তখন প্রেমচন্দ্র দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া এই কবিতাটী রচনা করিয়া উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করেন।

সরসি সরোরুহমেকং মিলিতাস্ত সহস্রশো মধুপাঃ।
আস্তামিহ মধুপানং স্থিতিরেব সুদুর্লভা জাতা ॥ ৮১ ॥

আর এক সময়ে বিদেশবাসী কোনও বন্ধুকে উদ্দেশ করিয়া তর্কবাগীশ এই কবিতাটী রচনা করেন।

কিমিতি সখে! পরদেশে গময়সি দিবসান্ ধনাশয়া মুগ্ধঃ।
বিকিরতি মৌক্তিকমনিশং তব ভবনে কাঞ্চনী লতিকা ॥৮২॥

নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি সময়ে সময়ে যদৃচ্ছাক্রমে রচিত হইয়াছিল।

কঞ্চুকেন পিহিতাবপি প্রিয়ে! অন্তিমেব তব গচ্ছতঃ স্তনৌ।
উন্নতস্য মহতস্তিরস্ক্রিয়া নূনমস্য গুণবৃদ্ধয়ে ভবেৎ ॥ ৮৩ ॥
হার এষ হরিণীদৃশঃ স্তনে হারিণীং দিশতি কামপি শ্রিয়ং।
উন্নতৌ খলু সুবৃত্তশালিনৌ যুজ্যতে গুণিভিরেব সঙ্গতিঃ ॥ ৮৪ ॥

সুললিতমপি কাব্যং যাচকৈর্বাচ্যমানং
ধনবিতরণভীত্যা নাদ্রিয়ন্তে ধনাঢ্যাঃ।
কলমপি মশকানাং মঞ্জুগুঞ্জন্মুখানাং
কতমিহ সহতে কো দংশনাশঙ্কিচেতাঃ ॥ ৮৫ ॥

অনুবাদ।

"ধনীর নিকটে গিয়া যাচক-ব্রাহ্মণ;
সুমিষ্ট কাব্যও যদি করায় শ্রবণ;
পাছে কিছু দিতে হয় এ ভয় করিয়া
ধনী তারে অনাদরে দেয় তাড়াইয়া
মশা যে মধুরস্বরে গুন্ গুন্ গায়
রুধির দিবার ভয়ে কেবা সহে তায়?"

মিত্রেঽতিপ্রণয়ী বনান্তরগতিং নীতাস্তথা কণ্টকাঃ
দগ্ধে কার্যশতাঽন্তরে মধুরতাকোষৈর্গুণৈর্ব্যাপ্ততা।

दोषासङ्गविरागिताऽस्ति च तथाप्युर्व्वीपतीनां श्रियः
पद्मानामिव नो विभान्ति सुचिरं दुष्टात्मनां का कथा ॥८६॥

(मित्रे—मित्रे राजनि सूर्य्ये च ; वनमरण्यं जलञ्च ; कण्टकाः-क्षुद्रशत्रवः नालकण्टकाश्च ; दण्डे-दुष्टदमने मृणालकाण्डे च ; कर्कशता-काठिन्यं खरस्पर्शता च ; मधुरता स्नेहभावः मधुमत्ता च ; कोषो-धनसंहतिः कुड्मलश्च ; गुणाः-सन्धिविग्रहादिराजनीतिविशेषाः मृणालतन्तवश्च ; दोषा-रात्रिः ; दोषाः व्यसनानि च ।)

दोषासङ्गविरागितामधुरताश्रीधामताद्यैर्गुणैः
त्वं पद्म ! पुरावधीह जगतामासीः स्वयं विश्रुतम् ।
संप्रत्यस्य तमोरिपोरपि महातापस्य भद्रोदयात्
सौरभ्येण विकासजेन विदुषां स्वान्तेषु रंरम्यसे ॥ ८७ ॥

ধনীর দ্বারে দীন দরিদ্রের প্রতি যেরূপ ব্যবহার হইয়া থাকে সেই সম্পর্কে তর্কবাগীশ নিম্নলিখিত কবিতাটী রচনা করিয়াছিলেন।

निद्राति, स्नाति, भुङ्क्ते, चरति, कचभरं शोधयत्यन्तरास्ते
दिव्यत्यक्षैर्नचायं गदितुमवसरः, सायमायाहि, याहि ।
इत्युद्दण्डैः प्रभूणामसकृदधिकृतैर्वारितान् द्वारि दीनान्
अस्मान् पश्याब्धिकन्ये ! सरसिरुहरुचामन्तरङ्गैरपाङ्गैः ॥८८॥

সহৃদয়শিরোমণি সাহিত্যশাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক জয়গোপাল তর্কালঙ্কার গল্পচ্ছলে যাহা কিছু বলিতেন তাহাতেও যেন কাব্যরস নিঃসৃত হইত। গল্পসময়ে প্রেমচন্দ্র উপস্থিত থাকিলে মণি-কাঞ্চন যোগ হইত। গল্প শুনিতে শুনিতে প্রেমচন্দ্র অমনি কবিতা রচনা করিয়া তাঁহার অপার আনন্দবর্দ্ধন করিতেন। তর্কালঙ্কার মহাশয়ের প্রদত্ত নিম্নলিখিত সমস্যাগুলি পড়িলেই তাঁহাকে কবিকুলাগ্রণী রসিকচূড়ামণি বলিয়া বোধ হয়। সমস্যাপূরণ সময়ে প্রেমচন্দ্র একজন রচয়িতা আছেন জানিতে পারিলে তর্কালঙ্কারের সমধিক আনন্দ জন্মিত। অনেক সময়ে এরূপ ঘটিয়াছে যে,

সমস্যাপূরণের পর সকলের কবিতা দেখিতে দেখিতে প্রেমচন্দ্রের কবিতা পাঠ করিয়া তর্কালঙ্কার মহোদয় বিস্ময়ান্বিত চিত্তে বলিয়া উঠিতেন,—প্রেমচন্দ্র! তুমি কি আমার মনের প্রকৃত ভাব জানিয়াই এই কবিতাটী পূরণ করিয়াছ? অথবা ইহা কবির স্বাভাবিকী শক্তি? হায়! সংস্কৃত বিদ্যালয়ের সেই সুখের সময় এবং বর্ত্তমান পরিবর্ত্তন স্মরণ করিলে প্রাণ কেমন করিয়া উঠে! কি শোচনীয় পরিণাম! সেই সহৃদয়দিগের সঙ্গে সঙ্গেই যেন সেই রসবত্তা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। এইরূপ সমস্যা দিবার প্রথা প্রচলিত থাকিলে অনেক উপকার সাধন হইত সন্দেহ নাই।

১৭৬৭ শক (১৮৪৫ খৃঃ অঃ) হইতে সময়ে সময়ে তর্কালঙ্কার মহাশয়ের প্রদত্ত সমস্যার পূরণার্থে অনেকে যে সকল কবিতা রচনা করিতেন, তৎসমুদয় একটী পুস্তকে লিখিত হইত। এই নিমিত্ত "সমস্যাকল্পলতা" বলিয়া উহার নাম দেওয়া হইয়াছিল। তন্মধ্যে প্রেমচন্দ্রের রচিত কবিতাগুলি নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল। প্রেমচন্দ্র এই সমস্যাকল্পলতায় প্রথমে মঙ্গলাচরণরূপে গুরু জয়গোপালের মহিমা বর্ণনাচ্ছলে যে কয়েকটী কবিতা রচনা করিয়াছিলেন তাহাও লিখিত হইল।

गोवर्द्धनोद्धरणविश्वजनीनकर्म्मविस्मापितैर्विबुधवन्दिभिरुपगीतं।
मायागुणैरनभिभूतमनन्तशक्तिं गोपालमेकमनघं शरणं व्रजामः॥८९

(गोवर्द्धन तन्नामधेयः शैलस्तस्योद्धरणं गोकुलरक्षणाय हस्तेन धारणं; पक्षे गवां शब्दानां वर्द्धनं प्रत्ययोपसर्गादिसंयोगशक्ति-सम्प्रतिपत्तिपाटवेन बहुविवर्त्तकल्पनं; तेषाञ्चोद्धरणं यथावदर्थप्राकाम्यपरीक्षया दुर्विगाहशब्दशक्तिरहस्यनिष्काषणं एतद्रूपाणि जगन्मङ्गलनिदानभूतानि कर्म्माणि तैः। विबुधा देवाः पक्षे विपश्चितश्च। मायागुणै-रनभिभूतं—विज्ञानघनं नित्यबुद्धशुद्धस्वरूपं, पक्षे अविद्याविकारभ्रान्तिमोहविहीनं। अनन्तशक्तिं—अपरिच्छिन्नशक्तिसम्पन्नं। ज्ञानबलक्रियासु पराऽस्य शक्तिः श्रूयते। अनघं—अपापविद्धमव्यसनिनञ्च गोपालं श्रीकृष्णं, पक्षे श्रीजयगोपालाभिधेयं गुरुम्।)

कविता भविता कस्मादस्माकमिति भावितः।
गुरुः समस्यामेकैकामारेभे दातुमुत्सुकः॥ ९० ॥

इत्थं तत्पूरणादेषा जायते श्लोकविस्तृतिः।
सा समस्याकल्पलता नाम्ना ख्याताऽस्तु भूतले ॥ ८१ ॥

समस्या—"फलति वियोगविषद्रुमः समन्तात्।"

स्वरमधिकुरुते रुते पिकानां
हिमकिरणे मरणेऽपि जातभावा।
इति विषमफलान्यहो वितास्याः
फलति वियोगविषद्रुमः समन्तात् ॥ ८२ ॥

समस्या—"परवृद्धिं सहते क्व मत्सरी"

विहितां समितौ पृथात्मजैरजितस्यापचितिं विलोकयन्।
परितापमवाप चेदिराट् परवृद्धिं सहते क्व मत्सरी ॥ ८३ ॥

অপিচ,—

उदयोन्मुखतामुपागतं खरधामानमवेक्ष्य सत्वरः
अगमद्विधुरस्तभूधरं परवृद्धिं सहते क्व मत्सरी ॥ ८४ ॥

समस्या—"सखि किं वा करवाणि साम्प्रतं"

यदि मानवती भवाम्यहं किमुपेक्षा मयि तस्य युज्यते।
यदयं गतएव निर्दयः सखि! किं वा करवाणि साम्प्रतं ॥८५॥

समस्या—"हरि हरि हरिणाक्षि दूषणानि"

समपथमुदितं कृतानुवृत्ति-
श्चरणतले पतितश्च ते चिराय।
कलयसि कठिने! तथाप्यभीक्ष्णं
हरि हरि मे हरिणाक्षि! दूषणानि ॥ ८६ ॥

समस्या—"परभृत परमर्मच्छेदने नास्ति ह्रासः ।"

मदन ! कदनदानं युज्यते तेऽबलायां
हिमकर ! करणीये मद्वधे को विलम्बः ।
मधुप ! मधुप एवास्यद्य किन्तेऽस्ति वाच्यं
परभृत ! परमर्मच्छेदने नास्ति ह्रासः ॥ ९७ ॥

समस्या—"नहि सिंहः परिभूयते मृगैः ।"

अभितः क्षुभितान् धरापतीन् हरिरेकः प्रधने प्रधावतः ।
अवधूय जहार रुक्मिणीं नहि सिंहः परिभूयते मृगैः ॥ ९८ ॥

समस्या—"लेभे हली न परिधानविधौ समाप्तिं ।"

गीतैरनन्वितपदाविशदैर्वचोभि-
रुद्वासयन् निपतनोत्पतनैश्च गोपान् ।
कादम्बरीमदविघूर्णितगात्रयष्टि-
र्लेभे हली न परिधानविधौ समाप्तिं ॥ ९९ ॥

समस्या—"कथमुद्यमस्ते"

चित्ते वरं कुरु सुमेरुविलङ्घनेच्छां
पारं प्रयातुमपि वारिनिधेर्यतस्व ।
भ्रातर्दुराग्रय ! कियद्धनदुर्म्मदान्ध-
लोकानुरञ्जनविधौ कथमुद्यमस्ते ॥ १०० ॥

समस्या—"किल कर्णाक्रमणेऽपि चेष्टते ।"

नयनं गुरुधैर्य्यविप्लवं तव कृष्णार्जुनसच्छवि प्रिये ।
क्षतशान्तनवानुतापनं किल कर्णाक्रमणेऽपि चेष्टते ॥१०१॥

(गुरु महत् धैर्य्यं तस्य विप्लवः व्याघाती यस्मात्, पक्षे गुरोर्द्रोणाचार्य्यस्य धैर्य्यविप्लवम् ।
कृष्णं कृष्णवर्णम् अर्जुनसच्छवि अर्जुनपुष्पवत् धवलञ्च, तत्तारायाः कृष्णवर्णत्वात्, तदित-

रांशस्य शुभ्रत्वादिति भावः। पक्षे कृष्णः श्रीहरिः, अर्जुनः कुन्तीपुत्रः। शान्तनवो: भीष्मः, पक्षे कृतं शान्तानामपि नवम् अनुतापनं येन।)

समस्या—"कठिनत्वमम्बुजाक्ष्याः।"

वपुरतिमृदुलं गतिश्च मृद्वी
मृदु वचनं नितरां स्मितं ततोऽपि।
इति मृदुनिवहप्रसाधितायाः
मनसि परं कठिनत्वमम्बुजाक्ष्याः॥ १०२॥

समस्या—"उदयति निस्त्रप इन्दुरेष भूयः।"

अपि हततमसां कलङ्किनां कः
स्फुरति गुणागुणकृत्ययोर्विवेकः।
गुणवति! तव यत् पुरो मुखेन्दो-
रुदयति निस्त्रप इन्दुरेष भूयः॥ १०३॥

समस्या—"गतं नितम्बे।"

दग्धस्य पुष्पधनुषो धनुरद्य नूनं
त्वद्भ्रूतया परिणतं विशिखा दृशौ ते।
काञ्चीत्वमञ्चितमुखि! प्रतिपद्य किञ्च
तत्पाशसूत्रमपि तेऽधिगतं नितम्बे॥ १०४॥

समस्या—"सख्यं कथं सुजनदुर्जनयोर्घटेत।"

सख्यं कथं सधननिर्धनयोर्घटेत
सख्यं कथं सगुणनिर्गुणयोर्घटेत।
सख्यं कथं सुखितदुःखितयोर्घटेत
सख्यं कथं सुजनदुर्जनयोर्घटेत॥ १०५॥

অপিচ,—

दोषाकर ! स्फुटकलङ्क ! कुमुद्वतीश !
कि त्वं करेण नलीनीं मलिनीकरोषि।
स्वच्छाशयस्थितिरमी नहि तेऽनुरक्ता
सख्यं कथं सुजनदुर्जनयोर्घटेत ॥ १०६ ॥

समस्या—"कथय किं त्वयालोकितः।"

पिशङ्गवसनोज्ज्वलः सजलनीरदश्यामलः
स्फुरत्कुटिलकुन्तलाकुलितमुग्धभालस्थलः।
कलिन्दनगसम्भवे ! परिसरेण ते माद्दशां
गतो हृदयतस्करः कथय किं त्वयालोकितः ॥ १०७ ॥

समस्या—"चरमे पुंसि परमे ॥"

मनो ! भ्रातर्बाल्यावधि किल मया दुर्भरमपि
त्वमेवैकं तत्तद्विषयकरणैः संभृतमभूः।
इदानीं लोलत्वं त्यज, भव कृतज्ञं, स्मर नयं,
क्षणैकं श्रीरामे प्रविश चरमे पुंसि परमे ॥ १०८ ॥

समस्या—"कस्य न रतिः।"

प्रभिन्नप्रस्थाना निजनिजमतेषु व्यसनिनो
द्विषन्तस्त्वान्योऽन्यं विदधति वितण्डां बहुविधां।
हरेर्वा शम्भोर्वा भवतु च भवान्याः परिचरो
विभौ मे श्रीरामे विलसतितरां कस्य न रतिः ॥ १०९ ॥

समस्या—"यदि श्रीनिवासः।"

तपोदानयज्ञैरलं कृच्छ्रसाध्यैः कुतश्चण्डमूर्त्तेर्भयं दण्डपाणेः।
नवीनाम्बुवाहच्छविर्गोपवेशः स्फुरेच्चित्तपद्मे यदि श्रीनिवासः॥१००

समस्या—"साधवो विस्मरन्ति।"

हितकरमुपकारं सज्जनाज्जायमानं
कलयति खललोकः प्रातिकूल्येन तुल्यं।
गुणकणमपि लब्ध्वा मोदमानान्तरत्वा-
दपकृतिमपि दीर्घां साधवो विस्मरन्ति॥ १११॥

समस्या—"नहि सत्याद् विचलन्ति साधवः।"

वपुरप्यपहाय वज्रिणे मुनिरङ्गीकृतमस्थि दत्तवान्।
मरणेऽप्यविशङ्कितान्तरा नहि सत्याद् विचलन्ति साधवः॥११२॥

(मुनिर्दधीचिः, सच वृत्रासुरवधाय वज्रनिर्म्माणार्थं स्वान्यस्थीनि इन्द्राय ददाविति भारतीया कथा।)

समस्या—चन्द्रोदये विरहिनी रमणं मुमोच।"

नालिङ्गितं सुदृढमालपितं न चोच्चैः
विस्रम्भचुम्बनविधिर्नच सम्प्रवृत्तः।
प्राप्तं चिरादपि जनेक्षणजातशङ्का
चन्द्रोदये विरहिणी रमणं मुमोच॥ ११३॥

অপিচ,—

उद्दीपितोऽपि विरहः किल कामिनीनां
नैव व्यथां वितनुते हृदि कोपदग्धे।
यत् सा चिरादपि समागतमात्मकान्तं
चन्द्रोदये विरहिनी रमणं मुमोच॥ ११४॥

समस्या —"कामिन्यो नयनपतत्पयःप्रवाहा।"

सम्पाते धरणितले नवोदविन्दो-
रार्द्रत्वं भवति मनःसु मानिनीनां।
जीमूतो रसति नभस्यहो! विमुक्ताः
कामिन्यो नयनपतत्पयः प्रवाहाः ॥ ११५ ॥

समस्या—"का वा दशाद्य भविता वत चातकस्य।"

किञ्चित् क्षणं पवन! मन्दतरं प्रयाहि
किंवा न पश्यसि चिरादुदितं पयोदं।
चापल्यतस्तव दिगन्तरमभ्र याते
का वा दशाद्य भविता वत! चातकस्य ॥ ११६ ॥

অপিচ,—

नाकाङ्क्षति प्रतिदिनं नच भूरिधारां
धाराधर! प्रखरभानुकरार्द्दितोऽपि।
विन्दुव्ययेऽपि यदि कातरतां प्रयासि
का वा दशाद्य भविता वत! चातकस्य ॥ ११७ ॥

समस्या —"त्वदुदये गुरुवज्रपातः।"

क्षौणीं निषिञ्चसि विमुञ्चसि वारिधारां
धाराधर! प्रशमयस्यपि लोकतापं।
एतान् गुणानपि गिरत्ययमेकदोषो
यज्जायते त्वदुदये गुरुवज्रपातः ॥ ११८ ॥

समस्या—"परिहृतातङ्केन लङ्केश्वरः।"

यावद्रावण! जामदग्न्यविजयी लङ्कां न शङ्काकुलां
कुर्य्यात्तावदसौ विदेहदुहिता प्रत्यर्प्यतां मा चिरम्।

नैवञ्चेत् खरदूषणानुगमने पुण्याहमुन्नीयता-
मित्यूचे स हनूमता परिहृतातङ्केन लङ्केश्वरः ॥ ११९ ॥

समस्या—"सतां मनांसीव शरद्दिनानि।"

अपङ्कमार्गप्रसराण्यमन्दमनोरथानां विमलाशयानि।
प्रकाशशालीन्यभितः समानि सतां मनांसीव शरद्दिनानि ॥१२०॥

समस्या—"वर्षाकृतानि परिवर्त्तयतीति मन्ये।"

निष्पङ्किलत्वमवनेः प्रखरः खरांशुः।
स्वच्छं पयः सकमलाश्च भवन्ति वाप्यः।
अद्याधिकृत्य शरदात्मपदं कृतेर्ष्या
वर्षाकृतानि परिवर्त्तयतीति मन्ये ॥ १२१ ॥

समस्या—"प्राचीवधूः क्षिपति कन्दुकमिन्दुबिम्बं।"

सायन्तनोष्णकरपाटलितांशुजाल-
पिष्टातमुष्टिमसकृत् * कुतुकात् किरन्तीं।
रक्ताम्बरोज्ज्वलरुचीमभितः प्रतीचीं
प्राचीवधूः क्षिपति कन्दुकमिन्दुबिम्बम् ॥ १२२ ॥

समस्या—"पुनरुदेति दोषाकरः।"

यदुष्णकिरणोत्करैर्विरहपावकोद्दीपकैः
कथं कथमपि क्षपा ज्वलितया मया क्षेपिता।
अनीतिरियमीक्ष्यतां यदयमङ्कि वह्निप्रभः
सखि! ज्वलयितुं स मां पुनरुदेति दोषाकरः ॥१२३॥

* पिष्टातः—पटवासकः (आबिर इति भाषा)

समस्या—"रणति नूपुरं गोपुरे।"

नवीननवनीतकप्रभृतिगव्यमासाधय
क्षणं गृहविधानतो विरम नन्दसीमन्तिनि!
वनं वनमनुभ्रमन्ननुपदं गवां ते शिशुः
समैति यदतिस्फुटं रणति नूपुरं गोपुरे॥ १२४॥

समस्या—"धत्से तथापि शठ! तां शठतां न मुञ्चेः।"

यासौ रसोद्धतगतिः क्षितिभृन्नितम्ब-
सम्पर्कतस्त्रिपथगा कलुषीभवन्ती।
वेगात् प्रयात्यहरहः पतिमापगानां
धत्से तथापि शठ! तां शठतां न मुञ्चेः॥ १२५॥

অপিচ,—

सन्तर्जितोऽपि शपथेन निवारितोऽपि
कर्णोत्पलेन चरणेन च ताड़ितोऽपि।
इत्थं विलज्ज! बहुशः कलुषीकृतोऽपि
धत्से तथापि शठ! तां शठतां न मुञ्चेः॥ १२६॥

समस्या—"प्रसरति रतिबन्धोर्बन्धुरेकः समीरः।"

दरविदलितयूथीवीथिसञ्चारलब्धै-
र्दिशि दिशि मधुगन्धैरन्धयन् पान्थसार्थान्।
सजलजलदभूपस्याग्रयायीव दूतः
प्रसरति रतिबन्धोर्बन्धुरेकः समीरः॥ १२७॥

समस्या—"नोचितः कातरेऽस्मिन्।"

न पुनरिदमकार्य्यं कार्य्यमार्य्ये! कथञ्चिन्-
मुषितललितहासं रोषमेतं जहीहि।

वितर विशददृष्टिं पश्य पादानतं मां
सुमुखि ! विमुखभावो नोचितः कातरेऽस्मिन् ॥११८॥

समस्या—"यस्यासि तस्मै नमः।"

मानिन्यास्तव पादपङ्कजमिदं यन्मूर्द्धजैर्मृज्यते
यच्छ्रेयःपरिपाकजृम्भितमिदं वक्षोजयुग्मं तव।
उत्कण्ठां कलकण्ठि ! यस्य विरहाद्धत्ते त्वदीयं मनः
सोत्कम्पं परिरभ्य सम्मदकरी यस्यासि तस्मै नमः ॥१२९॥

समस्या—"न वेद्मि मथुरापुरीकुलटया कया किं कृतं।"

त्वदीयवदनाम्बुजस्मितसुधास्फुरन्माधुरीं
निरीक्ष्य कुलमुज्ज्वलं कुलवतीभिरत्रोज्झितम्।
तमद्य हरिमुन्नतश्रियमनु स्मरोन्मत्तया
न वेद्मि मथुरापुरीकुलटया कया किं कृतम् ॥ १३० ॥

समस्या—"नकारोऽलङ्कारो जयति मुखचन्द्रे मृगदृशः।"

न दत्ते प्रत्युक्तिं निवसनविमुक्तिं न सहते
धुनीते मूर्द्धानं स्फुटवचनशून्योत्तरयति।
परीरम्भारम्भे त्वसहनतयास्याः परमहो !
नकारोऽलङ्कारो जयति मुखचन्द्रे मृगदृशः ॥ १३१ ॥

समस्या—"तुषारान्ते पश्य ध्वनति परितः कोकिलयुवा।"

अपेयं पानीयं तुहिनवरणः शीतकिरणो
नलिन्यां मालिन्यं सपदि बलवद्येन विहितं।
गतोऽसौ शीतर्त्तुर्मधुरयमुपैतीति मुदित-
स्तुषारान्ते पश्य ध्वनति परितः कोकिलयुवा ॥ १३२ ॥

समस्या—"युक्तो न ते पिक ! मनागपि मूकभावः ।"

आयान्ति पान्थनिवहा मुदिता नितान्तं
सन्तापमुज्झति मही विरजाः समीरः ।
इत्थं गुणेऽपि नववारिधरागमेऽस्मिन्
युक्तो न ते पिक ! मनागपि मूकभावः ॥ १२३ ॥

समस्या—हैमन्तिको भास्करः ।"

निन्द्यः शैत्यगुणो जलस्य सहजः, स्तुत्यानलोत्तापिता,
वैमुख्यं नितरां तुषारपवने, दैर्घ्यं त्रियामासु च ।
इत्थं दुर्नयमाकलय्य जगतां मन्येऽतिभीतान्तरः
क्षिप्रं यात्यपरार्णवान्तरमसौ हैमन्तिको भास्करः ॥ १२४ ॥

समस्या—"शीतऋतुना विकृतिं प्रयान्ति ।"

यज्जीवनं तदपि जीवगणैरसेव्य-
मुष्णत्वमुष्णकिरणोऽद्य निजं जहाति ।
चन्द्रः सतन्द्र इव नोदयते प्रकामं
के वा न शीतऋतुना विकृतिं प्रयान्ति ॥ १२५ ॥

অপিচ,—

प्रालेयशीतलतरानिलकम्पिताङ्गी
वृक्षान् मुहुर्व्रततयोऽपि परिष्वजन्ते ।
किं चित्रमत्र यदमूर्मुहुर्वियुक्ताः
का वा न शीतऋतुना विकृतिं प्रयान्ति ॥ १२६ ॥

समस्या—"राज्ञः पराधीनता ।"

कार्ये साधु समर्पितेऽपि न मनः प्राप्नोत्यसन्दिग्धतां
सर्वं प्रत्युतलोकसम्मतपदे भ्रंशाद्भयं जायते ।

स्वच्छन्दाचरणं प्रियैर्विहरणं सर्व्वञ्च दूरं गतं
सत्यं कष्टमिदं प्रकाममिह यद्राज्ञः पराधीनता ॥ १३७ ॥

समस्या—"न स्तौति न ध्यायति।"

क्षौणीनाथ! भवद्गुणोत्करसुधावारांनिधेरुल्लसत्-
कीर्त्तीन्दुप्रभया तमप्रशमनान्नित्योज्ज्वले क्ष्मातले।
आश्चर्य्यं जनता चिरं परिचितं क्षणोऽपि पक्षेऽधुना
चन्द्रं सान्द्रकलङ्कलाञ्छिततनुं न स्तौति न ध्यायति ॥१३८॥

অপিচ,—

प्रेमालापपराङ्मुखी सुनिपुणा सक्तस्य वित्तग्रहे।
वेश्या कस्य वशं प्रयाति नितरां वश्यास्तु तस्या जनाः।
न प्राप्तं बहुमन्यते पुनरपि प्राप्तौ भवत्युन्मना-
नेयं स्निह्यति नाभिनन्दति जनं न स्तौति न ध्यायति ॥२३९॥

समस्या—"देहिनां देहपुष्टिः।"

संसारेऽस्मिन्नहह! नलिनीपत्रपाथोम्बुलोले
सत्यं तत्तद्विषयगहनेष्वाग्रहो निग्रहाय।
किं स्याद्दारात्मजपरिजनैर्विप्रयोगावसानैः
का वा तैस्तैरशनवसनैर्देहिनां देहपुष्टिः ॥ १४० ॥

समस्या—"भानुमानस्तमेति।"

उद्यद्भूय सद्यो रिपुमिव निविड़ध्वान्तमाक्रान्तविश्वं
मुष्णन्नुष्णधाम्ना श्रियमनयवशेनेव तेजस्विनाञ्च।
पादं विन्यस्य मूर्द्धस्वपि धरणिभृतां तापिताशेषलोकः
सम्प्रत्युद्दामधामा कृपण इव नियतेर्भानुमानस्तमेति ॥ १४१ ॥

অপিচ,—

मन्दं मन्दं वहति पवनो हन्त ! सायन्तनोऽयं
कोकाः शोकाकुलितहृदयाः किञ्च मुह्यन्ति जायाः।
मुद्रानिद्रां व्रजति नलिनी पूर्णकामेव रामा
सन्ध्यासङ्गादिव गतवसुर्भानुमानस्तमेति ॥ १४२ ॥

অপিচ,—

असति मयि समस्तं विश्वमाक्रान्तमेतत्
क्व नु पुनरिह गन्तासग्य हन्तास्मि तेऽहं।
इतिमतिरनुधावन् भीतिदिक्प्रान्तयातं
तिमिरमिव निरस्यन् भानुमानस्तमेति ॥ १४३ ॥

समस्या—"पूर्व्वपर्व्वततटीमाक्रम्य विक्रम्यते।"

अङ्गोत्सङ्गितरङ्कु*शङ्कितमनस्यस्ताचलप्रान्तरा-
रण्यानीं निविड़ां भयादिव रयादिन्दी समुत्सर्पति।
साटोपं हरिणा† समुत्थितवता वारांनिधेः कन्दरात्
संक्षोभादिव पूर्व्वपर्व्वततटीमाक्रम्य विक्रम्यते ॥ १४४ ॥

समस्या—"दिशि दिशि चरन्तीव जलदाः।"

प्रियायुक्तैर्भाव्यं स्वगृहमपि गन्तव्यमचिरा-
न्नवा शङ्का कामादवसथ यदिहाद्यापि मुदिताः
इति प्रादुर्भूत-ध्वनिभिरभिधाय त्वरयितुं
प्रवासस्थान् शश्वद्दिशि दिशि चरन्तीव जलदाः ॥१४५॥

---

* रङ्कु—मृगः।

† हरिः सूर्यः सिंहश्च।

समस्या—"कृशाङ्गीदृग्भङ्गीमभिनवकुरङ्गी न संहते ।"

शशाङ्कः साशङ्कं निशि चरति वक्त्रेन्दुविजितः
सरोजानां राजी भजति जलदुर्गाश्रयमियम् ।
घनारण्यस्यान्तर्वसति रतिमानोन्नततया
कृशाङ्गीदृग्भङ्गीमभिनवकुरङ्गी न सहते ॥ १४६ ॥

समस्या—"सम्यगाराधितासि ।"

दुर्गे ! दुर्गप्रसनकरं नाम ते कामपूरं
जप्यं जन्तूंश्चकितचकितान् लोकपालान् विधत्ते ।
तेभ्यः किंवा वितरसि पदं चिन्तयन्नैव जाने
येषां मातः ! श्रवणमननैः सम्यगाराधितासि ॥ १४७ ॥

समस्या—"नाराधि नारायणः ।"

वाढं सोढमहर्निशं विषयजं दुःखं न तप्तं तपो-
भ्रान्तं भ्रान्तिकृतश्रमेण धनिनां द्वारेषु तीर्थेषु नो ।
दातारः किल कातरेण च मया भिक्षाशया सेविता-
हा कष्टं ! क्षणमप्यभीष्टफलदो नाराधि नारायणः ॥ १४८ ॥

समस्या—"यामी कुतो यातना ।"

स्वच्छन्दं विषये सुखैकनिलये चेतः सदाधीयतां
दानध्यानतपोऽश्वमादिनियमैर्नो वा श्रमः क्लिश्यतां ।
मोक्षोऽपि स्वकरान्तरालमिलितो भ्रातर्विनिश्चीयतां
लोकेऽस्मिन् सति रामनाम्नि भवेद्यामी कुतो यातना* ॥१४९॥

---

* यामी यातना यमकृता यातना ।

समस्या—"मार्त्तण्डमालोकते।"

नायं यायमुपैति कान्त ! बलवच्चेतः समुत्कण्ठते
यास्यामि स्वयमेव तस्य निलयं भानौ गतेऽस्ताचलं !
इत्येवं विगणय्य काङ्क्षितवती क्षिप्रं दिनान्तं मुहु-
र्बाला जालविलावलम्बितमुखी मार्त्तण्डमालोकते ॥ १५० ॥

समस्या—"भाब्रह्मस्तम्बसम्भावितविमलयशोवृन्दमन्दीकृतेन्दुः।"

त्रस्तप्रत्यर्थिपृथ्वीपरिवृढविरहाक्रान्तसीमन्तिनीना-
मश्रान्तस्तोमवादश्रवणनियमिताशेषरोषाश्रयाशः !
भूपोऽयं भाति शश्वद्द्रविणवितरणामोदयन्नर्थिसार्था-
नाब्रह्मस्तम्बसम्भावितविमलयशोवृन्दमन्दीकृतेन्दुः ॥ १५१ ॥

समस्या—"नावद्यद्युम्नदानप्रविदलितमहादीनदारिद्र्यदैत्यः।"

*सुत्रामोद्दामधामोर्जितजयजयशश्चन्द्रसान्द्रावदात !
प्रद्योतद्योतमान ! त्रिभुवनजनतोद्गीतगाम्भीर्य्यवीर्य्य !
राजन् ! राजस्व राजावलिवलितशिरःशेखरन्यस्तपादो
नावद्यद्युम्नदानप्रविदलितमहादीनदारिद्र्यदैत्यः ॥ १५२ ॥

समस्या—"जनोऽयं निर्लज्जस्तदपि विषयेभ्यः स्पृहयति।"

वयो यातप्रायं स्वजनभरणे नास्ति पटुता
वपुर्जीर्णं शीर्णेन्द्रियमशनशक्त्येऽपि न रुचिः।
च्युता निद्रा, सद्धा परिजनवधूनामधरवाक्
जनोऽयं निर्लज्जस्तदपि विषयेभ्यः स्पृहयति ॥ १५३ ॥

---

* सुत्रामा—इन्द्रः, नावद्यद्युम्नदानं प्रशस्तधनदानं।

समस्या—"कृतान्तो दुर्दान्तः क्षणमपि विलम्बं न कुरुते।"

क्षणं लीलालापं परिहर हरे! त्वं कमलया
त्वरावानागत्य प्रकटय मदन्तःप्रणयिताम्।
न कार्य्या ते हेला स्मरणद! न वेला स्मृतिविधौ
कृतान्तो दुर्दान्तः क्षणमपि विलम्बं न कुरुते॥ १५४॥

समस्या—"विरतिर्वनिता चेत् सहचरी।"

वनं क्रीड़ारामो वसतिसदनं भूधरदरी
शिलापट्टः शय्या सुखदमुपधानं भुजलता।
प्रदीपः शीतांशुर्निशि विटपिवल्ली व्यजनिनी
शुभा वन्या वृत्तिर्विरतिर्वनिता चेत् सहचरी॥ १५५॥

समस्या—"कुतो विषयवासनापरिहृतात्मबोधो जनः।"

वृथेतिकलितेऽप्यलं चलति नित्यमर्थे मतिः
हरन्ति हरिणीदृशः सपदि शान्तमप्यन्तरम्।
विना विजयसारथेः करुणया स्वयंभूतया
कुतो विषयवासनापरिहृतात्मबोधो जनः॥ १५६॥

समस्या—"न जाने श्रीजाने किमिह भविता प्राणविगमे।"

वयो गीतप्रायं विषयविषमुग्धेन्द्रियतया
बली कालव्यालः कवलयितुमायाति सविधं।
विधेयं यत् कृत्यं स्फुरति मम नाद्यापि हृदि तत्
न जाने श्रीजाने! किमिह भविता प्राणविगमे॥ १५७॥

समस्या—"कावश्यमाविष्कुरु।"

न साम्यं धरणेर्नवा दिविषदां स्वाराज्यमप्यूर्जितं
नो वा ब्रह्मपदं पदं मधुरिपोर्नाकाङ्क्षते भ्यवः।

मातर्दीनदयाविधेयहृदये स्वर्गापवर्गप्रदे !
दासत्वं वितरोतु मेऽकमनघे ! कारुण्यमाविष्कुरु ॥ १५८ ॥

समस्या—"मातर्जह्नुसुते ! सुते मयि घृणामाधेहि माभूद्घृणा।"

त्वद्वीचिर्यदि याति लोचनपथं किं स्यात्तदा वीचिभी-
स्त्वन्नाम स्मरतां त्वदम्बु पिबतां यामी कुतो यातना।
गङ्गे ! त्वं भववारि ! वारि किरती लोकत्रयं तारये
मातर्जह्नुसुते ! सुते मयि घृणामाधेहि माभूद्घृणा ॥ १५९ ॥

समस्या—"निद्राति नारायणः।"

मन्ये चौर्णिरथः प्रयास्यसि पुनर्धाराजलैराकुला
स्वीकुर्य्यादनुवारमुद्धृतिविधौ कोऽस्याः श्रमांस्ताहृशान्।
इत्येवं कलयन्निवालसतया क्षीराम्बुराशौ रहः
शेषाङ्केऽङ्कगतां विधाय कमलां निद्राति नारायणः ॥ १६० ॥

समस्या—"हरिरुदयच्छलान्तःकाननादुज्जिहीते।"

चरमगिरिवनालीमृगसार्थानुयातः
प्रविशति मृगमङ्के न्यस्य चन्द्रो न यावत्।
तिमिरकरिकुलानि द्रावयन्नेव तावद्
हरिरुदयच्छलान्तःकाननादुज्जिहीते ॥ १६१ ॥

समस्या—"पश्य प्राची प्रसूते विमलतरमिदं ज्योतिषामण्डमेकं।"

योऽसौ पूर्व्वं युगस्यानुदयगिरिदरीनिर्झरादन्तरीत्वे
वेगाद्युड्डीय खिदादपरजलनिधौ सम्पतन्नस्तमाप।
हंसस्यामुष्य* सङ्गादिव रहसि पुराजातगर्भप्ररोहा
पश्य प्राची प्रसूते विमलतरमिदं ज्योतिषामण्डमेकं ॥ १६२ ॥

---

* हंसः [illegible] सूर्य्यश्च।

অপিচ,—

एको ऽत्यन्तप्रतापी मृदुरुचिरपरस्तौ हि मत्तः प्रसूतौ
कष्टं नष्टावुभावप्यहह ! जगदिदं द्यौ विनाश्य तमोभिः।
इत्थं खिन्नेव संप्रत्यपरमिव रविं स्रष्टुकामा प्रभाते
पश्य प्राची प्रसूते विमलतरमिदं ज्योतिषामण्डमेकं ॥१६३॥

समस्या—"प्राप्तः पश्यत पश्चिमस्य जलधेः कूलं स एवांशुमान् ।"

यः साडम्बरमम्बरान्तरमरं संरुध्य तीव्रैः करैः
विश्वं निःस्वमिव प्रकाममकरोदत्यन्तमुत्तापयन् ।
हीनः सम्प्रति तेजसां समुदयैर्नीचीनभावं गतः
प्राप्तः पश्यत पश्चिमस्य जलधेः कूलं स एवांशुमान् ॥ १५४ ॥

समस्या—"समस्तं तद्व्यर्थं कृतमननुकूलेन विधिना ।"

भविष्यामि क्षौणीपतिरहमयोध्यापुरवरे
प्रिया मे देवीत्वं जनकतनया यास्यति शुभा ।
अहो ! कष्टं यद्यत् परिमथितमेवं स्थिरतया
समस्तं तद्व्यर्थं कृतमननुकूलेन विधिना ॥ १६५ ॥

অপিচ,—

परीवादः सोढः कुलमपि समूलं मलिनितं
त्रपा त्यक्ता दूरं, गुरुषु गुरुभावो न गणितः ।
विलङ्घ्य प्रेमाब्धिं हरि हरि ! हरौ याति मथुरां
समस्तं तद्व्यर्थं कृतमननुकूलेन विधिना ॥ १६६ ॥

समस्या—"श्रीकण्ठवैकुण्ठयोः"

भक्तानामभये सुरारिविजये तुल्यक्रियायाशिनो-
रन्योन्यं परिरब्धप्रणयिनोर्नास्त्यन्तरं वस्तुतः ।

तच्चित्रं स परोऽपरोऽयमिति यत् पाषण्डवैतण्डिका:
भिन्नत्वं कलयन्ति मन्दमतय: श्रीकण्ठवैकुण्ठयो: ॥१६७॥

समस्या—"त्रिभुवने श्रीमानभूदच्युत: ।"

प्राबल्यं कलिभूपते: कलयतां प्रायोऽस्य यद्देहिनां
गङ्गावारि सुरासुरावरबधूर्वाराणसी वेश्मभू: ।
भोगो यागविधि: श्रुति: स्मरकथा किं वा बहुब्रूमहे
नित्योपास्यतया जनैस्त्रिभुवने श्रीमानभूदच्युत: ॥१६८॥

অপিচ,—

व्यग्र: सर्गविधौ विधि: प्रतिदिनं विश्वस्य सुप्तोत्थितो
भिक्षायां भ्रमणं भवस्य नियतं स्वास्थ्यं कुतस्त्यं तयो: ।
किन्त्वेकस्त्विदमेषु वेश्मितनिजत्रैलोक्यरक्षाभरो
वाग्देवीस्तुतिनिर्वृतस्त्रिभुवने श्रीमानभूदच्युत: ॥ १६९ ॥

समस्या—"न चिरादुत्सवो हैमवत्या: ।"

मन्दं मन्दं जलदवसनं स्रंसते दिग्वधूनां
पान्था: कान्तास्मरणसुखिनो गन्तुकामा नितान्तं ।
सम्प्राप्तोऽयं प्रिय इव नृणामाश्विनो मासराजो
मन्ये भावी जगति न चिरादुत्सवो हैमवत्या: ॥ १७० ॥

समस्या—"रक्ष मां दक्षकन्ये ।"

पुरमथनकुटुम्बिन्याधिपत्यं धराया:
सुरपरिवृढतां वा साम्प्रतं नास्मि याचे ।
द्रविणमदविमुग्धद्रव्यवत्पार्श्वजायत्-
कटुवचनजदु:खाद् रक्ष मां दक्षकन्ये ! ॥ १७१ ॥

समस्या—"सागराम्भःपिपासा ।"

हसितविकसितास्ये दातुमर्थान् प्रवृत्ते
त्वयि सति धनमत्तान् याचका न प्रयान्ति ।
सति सरसि समीपे स्वादुपानीयपूर्णे
किमु भवति जनानां सागराम्भःपिपासा ॥ १७२ ॥

समस्या—"हर्षाय वर्षागमः ।"

चन्द्रार्कौ क्व गतौ तमोभिरभितो ग्रस्तो दिशां द्राघिमा
धारा दीर्घतराः पतन्ति किमुतोत्तिष्ठन्ति पृथ्वीतलात् ।
अह्नां निह्नवनात् क्षपापि च निशा द्राघीयसी लक्ष्यते
मन्ये युक्तजनस्य केवलमहो ! हर्षाय वर्षागमः ॥ १७३ ॥

"চন্দ্র সূর্য্য কোথা গেল ! ঘোর অন্ধকার—
গ্রাস করিয়াছে দিক দিগন্ত-বিস্তার ;
মুষলের ধারে ধারা পড়িছে ধরায়,
পড়িছে কি উঠিতেছে বুঝা নাহি যায় ;
বরষায় দিন রাত্রি কে চিনিতে পারে,
দিবাও রজনী হয় মেঘের আঁধারে ;
প্রেমিকদম্পতী যারা জড়াজড়ি রয়,
তাদেরি সুখের তরে বরষা সময় ।"

समस्या—"धातुर्हि रम्यं जगत् "

अम्भःसेवनभूमिकर्षण[illegible]
उद्यानेषु विभान्तु नाम तरवः [illegible] ।
वेला नापि न वर्षणोऽस्ति न पुनः [illegible]
मोदन्ते स्म तथापि [illegible] धातुर्हि रम्यं जगत् ॥ १७४ ॥

"বাগানের গাছগুলি বাড়াবার তরে,
ভাল ভাল মালি সব কত যত্ন করে ;
বেড়া বাঁধে জল দেয় করে করষণ,
প্রাণপণে করে তার বিঘ্ন নিবারণ ;
কিন্তু দেখ ! বনমাঝে কেবা আছে মালি,
কে করে কর্ষণ কেবা জল দেয় ঢালি ;
তবু দেখ ! বন্য তরু শোভে ফলভরে,
বিধিই করেন রক্ষা মানুষে কি করে।"

সমস্যা—"भेकेह मूको भव।"

यस्मिन् पद्मपरागपिञ्जरपयःस्वच्छाशये साम्प्रतम्,
गुञ्जन्तो मधुरं हरन्ति मधुपाश्चित्तं नृणां शृण्वताम्।
नैतत् पल्वलमङ्ग ! पङ्किलजलप्रोद्भूतकुम्भीकुलम्
न श्रोतास्ति तवात्र गानरसिको भेकेह मूको भव ॥ १७५ ॥

"এ যে রম্য সরোবর অতি নিরমল,
অপূর্ব্ব পরাগরাগে শোভিছে কমল ;
মধুপ মধুর তানে করিতেছে গান,
হরণ করিছে সবাকার মন প্রাণ ;
যার জলে পানাগুলা ভাসে অবিরল,
এ নহে সে পঙ্কভরা বিকৃত পল্বল ;
তোমার গানের হেথা শ্রোতা কেহ নাই ;
তাই বলি ওহে ভেক ! চুপ কর ভাই !।"

সমস্যা—"कान्ते किमाचक्ष्महे।"

देवानामृषभः सतीमपि मुनेः पत्नीं जहार च्छलात्
ब्रह्मापि श्रुतिधर्ममर्मनिपुणः कन्याभिगः श्रूयते ।
चन्द्रोऽसौ गुरुतल्पगोऽभवदहो ! वार्त्ता सुराणामियं
मर्त्येषु स्मरविह्वलेषु नितरां कान्ते किमाचक्ष्महे ॥ १७६ ॥

"অহল্যা সতীরে ইন্দ্র কৌশলে হরিল,
বেদকর্ত্তা বিধাতাও কন্যারে ভজিল ;
আলোকিত করে বিশ্ব যাহার কিরণ,
সেই চন্দ্র গুরুপত্নী করিল হরণ ;
এ হেন দুর্দ্দশা যদি হৈল দেবতার,
মানুষ কামের দাস কিবা দোষ তার।"

সমস্যা—"किं कार्य्यं परिशिष्टमस्ति भवतो जानामि नाहं कले !"

वेदं वेद न कोऽपि भूधरदरीलीना मुनीनां गिरः।
स्वच्छं म्लेच्छमतं जनास्तदनुगाः का नाम धर्म्म्याः क्रियाः।
मद्यं हृद्यमतीव वारवनिताः सेव्या न गुर्व्वादयः
किं कार्य्यं परिशिष्टमस्ति भवतो जानामि नाहं कले ! ॥१७७॥

"ঋষিবাক্য গিরিগর্ভে পাইয়াছে লয়,
বেদশাস্ত্র কেহ নাহি জানে এ সময় ;
সবাই ম্লেচ্ছের মত করে শিরোধার্য্য,
তাঁহারি বিধানমতে করে সর্ব্ব কার্য্য ;
ধর্ম্মাধর্ম্ম সদাচার গিয়াছে চুলায়,
মদ্যই পরম বস্তু হয়েছে ধরায় ;
মাতা পিতা গুরুজনে কেবা সেবা করে,
বারবনিতারে রাখে মাথার উপরে ;
যা কিছু তোমার কার্য্য সকলি করেছ,
জানি না হে কলি ! আর বাকি কি রেখেছ।"

কোন উন্নতপদস্থ ব্যক্তির কার্য্যকৌটিল্য অনুভব করিয়া তর্কবাগীশ এই কবিতাটী রচনা করিয়াছিলেন,—

त्वामेवाभ्युदितं निरीक्ष्य दुरव[illegible]:
[illegible] [illegible] [illegible] यास्ये

त्वय्येदम्बसि वारिवाह ! वहतो वातस्य दुश्चेष्टया
वैमुख्यं तदहो त्वदेकगतिको हाहा ! हतश्चातकः ॥ १७८ ॥

"কঠোর নিদাঘ তাপে জ্বলি' অবিরত,
ক্ষীণ মোর প্রাণ-বায়ু হৈল ওষ্ঠাগত ;
হে মেঘ! তোমারি বারি করিবারে পান,
তোমারেই হেরি' কষ্টে রেখেছি এ প্রাণ ;
তাহে যদি তুমি দুষ্ট বায়ুর চেষ্টায়,
নিতান্ত বিমুখ আজি হও হে আমায় ;
তবে আর অভাগার কে আছে আশ্রয়,
মরিল চাতক হায়! মরিল নিশ্চয়।"

হুগলী জিলার অন্তর্গত আন্দুল নিবাসী মল্লিক-বংশীয় রাজাদের ইচ্ছানুসারে তর্কবাগীশ "আন্দুলরাজ-প্রশস্তিঃ" নামে কতকগুলি কবিতা রচনা করিয়া দিয়াছিলেন। তন্মধ্যে যে কয়েকটী সংগ্রহ করিতে পারা গেল নিম্নে প্রদর্শিত হইল।—

आन्दुलराजप्रशस्तिः ।

मङ्गलाचरणम् ।

मङ्गल्यैयेव कालिन्द्यालिङ्गनादसितद्युतिः ।
कण्ठो वः शितिकण्ठस्य विकुण्ठयतु कुण्ठताम् ॥ १७९ ॥

आसीदूर्ज्जितवीर्य्यशौर्य्यदहितव्यूहप्रगीतस्तव-
प्रीत्युत्कर्षकरम्बितान्तरचरत्काव्यस्यमाम्नायवः ।
कायस्थान्वयदुग्धजलधिप्रोद्भूतशीतद्युतिः
यन्नाम्ना भुवि रामलोचन इति प्रख्यातनामा नृपः ॥ १८० ॥

यस्याभवद्दिभवतुन्दिलमान्दुलेति
ख्यातं पुरं प्रकृतिराजितराजधानी।
या शुभ्रसौधशिखरप्रकरैर्नराणां
गौड़ेऽपि शैवशिखरिभ्रममातनोति ॥ १८१ ॥

जेतुं प्रालेय-पृथ्वीधर-शिखर मिवाऽभ्युन्नतोऽट्टालमाला-
जाग्रज्ज्वालान्तरालस्खलदमल-विभाभाविताभ्यन्तरर्द्धिः।
सौधः सौधाकरीं भामभिगगनतलं यो विभर्त्तास्य नित्यं
लक्ष्मीमालोक्यमन्ये न भजति गिरिशः काशीवासाभिलाषम्॥१८२॥

येनाकारि पुरा पुरारिनगरीमध्ये प्रकृष्टास्पदः
प्रासादः शिवशैलतुङ्गशिखरस्पर्द्धाशयेवोन्नतः।
तस्मिन् लिङ्गमनङ्गवीर्य्यदमनस्यैकं स्वपुण्यावली-
लिङ्गं येन च भूरिसूरिपरिषत्सन्तोषिणा स्थापितम् ॥१८३॥

कालीघट्टान्तराले कलिकलुषकुलीमूलनोत्कीर्त्तनायाः
कालीदेव्याः पुरस्तात् पुरमथनपदप्राप्तिसोपानभूता।
येन क्ष्मापेण कीर्त्त्या शशिकरसितया सार्द्धमुद्वर्द्धमाना
प्रोत्तुङ्गस्तम्भमाला व्यरचि सुविमला नाट्यशाला विशाला ॥१८४॥

व्योम्नि ज्योत्स्नायमाना, पयसि जलनिधेः फेनलेखायमाना,
शृङ्गे गङ्गायमाना तुहिनशिखरिणो, दिक्षु सौधायमाना।
क्षौण्यां वन्यायमाना, शिरसि स्मरद्विषो कुन्ददामायमाना,
सर्व्वत्र द्योतमाना विलसति नृपतेः कीर्त्तिरद्यापि यस्य॥१८५॥

पूर्व्वाद्रेरिव भानुमान् सुरसरित्पुरो हिमाद्रेरिव
क्षीरोदादिव कौस्तुभः कमलभूर्न्नाभ्यम्बुजादिव।

एतस्मादुदभूत्प्रभूतगरिमा गाम्भीर्य्यवीर्य्योर्ज्जितः
काशीनाथ इति प्रकाशितयशाः क्षौणीपतिः क्ष्मातले ॥ १८६ ॥

राज्यं पितुः प्राज्यमवाप्य यस्य गृहे प्रजारञ्जनतत्परस्य ।
गुणानुरागादिव चञ्चलापि लक्ष्मीश्चिराय स्थिरतां प्रपेदे ॥ १८७ ॥

विलोक्य लोकान् कफवातपित्तविकाररोगोपहतान् मुमूर्षून् ।
योऽजीवयज्जीवगणैकमित्रं वितार्य्य सिद्धौषधमिद्धवीर्य्यम् ॥१८८॥

ततो नृपसुधाम्बुधेरजनि रामनारायणो
धरापतिधुरन्धरो विधुरिव श्रिया भासुरः ।
यदीयगुणचन्द्रिकोल्लसितगौड़नीराशये
सतां हृदयकैरवं कलितगौरवं मोदते ॥ १८९ ॥

दोषाम्भोनिधिकुम्भसम्भवमुनिर्दारिद्र्यदावानल-
ज्वालासार-परम्परा-गमदरीसञ्चार-पञ्चाननः ।
मित्राम्भोजगभस्तिमान् गुणगणज्योत्स्नाशरच्चन्द्रमाः
संख्यावत्सुरपादपो विजयते योऽयं क्षितीशः क्षितौ ॥ १९० ॥

नोन्निद्रा नलिनी न वा कुमुदिनी नो वा शरच्चन्द्रिका
नोत्फुल्लस्तवकानता नवलता भूमिः सशस्या न वा ।
न प्राप्तिर्निधिभाजनस्य न दृशां भङ्गी कुरङ्गीदृशां
सन्तोषं तनुते तथा भुवि नृणां तद्वत्तु लक्ष्मीर्यथा ॥ १९१ ॥

यस्योग्रतेजसि बलीयसि जृम्भमाणे
मन्दश्रियो रिपुगणाः सहसैव जाताः ।
किं भाति भास्वति तमःशमतानिदाने
खद्योतका द्युतिमदेकधुरीणभावाः ॥ १९२ ॥

প্রথম মুদ্রণ সময়ে প্রেমচন্দ্রের বিরচিত সমস্ত গঙ্গাস্তোত্র সংগ্রহ করিতে পারি নাই। পরে তাঁহার ভূতপূর্ব্ব ছাত্র মানকরের ডেঃ স্কুল-ইনিস্পেক্টর ৺মহেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অনুগ্রহ করিয়া সম্পূর্ণ স্তোত্র পাঠাইয়া দেন। এক্ষণে অভাব পূর্ণ হইল।

गङ्गास्तोत्रम्।

नमस्ते स्यादृगङ्गे ! द्रुहिणहरिरुद्रप्रभृतिभि
र्नुते मातर्दीने मयि शरणहीने कुरु कृपां।
शरण्ये ! विश्वेषां तव चरणपङ्केरुहमहं
प्रपन्नः पाहीमं कृपणमतिभीमाद्भवदवात् ॥ १८३ ॥

स्पृहाशून्या धन्या मखजफलभोगे त्रिपथगे !
कृताशेषक्लेशाः श्रवणमननादावविरतं।
लभन्ते यां सन्तस्तव तु सलिले मज्जनवतां
करस्था सा मुक्तिः कलुषकलितानामपि नृणां ॥ १८४ ॥

विधानं यज्ञानामभिदधति केचिच्छुभकरं
परे निस्त्रैगुण्ये महसि परिणामं च मनसः (१)।
अहं त्वेकं मन्ये सकलजनसाधारणतया
निदानं ते नीरं परमपुरुषार्थस्य न परं ॥ १८५ ॥

पतन्ती स्वर्लोकान्नयसि पतितानुच्चपदवीं
जलध्वन्तर्यान्ती भवजलधिभीतिं शमयसि।

---

(१) परे-अपरे जनाः, निस्त्रैगुण्ये-त्रिगुणातीते, महसि-ज्योतिषि, सर्व्वावभासके ब्रह्मणि इत्यर्थः, मनसः परिणामं-चित्तवृत्तिसमाधानम्, शुभकरम् अभिदधति इत्यन्वयः।

जडात्मापि (१) व्यक्तं कलुषजडतां नाशयसि तत्
विचित्रं ते सत्यं जननि! जनमध्ये विजयते ॥ १९६ ॥

किमापः किं तापत्रयशमनसिद्धौषधमिदं
किमाधारो मुक्तेः किमु परमधाम्नः परिणतिः।
विकल्पान् यानेव त्वयि जननि! लोका विदधते
समस्ताः सत्यास्ते तव महिमसीमा न सुगमा ॥ १९७ ॥

विदूरेऽस्तु स्नानं नच सलिलपानं न यजनं
नवा वासस्तीरे जननि! सुरलोकादपि वरे।
तथापि त्वन्नाम प्रसरति यदीयश्रुतिपथं
स सद्यः शुद्धात्मा यमनृपतिधाम्नीं न विशति ॥ १९८ ॥

भवारण्ये मन्ये नहि भवति तेषां निवसति-
र्नवा भीतिर्भीमाकृतिकुपितकालोल्बणमुखात्।
त्वमम्ब! प्रोद्दामाखिलदुरितदाम्नां निरसने
निशातासिर्यासि क्षणमपि यदीयेक्षणपथं (२)॥ १९९ ॥

सपर्य्यासम्भारैः सततमनुगानैर्मनुजपै-
रभीष्टं भक्तानां फलति सुचिरेणामरगणः (३)।
निमग्नाङ्गो गङ्गे! सकृदपि तरङ्गे तव पुन-
र्भवेत् सद्यो धन्यो भवविलयवर्त्मन्यपि जनः ॥ २०० ॥

---

(१) जडात्मा जलात्मा जलमयीति यावत्, डलयोरैकत्वस्मरणात्। अत्र श्लोके सर्व्वत्र विरोधोऽलङ्कारः।

(२) प्रोद्दामाखिलदुरितदाम्नां—अतिघोर निखिल पापरूपबन्धनानाम्, निरसने—छेदने, निशातासिः—सुतीक्ष्णखड्गस्वरूपा, तादृशी त्वं, यदीयेक्षणपथं यासि इत्यन्वयः।

(३) अमरगणः, अभीष्टं फलति निष्पादयति, अत्र निष्पादनार्थकत्वात् सकर्म्मकत्वं फल-धातोः प्रयोगः।

शिवाभिः संश्लिष्टानमरललनाश्लेषरसिकाः
मिलद्‌ब्रह्मघोषान् स्फुरदमरवन्दिस्तुतिगिरः।
विमाने राजन्तः पयसि तरतस्ते तत इतः
स्वदेहान् पश्यन्तस्त्रिदशनगरीं यान्ति कृतिनः॥ २०१॥

विपज्ज्वालालीढ़ान् निरवधिगतायातविधुरान्
अतिश्रान्तान् शश्वत्परिचितकृतान्तान् कलुषितान्।
जनान् दृष्ट्वा नूनं भवपथिकविश्रामपदवी
विधात्रा कारुण्याज्जननि! जगति त्वं प्रकटिता॥ २०२॥

त्वदीयं पानीयं त्रिदशनदि! तापत्रयहरं
त्रिलोकीवस्तुभ्यः परमतममेकं विलसति।
नचेदेवं देवः कृतचरणसेवः सुरनरैः
कथं धत्ते मस्ते गुणगरिमलुब्धोऽन्धकरिपुः॥ २०३॥

न गङ्गेति प्रोक्तं नच जननि! पीतं तव जलं
नवा तत्र स्नातं सकृदपि मया पूर्व्वजनुषि।
नचेदित्थं तथ्यं कथमवनिदावे निपतितो
भ्रमाम्याशाशास्वाशाशतजनितदुःखान्यनुभवन् (१)॥ २८४॥

सुरधुनि! धनदारापत्यभृत्यादिसम्पत्
क्षितिपरिवृढ़ता वा त्वत्पदान्नार्थनीया।
भगवति! सति काले तीरनीरान्तराले
वपुरपगममेकं याचते प्रेमचन्द्रः॥ २०५॥

इति महामहोपाध्याय-श्रीप्रेमचन्द्रतर्कवागीश-विरचितं
गङ्गास्तोत्रं समाप्तम्।

---

(१) अहम्, आशाशतजनितदुःखानि अनुभवन् सन्, आशासु-दिक्षु, भ्रमामि इत्यन्वयः।

সংস্কৃতজ্ঞ সহৃদয় পাঠক! আপনি স্বয়ং প্রেমচন্দ্রের বিরচিত গ্রন্থসমূহের বিবৃতিনিচয় এবং সমুদ্ধৃত কবিতাগুলির দোষগুণ বিচার করিয়া লইবেন। দেখিবেন তিনি গুণবতী পদরচনায় এবং সকল প্রকার রসের এবং সকল অবস্থার বর্ণনায় কিরূপ কুশলী ছিলেন। তাঁহার রচনায় শ্লেষ, প্রসাদ, মাধুর্য্য, সমতা, সুকুমারতা ওজস্বিতা আদি গুণসমূহ লক্ষিত হইয়া থাকে। ইহাতে তিনি প্রায় বৈদর্ভীরীতি অবলম্বন করিয়াই রচনা করিতেন বোধ হইবে। যে রীতি অবলম্বনে রচনায় প্রবৃত্ত থাকুন, তাঁহার রচনা যে অনায়াসসম্ভূত, মাধুর্য্যযুক্ত এবং তাহার অর্থব্যক্তি বিষয়ে ব্যাঘাত ঘটে না তদ্বিষয়ে সন্দেহ জন্মে না। ইহাই প্রকৃত কবিত্বের পরিচায়ক।

প্রথম গুণগায়ক নৃসিংহ তর্কপঞ্চানন প্রেমচন্দ্রের জন্মাবধি কবিত্ব শক্তি সম্বন্ধে যে কথা বলিয়াছিলেন তদুপযোগী তাঁহার রচিত একখানি পূর্ণ কাব্য-গ্রন্থ পাঠকগণের সম্মুখে উপস্থিত করিতে পারিলাম না সত্য কিন্তু তাঁহার বিরচিত যে ২০৫টী কবিতা সমুদ্ধৃত হইল এইগুলি মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ করিলে সহৃদয় পাঠক বিমল কাব্যামোদ উপভোগ করিতে সমর্থ হইবেন আশা করা যায়। বিভিন্ন রসের এই কবিতাগুলিতে জীবতত্ব, জগৎতত্ব, সমাজতত্ব, সত্যভাব, ধর্ম্মভাব, মার্জ্জিতরুচি, ভাষাচাতুর্য্য ও গভীর সৌন্দর্য্য প্রচুর পরিমাণে সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাঁর গঙ্গাস্তোত্রটী পূর্ব্বতন কবিগণের বিরচিত স্তব অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট বোধ হয় না, বরং স্থানে স্থানে সমুন্নত নূতন ভাবের অবতারণা দেখিয়া মোহিত হইতে হয়। ফলে প্রকৃত সাহিত্য-সেবী প্রেমচন্দ্রের জীবনই একটী কাব্য বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। এই কাব্য নিতান্ত নীরস ও নিরানন্দ বোধ হইবে না। ইহাতে জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম্ম ও ধর্ম্মভাবের অদ্ভুত স্ফূর্ত্তি দেখা যাইবে। এই কাব্য সম্বন্ধে যাহা কিছু বলা হইল তাহাতে আমায় কোনপ্রকার কল্পনার আশ্রয় লইতে হয় নাই! পণ্ডিতের জীবনচরিত সম্বন্ধে সমস্ত কথা আজ্‌কাল প্রীতিকর হইবে কিনা ভাবিয়া প্রকৃত কথা বলিতেও বরং স্থানে স্থানে সঙ্কোচভাব অবলম্বন করিতে হইয়াছে।

ধর্ম্মভাবে প্রেমচন্দ্রের ভক্তি ও নিষ্ঠার জোর বিলক্ষণ বলবত্তর দেখা যায়। কোন সিদ্ধ ও ভক্ত কবির মত "হস্তমুৎক্ষিপ্য যাতোঽসি বলাৎ কৃষ্ণ!

কিমদ্ভুতম্। হৃদয়াদ্ যদি নির্বাসি পৌরুষং গণয়ামিতে" এইরূপ অথবা সিদ্ধ ও সাহসী কবি রামপ্রসাদের মত "ভক্তির জোরে কিন্তে পারি ব্রহ্মময়ীর জমিদারী" ইত্যাকার জোরের উক্তি প্রেমচন্দ্রের রচনায় লক্ষিত হয় না সত্য কিন্তু ইহাঁর প্রার্থনায় যেরূপ বিনীতভাব দেখা যায়, তাহা সমধিক প্রীতিপদ বলিয়া বোধ হয়। গঙ্গাস্তোত্র শেষে জগৎসাম্রাজ্যসুখ চাহি না, ধনদারাপত্য সম্পত্তি চাহি না, সময় উপস্থিত হইলে পার্থিব দেহপাতের নিমিত্ত তটপ্রদেশে জলস্থলে কিঞ্চিন্মাত্র স্থান যেন পাই বলিয়া প্রেমচন্দ্রের প্রার্থনা জ্ঞানীর প্রার্থনামত অতি সুন্দর বোধ হয়। তাঁহার এই প্রার্থনা পূর্ণ হইয়াছিল এবং পূর্ণ হইবার উপক্রমেই তাঁহার অপার মনস্তুষ্টি বুঝা গিয়াছিল।

হিন্দুধর্ম্মাবলম্বীদের বহু সম্প্রদায় দৃষ্ট হয়। কোনপ্রকার ধর্ম্মসম্প্রদায়ে প্রেমচন্দ্রের বিরাগ ছিল না। তাঁহার সমক্ষে রাম, হরি, হর, বা ভবানীর পরিচয় সকলেই সমভাবে সম্মানার্হ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। রাঘবপাণ্ডবীয় কাব্যের প্রথমে পরম পুরুষ শ্রীরামের, কুমারসম্ভবে কুমারজননী শ্রীভবানীর, মুকুন্দমুক্তাবলী ও চাটুপুষ্পাঞ্জলিতে শ্রীকৃষ্ণের এবং কাব্যাদর্শ আদি গ্রন্থে শ্রীবাগ্‌দেবীর স্তুতিবাদসূচক প্রেমচন্দ্রের কবিতাগুলি যথোপযুক্ত ও সহৃদয়সম্মত বলিয়া বোধ হয়।

পাশ্চাত্য শিক্ষা ও কর্ম্মশীলতার প্রবর্ত্তনে চারিদিগে মহাবিপ্লব উপস্থিত হইলেও প্রেমচন্দ্রকে নিয়ত অটল অনড় দেখা যাইত। কলিকাতা হইতে স্বগ্রামে যাইবার কালে একবার হাবড়ায় টিকিট কিনিবার পরেই বর্দ্ধমানের গাড়ি ছাড়িয়া দেয়, কাহারও আরোহণ করা ঘটে নাই। তখনকার নিয়মানুসারে প্রতিদিন একটী মাত্র গাড়ি বর্দ্ধমানে যাইত। যে টিকিটগুলি ঐ দিন খরিদ করা হইয়াছিল তাহার মূল্য ফেরত পাওয়া যায় নাই। বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন সময়ে তর্কবাগীশ বলিলেন—পূজার সময়ে এতগুলি টাকা "ন দেবায় ন ধর্ম্মায়" গেল, কেবল সাহেবদের পেটে পড়িল। ইহা শুনিয়া তাঁহার অন্যতম ভ্রাতা বলিয়া উঠিলেন—পড়িবে না কেন? এই সকল কাজে একটু ত্বরায় প্রয়োজন; আপনি ত আপনার সাবেক চাল্ ছাড়িতে পারিবেন না; আহারান্তে পান খাইয়া যে কয়েকটী কুল্‌কুচা করিবার বরাদ্দ আছে, আজ তাহারও একটীমাত্র কম করেন নাই। তর্কবাগীশ বলিলেন—সরকারী

কার্য্যে বাষ্পীয় ও বৈদ্যুতিক শক্তি সঞ্চালিত হইল বলিয়া আমাদের চির-সেবিত শৌচাশৌচ কর্ম্মেও কি তাহা চালান যাইতে পারে? তবে যেরূপ দেখিতেছি অনতিবিলম্বে সকলপ্রকার ধর্ম্ম কর্ম্মেও সংক্ষিপ্ত বন্দোবস্ত জারি হইবে। সময়স্রোতের প্রবলতা দেখিয়া বিস্মিত হইতে হইয়াছে; যাহা হউক কর্ত্তব্যের অনুষ্ঠানে শিথিল যত্ন হইতে পারা যাইবে না, ইহাতে ঐহিকের ব্যাঘাত হয় হউক। ফলে সর্ব্বাবস্থায় এবং সর্ব্বপ্রকার সময়-সঙ্কটেও ধর্ম্মভাবে প্রেমচন্দ্রকে ধীর ও স্থিরলক্ষ্য দেখা যাইত। জ্ঞান ও অধ্যাত্মদর্শন বলে ধর্ম্মের পবিত্র পথে তিনি নিয়ত অগ্রসর ও জাগরূক থাকিতেন; বলিতেন—লোক যখন নিষ্ক্রিয় ও নিশ্চেষ্ট, তখন ও প্রকৃতি এবং প্রত্যেকের সম্মুখার কার্য্য অব্যাহতরূপে চলিয়া থাকে, কাজেই নিষ্ক্রিয় ও অনবহিত হইলে লোক লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়; ভ্রষ্ট লক্ষ্যের ভ্রমপ্রমাদ পদে পদে ঘটিয়া থাকে। নরোপসনায় বারম্বার ভ্রমপ্রমাদের মার্জ্জনা হয় না, অমরোপাসনায় জরঠ ভ্রান্ত ও মোহান্ধের পরিত্রাণের প্রত্যাশা কি? মোহান্ধকার অপসারিত না হইলে ঠিক্ গন্তব্য স্থানে স্থিরভাবে উপনীত হওয়া যায় না।



পরিশিষ্ট।

এই জীবনচরিতের দ্বিতীয় সংস্করণ আরম্ভ হইবার পরে শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন আমার উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে যাইতে হইয়াছিল। তথায় মির্জাপুরে শ্রীযুত বাবু অভয়ানাথ ভট্টাচার্য্যের সহিত অকস্মাৎ সাক্ষাৎ ও আলাপ পরিচয় হয়। ইনি সম্প্রতি মির্জাপুরের জজকোর্টের হেডক্লার্ক। ইতিপূর্ব্বে ইনি বেনারস সংস্কৃত কলেজে এবং কিছুকাল ৺তর্কবাগীশের নিকটে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ইহাঁর সহিত আলাপে তর্কবাগীশ সম্বন্ধে যে কতকগুলি নূতন কথা জানিতে পারিলাম, তাহা তৃতীয় পরিচ্ছেদে সন্নিবেশিত করিতে পারিলেই যথাস্থানে বিন্যস্ত হইত কিন্তু তখন তৃতীয় পরিচ্ছেদের মুদ্রণকার্য্য শেষ হইয়াছিল। অগত্যা এই স্থানে ঐ কথাগুলি সংযোজিত করিতে হইল। যেরূপ জানিলাম তাহাতে অভয়ানাথ বাবু তর্কবাগীশের ছাত্রমাত্র ছিলেন না; সুস্থ সময়ে তাঁহার অদ্বিতীয় সহায় এবং পীড়া সময়ে প্রকৃত বন্ধু ছিলেন।

তর্কবাগীশ পেন্‌সেন্‌ লইয়া কাশীতে অবস্থান করিবার কিছুদিন পরেই তথাকার সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ পণ্ডিতবর রোল্ট এইচ্‌ গ্রিফিৎ সাহেব মহোদয় সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যান। কলেজের মধ্যে কোন্‌ ঘরে সাহেব মহোদয় বসিয়া থাকেন ইত্যাদি বিষয়ে সন্ধান লইবার নিমিত্ত তিনি ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন এই সময়ে অভয়ানাথ তাঁহার সম্মুখে পড়েন। তর্কবাগীশের মধুর মূর্ত্তি দেখিয়া অভয়ানাথ যেমন মুগ্ধ হইলেন, তেমন তাঁহার ধুতি উড়ানী চটি জুতা মাত্র পরিচ্ছদ দেখিয়া ও উদ্দেশ্য শুনিয়া উন্মনা হইলেন, বলিলেন—এইরূপ পরিচ্ছদ বিশেষতঃ জুতাসহ তথাকার কোন পণ্ডিতের সহিত সাহেব মহোদয় সাক্ষাৎ করেন না এই তাঁহার নিয়ম। জুতা ছাড়িয়া যাইতে চাহেন না, বোধ হয় কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুত কাউয়েল সাহেব তাঁহার বিষয়ে লিখিয়া থাকিবেন বলিয়া তর্কবাগীশ প্রকাশ করিলে অভয়ানাথ সাগ্রহে সাক্ষাৎ-

কারের তদ্বির করিয়া দেন। এত্তেলা দিবামাত্র গ্রিফিৎ সাহেব মহোদয় বিনা ওজোরে ও অতি সমাদরে তর্কবাগীশ সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং বহুক্ষণ ধরিয়া শাস্ত্রীয় আলাপ করিয়া অতিশয় সন্তোষ প্রকাশ করেন।

এদিগে এই সমাচার পাইয়া কলেজের পণ্ডিতবর্গ বেলাবসানে কলেজ বন্ধ হইলেও একত্রে মিলিত তর্কবাগীশের প্রতীক্ষা করেন এবং গুণগ্রাহী বক্তৃতা করিয়া বহুমানপূর্ব্বক তাঁহার অভ্যর্থনা করেন। এই ঘটনার পর দিন অভয়নাথ পাঠার্থী হইয়া তর্কবাগীশের বাসায় উপস্থিত হয়েন। বহুকালের পর এইরূপ কার্য্য হইতে একবারে অবসর লইয়া কাশীতে অজ্ঞাতভাবে আসিয়াছেন, পাঠনাকার্য্যে আবার লিপ্ত হইতে ইচ্ছা নাই বলিয়া তর্কবাগীশ প্রকাশ করেন। স্থানান্তরিত হইলেও জ্ঞানীর জ্ঞানপ্রভা বিশীর্ণ হয় না; সদগুরুর সান্নিধ্য ও জ্ঞানালোকে সমাকৃষ্ট শিষ্য বিমুখ হইয়া ফিরিলে ক্ষোভের পরিসীমা থাকিবে না; যেমন মধুর বাক্য শুনা যাইতেছে সেইরূপ মধুর শাস্ত্রব্যাখ্যা শুনিবার বাসনায় আসিয়াছেন, ফিরিতে পারিবেন না বলিয়া অভয়নাথ বলিতে থাকিলে তর্কবাগীশ কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন ভাল! তুমি যাহা অধ্যয়ন করিতে চাহ, অধ্যয়ন করাইব বলিয়া অধ্যাপনা স্বীকার করিলেন। ইহার পর দিবস আর ৫।৬টী নূতন ছাত্র আসিয়া যুটিল। "অভয়! তুমিই এই সকল গোলমাল বাধাইলে এবং ইহাদিগকে সঙ্গে আনিলে" তর্কবাগীশ বলিতে লাগিলেন। "না মহাশয়! আমার কোন দোষ নাই; আপনার নামের ঘোষ বা গুণই ইহার কারণ" অভয়নাথ বলিলেন। এইরূপে ছাত্র সংখ্যা ক্রমে বৃদ্ধি হইতে হইতে শেষে ৪৫।৪৬ জনায় দাঁড়াইল। তর্কবাগীশ পীড়ার পূর্ব্ব দিবস পর্য্যন্ত এই সকল ছাত্রের অধ্যাপনাকার্য্য আহ্লাদপূর্ব্বক সম্পাদন করিয়াছিলেন। এই ছাত্রমধ্যে একজন নেপালী, চারি জন পঞ্জাবী, ৫।৬ জন বাঙ্গালী, অবশিষ্ট সমস্ত দ্রাবিড় ও হিন্দুস্থানের লোক ছিলেন। তন্মধ্যে তথাকার কলেজের ৮।৯ জন ছাত্র, এবং দুইজন অধ্যাপক তর্কবাগীশের নিকটে পাঠ স্বীকার করিয়াছিলেন। সাংখ্যের অধ্যাপক বেচন তেওয়ারী এবং অলঙ্কারের অধ্যাপক শীতলপ্রসাদ তেওয়ারী প্রতিদিবস আসিতে পারিতেন না অবসর পাইলেই মধ্যে মধ্যে অধ্যয়নার্থ আসিতেন। ইহাঁরা উভয়েই সুপণ্ডিত ও

সুকবি ছিলেন এবং স্থানীয় পণ্ডিতনামক জর্ণেলের মুদ্রণবিষয়ে সহায়তা করিতেন। কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, বেদান্ত, সাংখ্য, পাতঞ্জল এই সকল শাস্ত্রের অধ্যাপনা হইত। প্রাতঃকালে পাঠনা বন্ধ থাকিত। এই সময়ে পূজা ও জপাদিতে ব্যস্ত থাকিতেন বলিয়া কেহই তর্কবাগীশের সাক্ষাৎ পাই-তেন না। বেলা দ্বিতীয় প্রহরের পর পাঠনাকার্য্য আরম্ভ হইত এবং রাত্রি ৮।৯ টা পর্য্যন্ত চলিত। কথিত শাস্ত্র সকলের যে কোন গ্রন্থ পাঠনা হউক না কেন তর্কবাগীশ মুখে মুখেই তাহা পড়াইতেন, কখন পুস্তক ধরিয়া পড়াই-তেন না বলিয়া কি পণ্ডিত কি ছাত্র সকলেই বিস্ময়াপন্ন হইতেন। ছাত্রেরা পর্য্যায়ক্রমে পাঠ্যগ্রন্থের কিয়দংশ আবৃত্তি করিত এবং তিনি শুনিয়া মুখে মুখেই তাহার ব্যাখ্যা করিয়া যাইতেন এই তাঁহার পাঠনার প্রণালী ছিল। অন্যান্য বহুতর পণ্ডিত সত্ত্বেও পাঠার্থী হইয়া তাঁহার নিকটে আসা তত্রত্য লোকের একটা শক্ বলিয়া যখন বুঝিলেন, তখন তর্কবাগীশ এক নিয়ম নির্দ্ধারিত করিলেন, বলিলেন—এক এক গ্রন্থের কয়েকটা শ্লোক বা কিয়দংশ দিনান্তে পড়িলে গ্রন্থ সমাপ্তি হইতে বহুকাল লাগিবে এবং তাঁহার নিকটে পড়িতে আসিবার বিশিষ্ট ফল অনুভূত হইবে না, এই ভাবিয়া তিনি প্রথমতঃ পাঠ্য গ্রন্থের একটী সংক্ষিপ্ত বিবরণ লেখাইয়া দিতেন; এবং তাহার বহুতর অংশ পূর্ব্বাহ্নে গৃহে পড়িয়া আসিতে সকলকে উপদেশ দিতেন; ইহাতে ঐ অংশে সকলের একপ্রকার ধারণা জন্মিত। পাঠনা সময়ে এক এক ছাত্র পর্য্যায়ক্রমে আবৃত্তি করিতেন এবং অধ্যাপক কঠিন অংশের অর্থ করিয়া যাইতেন; অপরাংশ মধ্যে কোন স্থান কাহার দুর্ব্বোধ থাকিলে তাহার ব্যাখ্যা করিতেন। এই নিয়মে এক একদিন কাব্যের এক এক সর্গ, নাটকের এক এক অঙ্ক এবং গ্রন্থান্তরের বিশিষ্ট ভাগের ব্যাখ্যা শেষ হইত। অধ্যাপক কোন্ ছাত্রকে কোন্ অংশ আবৃত্তি করিতে বলিবেন নিশ্চয় না থাকায় সক-লেই মনোযোগপূর্ব্বক তাহা গৃহে পড়িয়া আসিতেন। এই নিয়মের ফলোপ-ধায়কতা অনুভব করিয়া সকলেই সন্তোষলাভ করিতেন। ফললাভ ও বোধ হয়, সামান্য হয় নাই। তর্কবাগীশের পাঠনার পরিপাট্যের কথা বলিতে বলিতে অভয়ানাথ সম্প্রতি ভিন্ন ব্যবসায়ী হইয়াও নৈষধাদি গ্রন্থের অনেক স্থান মুখে মুখেই আবৃত্তি ও ব্যাখ্যা করিতে গিয়া যেরূপ আমোদ ও প্রাবীণ্য

প্রকাশ করিলেন তাহাতে ছাত্রদিগের (অসামান্য) অভিনিবেশ, জিগীষা ও এক মনপ্রাণতা এবং অধ্যাপকের যত্নশীলতার বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া গেল।

এইরূপ নিত্য পাঠনার নিয়ম প্রতিপালন করিয়াও তর্কবাগীশ গ্রন্থরচনায় বিরত হয়েন নাই। অভয়ানাথ বলেন তিনি তর্কবাগীশের হস্তলিখিত এক নূতন অলঙ্কার গ্রন্থের তিন শতের অধিক পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত দেখিয়াছিলেন বিলক্ষণ স্মরণ রহিয়াছে। এই গ্রন্থের কোন কোন অংশ সময়ে সময়ে পাঠ করিয়া তর্কবাগীশ তথাকার বিচক্ষণ পণ্ডিতদিগকে শুনাইতেন এবং তাহা প্রচলিত অলঙ্কার গ্রন্থসকল অপেক্ষা সমধিক সুরুচিসম্পন্ন, সরল ও সমীচীন হইয়াছিল বলিয়া সকলে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেন। পরিতাপের বিষয় এই যে তর্কবাগীশের লোকান্তর গমনের পরদিবস দপ্তরসহ ঐ গ্রন্থখানি আর দেখিতে পাওয়া যায় নাই। তাঁহার গুণপক্ষপাতী ছাত্রদিগের সন্ধানে ঐ গ্রন্থখানি স্থানান্তরিত হওয়ার বিষয়ে বৈদ্যজাতীয় একটী ছাত্রের উপরে সকলের সন্দেহ নিপতিত হয়। ছাত্রটীও অকস্মাৎ কলিকাতায় চলিয়া আইসেন। উঁহার পিতৃব্যের সহায়তায় অনেক সন্ধান হইয়াছিল; বিশেষ ফল দর্শে নাই। এইরূপ উৎকৃষ্ট গ্রন্থখানি বেনামীতে প্রচারিত হইলেও সাধারণের মঙ্গল হইত বলিয়া অনেকের আশা ছিল।

তর্কবাগীশ ধর্ম্মসম্বন্ধে বাক্‌বিতণ্ডায় পার্য্যমানে লিপ্ত হইতে ইচ্ছা করিতেন না, বরং সান্ত্বনা বাক্যে বিবাদ নিষ্পত্তি করিতে যত্নবান হইতেন। তিনি একদিন প্রাতে স্নানান্তে কেদারেশ্বর দর্শনে যান এবং তথায় দুইজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের ধর্ম্মবিষয়ে তুমুল বিবাদ দেখিতে পান। বিবাদকারীরা এবং উপস্থিত দর্শকেরা তর্কবাগীশকে দেখিয়াই মধ্যস্থতা করিতে অনুরোধ প্রকাশ করেন। তর্কবাগীশ দেখিলেন বিবাদকারীরা উভয়েই নিজ নিজ মতের সমর্থন নিমিত্ত একবারে মোহান্ধ ও ক্রোধান্ধ এবং যজ্ঞসূত্র ছিঁড়িতে ও অভিশাপ দিতে সমুদ্যত; বলিলেন—কোন তর্কের মীমাংসা করা ও তাহা গ্রহণ করা স্থিরচিত্ততার কার্য্য; কিন্তু তৎকালে উভয় পক্ষ যেরূপ চড়িয়া উঠিয়াছেন তাহাতে উঁহাদের ক্রোধসম্বাধহৃদয়ে কোনপ্রকার যুক্তিবাক্য হয় ত প্রবেশলাভই করিবে না; সময়ান্তরে ধীরতা অবলম্বনে আর একটী সদস্য সাক্ষাতে এই তর্কের মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিবেন। এইরূপ বলিয়া তখন চলিয়া আইসেন।

আর এক সময়ে কয়েক ব্যক্তি মিলিত হইয়া বলেন—দেখা যাইতেছে ধর্ম্ম বিভিন্ন; ধর্ম্মের পন্থাও নানা এবং জাতিভেদে ধর্ম্মের আচরণপদ্ধতিও বিভিন্ন; প্রচলিত ধর্ম্ম মধ্যে কোন্‌টী শ্রেষ্ঠ? প্রাচীন হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা লইয়া আজকাল আন্দোলন চলিতেছে; কোন্ কোন্ অংশেই বা ইহার শ্রেষ্ঠতা? এবং কিরূপেই বা সেই সনাতন হিন্দুধর্ম্মের পুনরাবির্ভাব হইবে ইত্যাদি বিষয়ে প্রশ্ন করেন। প্রশ্নকারীদের মধ্যে ইংরাজীতে কৃতবিদ্য বাবু অমৃতলাল মিত্র প্রভৃতি কয়েকজন বিচক্ষণ ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

তর্কবাগীশ বলিলেন—প্রশ্নগুলি গুরুতর, ইহার বিষয়ে চিন্তা না করিয়া তখনি যে ঐগুলির পর্য্যাপ্ত উত্তর দানে সমর্থ হইবেন তাহা বোধ করেন না এবং শ্রোতারা ও যে উত্তর শুনিয়া তৃপ্তিলাভ করিবেন তদ্বিষয়ে আশা কম। যাহা হউক এ কথা বলা যাইতে পারে, প্রচলিত প্রত্যেক ধর্ম্মের অভ্যন্তরে যুক্তির মধুর মূর্ত্তি এবং উন্নতভাবের স্ফূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। তবে সকল দিকে দৃষ্টিপাত করিলে হিন্দুধর্ম্মই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। এই ধর্ম্ম দিব্যজ্ঞানশালী মহর্ষিগণের আধ্যাত্মিক চিন্তাশক্তির অপূর্ব্ব ফল। ইঁহারা সত্ত্বগুণ ও সাধনাবলে কামনা বিসর্জ্জন, দিব্যজ্ঞানবলে জড়জগৎ মধ্যে অধ্যাত্ম জগতের প্রতিপাদন, সমদর্শন বলে বহুরূপমধ্যে একরূপ—চৈতন্যস্বরূপের দর্শন করিয়া মনুষ্যজন্মদুর্লভ অপার আনন্দলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এখন সেই মহর্ষিগণ অন্তর্হিত হইয়াছেন, যুগযুগান্তর অতীত হইয়াছে, প্রাচীন সমাজ বিপর্য্যস্ত হইয়াছে কিন্তু সেই ধর্ম্মের গম্ভীর নাদ অদ্যাপি দিগ্‌দিগন্তে প্রতিধ্বনিত হইতেছে।

ধর্ম্মের পথ বিবিধ ও দুর্গম। উপাসকদিগের রুচি ও সামর্থ্যের বৈচিত্র্যবশতঃ পন্থা বিভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। এইটীই অতি গূঢ় রহস্য। সকলেই গতানুগতিক ন্যায়মতে এক পথে চলিলে তত্ত্বানুসন্ধানে এরূপ যত্ন হইত না। যে পথেই যাও, অধ্যবসায় বলে গন্তব্যস্থানে উপস্থিত হইতে পারিবে। মোহাবরণবশতই পথের দুর্গমতা লক্ষিত হইয়া থাকে; রাজপথের মত ইহা সোজা নহে। কোন্ পথ অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হওয়া যায় এইরূপ সংশয় জন্মিলে পূর্ব্ববর্ত্তী মহাজন যে পথে গিয়াছেন তাহাই অবলম্বনীয়। ইহাতেও সংশয় থাকিলে পথিভ্রষ্টের কষ্ট অনিবার্য্য। বস্তুতঃ জ্ঞানালোকের

অভাবেই পথের দুর্গমতা বোধ হইয়া থাকে। আলোক ব্যতিরেকে অন্ধকারের প্রতীতি হয় না। অল্প আলোকে পরিমিত স্থানের অন্ধকার নষ্ট হয়। এই আলোকিত পরিমিত স্থানের বাহিরে অন্ধকারের সান্দ্রতা বোধ হয়। মনুষ্য আপন প্রকৃতি-সম্ভূত গুণ ও বিকারভাব পরিবর্জন করিতে সমর্থ না হইলে এই আলোকিত পথ দেখিতে পায় না অর্থাৎ ত্রিগুণাতীত হইতে পারিলেই সব একাকার আলোকময় দেখিতে পায়, মোহান্ধকার দূরে যায়।

প্রাচীন হিন্দুধর্ম্মের পুনরাবির্ভাবের যে কথা বলিতেছেন :তদ্বিষয়ে আশা অতি ক্ষীণ। এই ধর্ম্ম জ্ঞানমূলক ও বর্ণাশ্রমনিষ্ঠ ছিল। এক্ষণে শ্রেষ্ঠবর্ণ বিশীর্ণ ও সঙ্কীর্ণ হইয়াছে। জ্ঞানকর্ম্মযোগাদি শিক্ষা নিমিত্ত যে বিরাট বিশ্ববিদ্যালয়রূপ আশ্রম চতুষ্টয় ছিল, তাহা বিনষ্ট হইয়াছে। পরিবর্ত্তিত অবস্থানুরূপ অভিনব সমাজ সমুত্থিত হইতেছে। সাধনবিষয়ে বৈদেশিক আদর্শের অনুকরণ চলিতেছে। কাজেই আধ্যাত্মিক ভাবের অভাব দৃষ্ট হইতেছে। সত্বগুণাবলম্বী, নিস্পৃহ ব্রাহ্মণগণ দ্বারা ধর্ম্মের পুনরুত্থাপনের যে একটী আশা ছিল, তাহা বিলুপ্তপ্রায় হইতেছে। ব্রাহ্মণেরা এখন ক্ষীণবীর্য্য। বেদ প্রায় পরিত্যক্ত। জীবনযাত্রা নির্বাহ নিমিত্ত ব্রাহ্মণেরা কার্য্যান্তরে ব্যাপৃত এবং লুব্ধ বলিয়া পরিগণিত। বৈদেশিক বিজ্ঞানের সমুন্নতি এবং যন্ত্রাদির সমক্ষে বৈদিক মন্ত্র তন্ত্র আজ্ঞাসিদ্ধ হইলেও একবারে পরাভূত। নিকৃষ্ট বর্ণের সমুন্নতি হইতেছে। ব্রাহ্মণেরা নেতৃত্ব হারাইতেছেন। ধর্ম্মের পুনরুত্থাপনের আন্দোলনমাত্র হইতেছে। ইহাও মঙ্গলের বিষয় সন্দেহ নাই। ফলে মুখে ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিলেই ধর্ম্মের সাধন বা প্রকৃত উন্নতি হইবে না, পবিত্র মনই ধর্ম্মের মন্দির। বিশুদ্ধ সাত্বিকভাব, ভক্তি, শ্রদ্ধা, কামকল্পনার বিসর্জ্জন আদি আত্মজ্ঞান সাধনের অঙ্গ। আত্মজ্ঞান সাধনই ধর্ম্ম। এইগুলি ব্রাহ্মণেতর বর্ণে সম্যক্‌রূপে সম্ভাবিত নহে। ব্রাহ্মণ্যের অভিমানবশতঃ এই কথাগুলি বলা হইল জ্ঞান করা না হয়। বস্তুতঃ সে অভিমান নাই। হিন্দুধর্ম্ম কেবল বিশ্বাসের উপরে সংস্থাপিত নহে, জ্ঞানমূলক বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। আত্মজীবনে জ্ঞানের প্রকৃতরূপ প্রস্ফুরণ ব্রাহ্মণেই সম্ভাবিত। এখন ব্রাহ্মণের অধঃপতন অতি গুরুতর। এইরূপ পরিণাম সময়ের মাহাত্ম্য এবং এজন্য

শোচনীয়। চিন্তা করিলে চিত্ত বিক্ষুব্ধ হইয়া পড়ে। এখন সত্বরে সরিয়া পড়িতে পারিলেই মঙ্গল।

শেষ সময় পর্য্যন্ত তর্কবাগীশের চিত্তচাঞ্চল্য লক্ষিত হয় নাই। কর্ত্তব্য-জ্ঞান অব্যাহত ছিল। লোকান্তে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সময়ে ছাত্রব্যতীত তথাকার এত বিজ্ঞ ও বৃদ্ধ ব্যক্তি আগ্রহপূর্ব্বক আসিয়া সহায়তায় উদ্যত হইয়াছিলেন যে একজন সমৃদ্ধিশালী বড় লোকের চরম সময়ে তত লোকসমারোহ সর্ব্বদা দৃষ্টিগোচর হয় না। চিতাগ্নির শুভ্র জ্যোতি উঠিলে "পণ্ডিতজীর পবিত্রদেহের" পাবক শিক্ষা দেখিবে বলিয়া অনেক বৃদ্ধ লোক বহুক্ষণ পর্য্যন্ত মণ্ডলাকারে দণ্ডায়মান ছিল। এই শোকাবহ সমাচার শুনিয়া গ্রিফিত্ সাহেব মহোদয় পর্য্যাকুলিত চিত্তে আক্ষেপ করিয়া তথাকার সংস্কৃত কলেজ একদিবস বন্ধ রাখিয়াছিলেন।

ধন্য পুণ্যশীল প্রেমচন্দ্র! তুমি জন্মগ্রহণ করিয়া রাঢ়দেশ উজ্জ্বল করিয়াছ, জ্ঞানালোক বিতরণ করিয়া রাঢ়বঙ্গ আলোকিত করিয়াছ, দূরে অস্তগমন-কালে পবিত্র চিতাগ্নি জ্যোতিতে শ্মশান দেশ সমুজ্জ্বল এবং দর্শক মণ্ডলীর মন প্রাণ প্রেমভাবে পুলকিত করিয়াছ। তুমি সকল দেশ, সকল সমাজ, সকল সম্প্রদায় পবিত্র প্রেমভাবে আপনার করিয়া লইয়াছ। তোমার জীবনে সৎজন্ম, সৎকর্ম্ম, সৎজ্ঞান্, সৎসঙ্গ, সৎমনন্, সংসাধন, সৎমরণ দেখিতে পাই। তুমি সত্যের সন্ধানে, পরতত্ত্বের বিজ্ঞানে জীবন যাপন করিয়াছ, তুমি বংশের আদর্শ পুরুষ! তোমায় নমস্কার। তুমি জ্ঞানবান্ চরিত্রবান্ ও ভক্তিমান্ ছিলে, আশা করি ঈশ্বর তোমায় আত্মার শান্তি ও স্বস্ত্যয়ন বিধান করিবেন।

পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায় এই পুস্তকে যে মহাপুরুষের কথা লিখিয়াছেন, তিনি যে কি ছিলেন; তাহা তাঁহার ছাত্রবৃন্দের মধ্যে কেহই বলিয়া শেষ করিতে পারিবেন না। সে অগাধ জলে কেহই থাই পাইবেন না, সে মহাপুরুষের কথা বলিয়া কাহারও ক্ষোভ মিটিবে না। এই ক্ষুদ্র পুস্তকে ৺প্রেমচন্দ্রের বিষয় যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা সেই পূর্ণচন্দ্রের

এক কলামাত্র। পূজ্যপাদ লেখক মহাশয় সেই প্রাতঃস্মরণীয় নরদেবতার প্রাণাধিক কনিষ্ঠ সহোদর; তিনি গৃহদেবতার পূজায় তার অন্য পূজারীর হস্তে না দিয়া, সেই কাজ স্বয়ং করিয়া ভালই করিয়াছেন। তাঁহার পূজা অসম্পূর্ণ হইলেও তাঁহার ভক্তির গুণেই পূর্ণ হইয়াছে। শিবতুল্য জ্যেষ্ঠের বিষয়ে ভক্তিমান্ কনিষ্ঠ ভ্রাতা যাহা জানিবেন, যাহা বলিবেন, তাহার অধিক আর কে জানিতে ও বলিতে পারিবে?

"দুর্লভঃ সদ্‌গুরুর্দেবি! শিষ্যসন্তাপহারকঃ"—সে সদ্‌গুরু আর মিলিবে না, তাই তাঁহার কথা মনে হইলে প্রাণ আকুল হয়। বিশেষতঃ তিনি আমার আবাল্য-পরিচিত পিতৃবন্ধু ছিলেন। তাঁহার জীবনচরিত-লেখকের ন্যায় তিনি আমারও গৃহদেবতা। সে দেবতাকে পূজা করিতে কখনই ভুলিব না।

কলিকাতায় তাঁহার বাসা ও আমাদের বাসা পাশাপাশি ছিল। এজন্য সর্ব্বদাই তাঁহাকে দেখিয়াছি, তাঁহার আলাপ শুনিয়াছি। সেরূপ দেব-মূর্ত্তি-দর্শন ও সেরূপ দৈববাণী-শ্রবণ আর কোথাও ঘটিবে না। জ্ঞান হয় যেন সেদিনকার কথা, একদিন তিনি আমাদের বাসায় আমার পিতৃদেবের কাছে বসিয়া ভগবৎসঙ্গীত শ্রবণ করিতেছিলেন, আর আমি সারারাত্রি উভয়কে বাতাস করিয়াছিলাম; সে হরি-হর যুগলমূর্ত্তি দেখিয়া ও বাতাস করিয়া আমার আশা মিটে নাই।

আমার সেই পিতৃপ্রতিম গুরুদেবের ব্রহ্মমূর্ত্তি যিনি একবার দেখিয়াছেন, তিনি কি আর কখনও ভুলিতে পারিবেন? তিনি সাক্ষাৎ অরুণদেবের ন্যায় তাম্রমূর্ত্তি ছিলেন। প্রাতে গঙ্গাস্নান করিয়া পথে চলিয়া যাইলে, লোকে অরুণোদয় না দেখিয়া তাঁহাকেই দেখিত। তাঁহাকে দেখিলে অন্ধকারের ন্যায় অপবিত্র ভাবসকল তিরোহিত হইত। তাঁহার যেমন আকৃতি তেমনি প্রকৃতি ছিল। "যত্রাকৃতিস্তত্র গুণা বসন্তি"—এ বাক্যের তিনি প্রকৃত দৃষ্টান্তস্থল। তদীয় বিদ্যা ও কবিত্ব প্রভৃতির বিষয় পাঠকগণ এই পুস্তকে যথেষ্ট পরিচয় পাইবেন। দেবভাষায় তিনি যে সকল মহারত্ন উদ্ধার করিয়া গিয়াছেন, তাহার এক একটী তাঁহার এক একটী অক্ষয় কীর্ত্তিস্তম্ভ। সুতরাং সে বিষয়ে আর কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। এস্থলে কেবল তাঁহার আশ্চর্য্য প্রকৃতির বিষয়ে একটী ঘটনা বলিতেছি;—

আমাদের যে বাটীতে বাসা ছিল, তথায় রামতারক রায় নামে একজন কবিরাজ থাকিতেন। তিনি বড় আমুদে লোক ছিলেন, তাঁহার অমায়িকতায় ও সুচিকিৎসায় সকলেই তাঁহাকে ভাল বাসিত। তাঁহার আয় পয়ও বিলক্ষণ ছিল। তাঁহার ন্যায় খাঁটি ঔষধ প্রস্তুত করিতে অল্প লোকেই জানিত। দৈবঘটনায় তিনি উন্মাদগ্রস্ত হইলেন। ক্রমে এত বাড়াবাড়ি হইল, যে একদিন দোতালার ছাদ হইতে হঠাৎ নীচে লাফাইয়া পড়িলেন, নরককুণ্ডের ন্যায় একটা নর্দ্দামার মধ্যে পড়িয়া ডুবিয়া গেলেন। ঐ ঘটনা দেখিবামাত্র আমার এক মাতুল সেই নর্দ্দামায় নামিয়া প্রাণপণ যত্নে তাঁহাকে তুলিয়া আনিলেন। আর একদিন সেই কবিরাজ থান ইট মারিয়া আপনার মাথা ফাটাইয়াছিলেন, সেবারও আমার মাতুলের যত্নে আত্মহত্যায় কৃতকার্য্য হন নাই। মাতুল মহাশয় যদিও তাঁহাকে দিবারাত্রি চৌকী দিতে লাগিলেন, তথাপি তিনি বারংবার আত্মহত্যার চেষ্টা হইতে ক্ষান্ত হইলেন না। তাঁহার অবস্থা দেখিয়া আমরা ভয় পাইলাম। আমার পিতা তখন বিদেশে ছিলেন; তিনি এই ঘটনার সংবাদ পাইয়া আমায় লিখিলেন,—বাবা! আমি বিদেশে আবদ্ধ রহিয়াছি, আমার কনিষ্ঠাধিক রামতারকের অবস্থা শুনিয়া আমার উৎকণ্ঠার সীমা পরিসীমা নাই। কিন্তু এক ভরসা আছে, তুমি কৌশলক্রমে উঁহাকে একবার তর্কবাগীশ মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করাইয়া দিও, ঔষধ ধরে ত কাহারও আর উৎকণ্ঠার কারণ থাকিবে না।

কবিরাজ সকলকার চেয়ে আমাকেই অধিক ভাল বাসিতেন, সেই উন্মাদের অবস্থায়ও আমার কথা একটু আধটু শুনিতেন, আমি নানা কৌশলে তাঁহাকে একদিন তর্কবাগীশের কাছে লইয়া গেলাম। আশ্চর্য্যের বিষয় এই,—তর্কবাগীশকে দেখিবামাত্র তিনি গললগ্ন-বস্ত্রে কৃতাঞ্জলিপুটে হাটু পাতিয়া বসিলেন। কিয়ৎক্ষণ তর্কবাগীশও কিছু বলিলেন না, পাগলও অবাক্ হইয়া তাঁহাকে দেখিতে লাগিলেন; উভয়কে ঐরূপ অবস্থায় দেখিয়া আমার জ্ঞান হইল যেন চিত্রপটে বিষ্ণুর সম্মুখে গরুড়ের মূর্ত্তি দেখিতেছি। আমি সেখান হইতে বাহিরে আসিয়া পাগলের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। অনেকক্ষণ পরে তিনি বাহিরে আসিলে তাঁহাকে বাসায় লইয়া আসিলাম। তদবধি তাঁহার অবস্থার আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হইল। এখন

আর তাঁহাকে কৌশল করিয়া লইতে যাইতে হইত না, তিনি দুই বেলা স্বয়ং যাইয়া তর্কবাগীশকে দর্শন করিতেন। তাঁহাকে আর চৌকী দিতে হইত না, তাঁহার সে উন্মাদের ভাব একেবারেই দূর হইল। কয়েক দিন পরেই তিনি তর্কবাগীশের নিকট ইষ্টমন্ত্রে দীক্ষিত হইলেন। তদবধি তিনি যথাসময়ে সাংসারিক কর্ত্তব্য পালন করিতেন এবং অবশিষ্ট সময় বিজনে বসিয়া অতি সংযতভাবে ইষ্টদেবের উপাসনা করিতেন।

হা গুরুদেব! তুমি কি পতিতপাবনী শক্তি লইয়াই অবনীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলে! তোমার দর্শনলাভে আত্মহত্যাকারী উন্মাদ পাগলও প্রকৃতিস্থ হইল!!!

সাধূনাং দর্শনং পুণ্যং তীর্থভূতা হি সাধবঃ।
তীর্থং ফলতি কালেন সদ্যঃ সাধুসমাগমঃ" ॥

সাধুর দর্শনমাত্রে পাপক্ষয় হয়,
তীর্থের অধিক সাধু জানিবে নিশ্চয়,
ফলিতে তীর্থের ফল বিলম্ব হইবে,
সাধুসঙ্গ-ফল কিন্তু সদ্যই ফলিবে।

এই মহাবাক্য তুমিই সপ্রমাণ করিয়া গিয়াছ। সাধুপুরুষে যে দেবত্ব থাকে, তাহা তুমি দেখাইয়াছ।

তোমার দীনবাৎসল্যের কথা কি বলিব? কত শত নিরাশ্রয় ব্যক্তি তোমার আশ্রয়ে থাকিয়া অন্ন ও বিদ্যা লাভ করিয়াছে। তোমার কবিত্বের কথা কি বলিব? আহিতাগ্নি ঋষির যজ্ঞকুণ্ডে পবিত্র হোমাগ্নির ন্যায় দিব্য কবিত্ব-প্রতিভা তোমার হৃদয়ে চির-প্রজ্বলিত ছিল। তোমার কাশীলাভের সংবাদ পাইয়া আমি বলিয়াছিলাম,—আজি এদেশের গুরুকুল নির্ম্মূল হইল; ৺ প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ এদেশের আচার্য্যকুলের শেষ প্রদীপ ছিলেন। ইতি

কলিকাতা।
২৫, পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট্।
১৫ই পৌষ। ১২৯৮।

পরমারাধ্য ৺ গুরুদেবের
পাদানুধ্যাত
শ্রীতারাকুমার শর্ম্মা।

তর্কবাগীশের মৃত্যু সমাচার শুনিয়া প্রোফেসর এ, বি, কাউয়েল সাহেব মহোদয় সংস্কৃত বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব সহকারী অধ্যক্ষ ৺ সোমনাথ মুখোপাধ্যায়কে নিম্নলিখিত পত্রখানি লিখিয়াছিলেন ;—

"BOLTON HILL, IPSWITCH,
20th August 1867.

I was much grieved to hear that my old friend and teacher Prem Chandra Tarkabagish was dead. I shall always remember him with great respect and affection. He was a surely great scholar, and I look back with deep interest to my intercourse with him. He was a truly learned man, and he loved learning for its own sake. I wish exceedingly that I had had his Photograph, and I deeply regret that I neglected it while it was in my power to get one, &c., &c., &c.

E. B. COWELL."

প্রথম মুদ্রিত কয়েকখানি জীবনচরিত পাইয়া শ্রীযুত কাউয়েল সাহেব মহোদয় আমায় যে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন তাহার ও কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

CAMBRIDGE,
April 5th 1892.

MY DEAR FRIEND,—

Your kind letter and your most interesting memoir of Prem Chandra Tarkavagisha quite affected me when I received them. They overpowered me with a flood of old memories. They carried me back to the Sanskrit College, and to the Alankara Class Room nearly 30 years ago ;—it all returned to my mind as fresh as if it had been yesterday &c., &c., &c. I thank you most sincerely for sending me these copies of your memoir. I have sent copies to Dr. Weber and to Dr. Roth, the two most eminent Sanskrit Scholars in Germany and I have given some to our English Sanskritists, &c.. &c., &c., &c., of course in England we have not such opportunities of study-

ing Alankara. Our attention is more given to the Rig Veda and to Panini; still every scholar feels the fascination of Kabya. &c., &c., &c., &c., I often quote those beautiful lines in the Hitopadesha to English classes and never without awaking their interest.

"Two fruits of heavenly flavour
Grow e'en on life's bitter poison tree,
The friendship of the noble heart
And thy rich clusters, Poetry!"

* * * *

I always hope that some year I may spend a cold season in Calcutta again before I die, see the Sanskrit College and renew the old days. I have tried to put my feelings into a a Sloka which I venture to put into this letter.

विद्यालयो निर्जरयौवनः क्व
काव्यं च नित्यामृतभोगवर्षि ।
क्वाहं च जीर्णो बलधीविहीनो
निःसारतां देहभृतां धिगेव ॥

Thanking you once more for sending me the memoir.

I remain,
Yours very sincerely,
E. B. COWELL.

To

PANDIT RAMAKHOY CHATERJEE,
101, *Taltola Lane, Calcutta.*

সোমপ্রকাশ। ২৬এ চৈত্র, ১২৭৩ সাল।

৺ প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ।

বঙ্গদেশ আর একটী পণ্ডিতরত্ন হারা হইলেন। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব অলঙ্কারশাস্ত্রাধ্যাপক প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ মহাশয় দেহ-ত্যাগ করিয়াছেন। আমরা এই সমাচার লিখিতেছি, কেবল যে আমা-দিগের নয়নযুগল অশ্রুজলে পূর্ণ হইতেছে এরূপ নয়, যাঁহারা এ সমাচার পাঠ করিবেন, যাঁহারা এ সমাচার শ্রবণ করিবেন, সকলকেই দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ ও অশ্রুমোচন করিতে হইবে। আজি কালি ইহাঁর তুল্য সংস্কৃত শব্দশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন লোক মিলা ভার। ইহাঁর অলঙ্কারশাস্ত্রে মার্জ্জিত বিদ্যা ও বিলক্ষণ কবিত্বশক্তি ছিল। কালিদাসাদির ন্যায় ইহাঁর কৃত কবিতা পাঠ করিলে শরীর রোমাঞ্চিত হয়। ইহাঁর তুল্য ভাবুক অল্প লোক আমাদিগের নয়নগোচর হইয়াছেন। "কাব্যশাস্ত্রবিনোদন কালো গচ্ছতি ধীমতাং" ইনি এই শ্লোকার্দ্ধের প্রকৃত উদাহরণস্থল ছিলেন। এক ক্ষণও ইহার শাস্ত্রালো-চনায় বিরক্তি ছিল না। ইনি নিয়তকাল ছাত্রদিগকে অধ্যয়নকার্য্যে উৎ-সাহ দান করিতেন; কেহ একটী ভাল কবিতা করিলে কিম্বা ভাল রচনা করিলে ইহাঁর আনন্দের পরিসীমা থাকিত না।

ইহাঁর আর কতকগুলি অসাধারণ গুণ ছিল, সেগুলি স্মৃতিপথে উদিত হইলে চিত্ত একান্ত আর্দ্র হইয়া উঠে। তাঁহার যেরূপ দয়া, বিনয় সৌজন্য ও ঔদার্য্য ছিল, তাঁহার সম্প্রদায়ের লোকের সচরাচর সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। বিনয়ের সঙ্গে তাঁহার বিলক্ষণ তেজস্বিতাও ছিল। তিনি দীনবচনে কখনও কাহার উপাসনা করেন নাই। হিন্দু ধর্ম্মে তাহার অতিশয় শ্রদ্ধা ছিল। কপট ব্যবহার তাঁহার নিকটে কখন স্থানপ্রাপ্ত হয় নাই।

চারি বৎসর অতীত হইল, তিনি কালেজের অধ্যাপনা পদ পরিত্যাগ করিয়া কাশীধামে বাস করিয়াছিলেন। এ অবস্থাতেও তাঁহার অধ্যাপনার বিরাম ছিল না। প্রতিদিন ৩০।৩২ জন ছাত্র তাঁহার নিকটে অধ্যয়ন করিত। ১০ই চৈত্র ওলাউঠা রোগ হয়। ১২ই চৈত্রে উক্ত কাশীধামেই তিনি মানবলীলা সংবরণ করিয়াছেন।

জেলা বৰ্দ্ধমানের অন্তর্গত থানা রায়নার দক্ষিণ শাকনাড়া গ্রাম ইহাঁর জন্মভূমি। ইনি ১৭২৭ শকের বৈশাখ মাসের ২য় দিবসে জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর পূর্ব্বপুরুষেরা সকলেই প্রায় সংস্কৃত শাস্ত্রব্যবসায়ী ছিলেন। তন্মধ্যে এক এক জন এক এক বিষয়ে অদ্বিতীয় পণ্ডিত হইয়া যান। ইহাঁর বৃদ্ধ প্রপিতামহ মুনিরাম বিদ্যাবাগীশ স্মৃতি, ন্যায়, ও অলঙ্কারশাস্ত্রে অতিশয় পণ্ডিত ছিলেন।

উক্ত মুনিরামের সহোদর (১) রামচরণ তর্কবাগীশ অলঙ্কার ও দর্শনশাস্ত্রে প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি সাহিত্যদর্পণ নামক অলঙ্কার গ্রন্থের টীকা করেন। সেই টীকা বাঙ্গালা হিন্দুস্থান প্রভৃতি সর্ব্বপ্রদেশে সমাদৃত হইয়াছে। এজন্য অলঙ্কারবিদ্যা ইহাঁদের সিদ্ধবিদ্যা বলিয়া অনেকে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। তর্কবাগীশ মহাশয়ের প্রপিতামহের ভ্রাতা লক্ষ্মীকান্ত তর্কালঙ্কার নানা শাস্ত্রে অতিশয় ব্যুৎপন্ন ছিলেন। বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ্যানুষ্ঠানে তাঁহার সদৃশ লোক তৎকালে অতি অল্প ছিল। ইহাঁদের রচিত অলঙ্কার ও স্মৃতি-শাস্ত্রের অনেক গ্রন্থ ছিল, কিন্তু মহারাষ্ট্রীয়দিগের উৎপাতে (যাহাকে বর্গীর হাঙ্গামা বলে) এবং বন্যার উপদ্রবে সমুদায় গ্রন্থ নষ্ট হইয়াছে। রামনারায়ণ ভট্টাচার্য্য তর্কবাগীশ মহাশয়ের পিতা। তিনিও সংস্কৃত ব্যবসায়ী ছিলেন, কিন্তু অল্পকালে পিতৃবিয়োগ হওয়াতে তাঁহার অধ্যয়নের ব্যাঘাত জন্মিয়া ছিল। রামনারায়ণ ভট্টাচার্য্য তাদৃশ বিদ্বান্ ছিলেন না বটে, কিন্তু তিনি অতিশয় দয়ালু মিষ্টভাষী পরোপকারী ও নম্রস্বভাব এবং অতিথিসেবায় সবিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। স্বগ্রামস্থ হউক, কি ভিন্নগ্রামস্থ হউক দুই প্রহরের পর বাটীতে আসিলে তাহাকে অভুক্ত জানিলেই অতিথি বোধে যথাশক্তি আহার প্রদান করিতেন।

তর্কবাগীশ মহাশয়ের জন্মক্ষণে এক শুভ ঘটনা হয়। নসীরাম ভট্টাচার্য্য নামক ইহাঁদিগের এক জ্ঞাতি ছিলেন। তাঁহার সহিত ইহাঁর পিতার শত্রুতা ছিল। তিনি জ্যোতির্ব্বিদ্যায় বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তর্কবাগীশ মহাশয়ের জন্মকালে তিনি লগ্ন স্থির করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়া বলিয়াছিলেন, আমাদিগের গোত্রে দ্বিতীয় কালিদাস জন্মগ্রহণ করিল। তদবধি নসীরাম

১ 'সহোদর' নহেন, জ্ঞাতি-ভ্রাতা। রামাক্ষয়।

শক্রতা পরিত্যাগপূর্ব্বক তর্কবাগীশের প্রতি বাৎসল্যভাব প্রকাশ করিয়া লালনপালন করিতে লাগিলেন। তাঁহার নিকটেই তর্কবাগীশের বিদ্যারম্ভ ও সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণের কিয়দংশ অধ্যয়ন হয়। তৎপরে জাহানাবাদ পরগণার অন্তর্গত রঘুবাটী গ্রামে সীতারাম বিদ্যাসাগরের নিকটে ব্যাকরণের মূল্ল পাঠ হয়। পরে মল্লভূম পরগণার অন্তর্গত ছুয়াড়ি গ্রামবাসী অশেষ গুণরাশি জয়গোপাল তর্কভূষণের নিকট ব্যাকরণের সমগ্র টীকা ও ভট্টির কয়েক সর্গ এবং অমরকোষ অধ্যয়ন হয়। তর্কবাগীশ মহাশয় বুদ্ধিমত্তা ও মিষ্টভাষিতাদি গুণে তর্কভূষণের অতিশয় প্রিয়পাত্র হন। তিনি ইতস্ততঃ নিমন্ত্রণে যাইবার সময়ে তর্কবাগীশকে সমভিব্যাহারে লইয়া যাইতেন। পথিমধ্যে যাইতে যাইতে এক এক সমস্যা দিতেন, তর্কবাগীশ শ্লোক রচনা করিয়া সমস্যা পূরণ করিতেন। এইরূপে অল্পকালের মধ্যেই কবিতা রচনা করা অভ্যাস হয়।

তর্কবাগীশ মহাশয় ২০।২৫ বৎসর বয়ঃক্রমকালে সংস্কৃত কালেজে অধ্যয়ন করিবার মানসে কালেজের তদানীন্তন অধ্যক্ষ উইলসন সাহেবের নিকট উপস্থিত হন। সাহেব তাঁহার মস্তক দর্শনে তাঁহাকে বুদ্ধিমান্ জানিতে পারিয়া কৌতুকাবিষ্ট হইয়া শ্লোক রচনা করিতে বলেন। তর্ক-বাগীশ মহাশয় অতি অল্পকাল মধ্যেই ১ শ্লোকে কালেজের ও অপর ৩ শ্লোকে সাহেবের বর্ণনা করিলেন। তাহাতে সাহেব সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে কাব্যের গৃহে অধ্যয়নার্থ নিয়োজিত করিলেন। তিনি কালেজে ৪ বৎসর মাত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ইহার মধ্যেই কাব্য অলঙ্কার ও স্মৃতি পড়িয়া ন্যায়শাস্ত্র পড়িতে আরম্ভ করেন। এমৎ সময়ে অলঙ্কারের অধ্যাপক নাথূরাম শাস্ত্রী অবকাশ লইয়া কাশীধামে গমন করিলেন। উইলসন সাহেব তর্কবাগীশ মহাশয়কে তাঁহার পদে প্রতিনিধিরূপে নিযুক্ত করিলেন। নাথূরাম শাস্ত্রীর কাশীপ্রাপ্তি হইলে তৎপদে তর্কবাগীশ মহাশয় স্থায়ী হইলেন। তিনি উক্ত পদ পাইয়াও অধ্যয়নে বিরত হয়েন নাই। কালে-জের অলঙ্কার পাঠনা যথাসময়ে করিয়া প্রাতে ও রাত্রিতে ন্যায়, স্মৃতি, বেদান্ত ও অধিকরণমালা প্রভৃতি ৯।১০ বৎসর অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তৎকালে মল্লিনাথকৃত রঘুবংশের টীকা কালেজে ছিল না। এজন্য

উইলসন সাহেবের আদেশানুসারে প্রথম রামগোবিন্দ পরে নাথূরাম তাহার রচনায় প্রবৃত্ত হন, শেষে তর্কবাগীশ মহাশয় তাহার শেষ করেন। তর্কবাগীশ মহাশয় পূর্ব্বনৈষধ, রাঘবপাণ্ডবীয়, অষ্টম কুমার, সপ্তশতীসার (যাহাতে মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত চণ্ডীর সার সংগৃত হইয়াছে), চাটুপুষ্পাঞ্জলি, মুকুন্দমুক্তাবলী গ্রন্থের টীকা করিয়া উক্ত গ্রন্থ সকল সর্ব্বত্র প্রচলিত করিয়াছেন। দণ্ড্যাচার্য্যকৃত কাব্যাদর্শ নামক প্রাচীন অলঙ্কার গ্রন্থ একবারে লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল। তর্কবাগীশ মহাশয় বিস্তারিত ও বিশদ বৃত্তি করিয়া সেখানি পুনর্জ্জীবিত করিয়াছেন। শকুন্তলা, উত্তরচরিত ও অনর্ঘ্য রাঘবের টীকা করিয়া পাঠ্যের ও পাঠনার পক্ষে বিশেষ সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন তিনি কয়েক খান নূতন গ্রন্থ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু কোনও কারণে তাহা সম্পূর্ণ হয় নাই। শালিবাহন চরিত প্রথম, ইহা মহাকাব্য হইত, ইহার চতুর্থ সর্গ পর্য্যন্ত রচিত হইয়াছে। দ্বিতীয়, নানার্থসংগ্রহ নামক অভিধান, ইহাতে অকারাদিক্রমে মকারাদি শব্দ পর্য্যন্ত সংগৃহীত হইয়াছিল। সম্প্রতি এক খান নূতন অলঙ্কার গ্রন্থ আরম্ভ করিয়াছিলেন। উহার দুই পরিচ্ছেদ মাত্র লিখিত হইয়াছে।

তাঁহার ৬১ বৎসর বয়স হইয়াছিল, কিন্তু শরীর বিলক্ষণ সবল ছিল। তিনি কিঞ্চিৎ খর্ব্বাকৃতি ছিলেন, কিন্তু অবয়ব সুগঠিত ছিল। বর্ণ উজ্জ্বল শ্যাম, ললাট উন্নত, ও আকৃতি লাবণ্যপূর্ণ। ফলতঃ তাঁহার মূর্ত্তিটী অতিশয় সৌম্য ছিল, তদ্দর্শনে অপরিচিত ব্যক্তিরও অন্তঃকরণে স্নেহার্দ্র ভাবের উদয় হইত। কখন তাঁহার বদন বিরস ও অন্তঃকরণ বিষণ্ণ দেখা যায় নাই। বারাণসীতে বাসকালে তাঁহার এই সকল গুণে বশীভূত হইয়া হিন্দুস্থানীয় ছাত্রেরা বাঙ্গালির প্রতি স্বভাবজাত ঘৃণা পরিত্যাগপূর্ব্বক পাঠ স্বীকার করিয়াছিলেন।

তাঁহার একটী ছাত্র তাহার মৃত্যুর সমাচার শ্রবণে দুঃখিত হইয়া বিলাপষট্‌ক নামে যে ছয়টী উৎকৃষ্ট সংস্কৃত কবিতা ও আর এক ছাত্র বাঙ্গালায় তাহার যে অর্থ করিয়াছেন, তাহা এস্থলে উদ্ধৃত হইল।

বিলাপষট্‌কম্।

(১)

পীতং যস্য সদা মুখাদ্বিগলিতং প্রোন্মীলনং চেতসাং
সানন্দং কবিতামৃতং নবরসোল্লাসৈকসারং পুরা।
পাদা যস্য চ সেবিতা দ্বিজকুলৈরন্তেবসদ্ভির্গতঃ—
সোঽয়ং প্রেমসুধানিধির্বিধিবশাদস্তং প্রচেতোদিশি ॥

(২)

বিমুক্ত্যৈ পুণ্যাত্মন্! শশধরশিরোধাম বসত-
স্তবোদন্তৈঃ ক্ষেমৈঃ কথমপি নিরুদ্ধা তনুশুচঃ।
বিহায়াস্মানেবং বত! বিলপতঃ শোকবিধুরা-
নিদানীং যাতোঽসি ক্ব নু গুণনিধে! নিষ্কৃপ ইব ॥

(৩)

প্রাপ্তাধুনা রসিকতে! ত্বমনাশ্রয়ত্বং
বিদ্যালয়! ত্বমসি রে মুষিতৈকরত্নঃ।
যাতে গুরৌ দিবমপেতরুচিশ্চিরায়া-
লঙ্কার! রে বত! পুরা কমলঙ্করোষি ॥

(৪)

সাহায্যার্থং ক্ষণমিহ বসদ্‌যস্য সখ্যানুরোধাৎ
হস্তালম্বং বিবিধবিবৃতৌ রে কবিত্বাদদস্ত্বম্।
তস্মিন্ যাতে তব সহচরে দূরমুদ্গীতকীর্ত্তৌ
দেশাদস্মাদ্গমনমধুনা কো নিরোদ্ধুং ক্ষমস্তে ॥

(৫)

সুকবৌ ভাবরসজ্ঞে গতবতি ভবতীহ নামশেষত্বম্।
যাতা সা রসবাণী শশধর ইব কৌমুদী নাশম্ ॥

(৬)

চরমঃ পরমং গতস্য তে পদমারাধ্যপদেষু সম্ভৃতঃ।
অয়মেব বিলাপপুষ্পকৈরুপনীতো গুরুদক্ষিণাঞ্জলিঃ॥

আশ্রবান্তেবাসিনঃ
শ্রীহরিশ্চন্দ্র শর্ম্মণঃ।

(বিলাপষট্‌কের অনুবাদ।)

মুখ বিগলিত যাঁর কবিতা-অমৃত-ধার
নবরসে পীযূষ-সমান,
চিত্তের উল্লাসকর মনসুখে নিরন্তর
সর্ব্বজনে করিয়াছে পান ;
যাঁর পদ অনুক্ষণ অন্তেবাসী দ্বিজগণ
সেবিয়াছে মিলিয়া সকলে ;
ওই সেই গুণধর আজি প্রেমসুধাকর
পশ্চিমেতে যান অস্তাচলে।
যবে তুমি মুক্তি-আশে ছিলে দেব-কাশীবাসে
ছিনু শোক নিরোধিয়া মনে ;
বিরহবিধুর করি কোথা গেলে পরিহরি
আমা সবে বল না কেমনে ?
রসিকতা! বল আর আশ্রয় লইবে কার
হারাইলে আজি রে শরণ ;
বিদ্যালয়! আজি তোর সুখনিশা হলো ভোর
হারাইলি অমূল্য রতন।

চারিদিক শূন্য করি ভবধাম পরিহরি
গেছে গুরু অমর-সদন ;
বল শুনি অলঙ্কার! হবি কার অলঙ্কার
কেবা তোরে করিবে ধারণ ?
যাঁর অনুরোধে তুমি আলো করি বঙ্গভূমি
কবিত্ব রে! ছিলে কিছুক্ষণ ;
হয়ে ছিলে স্থিরতর আদরে যাঁহার কর
নিরন্তর করিয়ে ধারণ ;
আজি সেই সহচর ত্যজিলেন কলেবর
শূন্য করে গেলেন সকল,
তুমিও যাইবে শেষ পরিহরি এই দেশ
রাখে কেবা কার হেন বল ?
কবিকুল-শিরোমণি রসিকের চূড়ামণি
তুমি দেব! নামশেষ হলে,
ভারতী মুদিবে হায়! কৌমুদী মিলা'য়ে যায়
শশী যথা গেলে অস্তাচলে।
ভবব্রত উদ্‌যাপিয়ে মোহপাশ কাটাইয়ে
গেলে দেব! অমর-সদনে,
কবিতা- কুসুম-হার গাঁথি দিনু উপহার
অবসানে যুগল চরণে।

[কোন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির রচনা]

To

THE EDITOR OF THE "PUNDIT."

SIR,

As anything connected with Sanskrit Literature can claim insertion in your celebrated journal, the death of one, who was in the foremost rank of the Hindu literary world, whose name is familiar to Sanskrit scholars, European and Indian,

and who has left behind him his works, which are valuable to Sanskrit students, should be prominently noticed in it.

Pundit Prem Chandra Tarkabagish, late Professor of Rhetoric in Sanskrit College, Calcutta, is dead. This event took place here on the 25th day of last month.

The Hindu republic of letters has thus lost one of its illustrious constituents. His death has made a gap in it, not easy to be filled.

For want of detailed information relating to the career of the learned Pundit, we give in a few words a few general facts of his life. He was a Kúlin Bráhmin of Bengal, an inhabitant of a village in the district of Burdwan. He received the rudiments of his education under private teachers; but he learned the higher branches of leterature in the Sanskrit College, Calcutta, in the days of Professor Wilson. He was a favourite scholar with the Professor, as he used to tell us, and won his esteem by his proficiency in Grammar, and by translating Bengali Passages into Sanskrit verse, when the Professor only expected a version in Prose. An anecdote is preserved of his college days, which shows that he was very quick in College Examinations. It was a rule with him to give in his papers before all other Examinees. It happened in one examination that while Professor Wilson was expecting to receive his papers, another pupil gave him his own. Without glancing even on this paper, the learned Professor immediately went to Prem Chandra to ask the cause of his unusual delay. He had been some years in the College, when the Professorship of Rhetoric became vaccant. There were many candidates for the much-coveted post, and Prem Chandra was one of them. Professor Wilson rejected all other candidates and appointed his favourite scholar, Prem Chandra, to the post. He honourably occupied the Professorial chair for 30 years. After this period he retired from active life, and for the last two or three years he passed

his days here with a view to close his life in this secred spot. This object he obtained.

The literary merits of modern Pundits in general become known to the public by their controversies in assemblies, or by their lectures to their pupils. They seldom devote their time to literary writing. The best opportunity of showing their literary talents in writing would be when they are to present some verses to some great men as Rajas or Princes, or when they are to give their judgments (vyávastha) in writing. Thus the fame of a Pundit often does not travel beyond his neighbourhood, and dies away with him; or if it, in some particular case, does not vanish so soon, being preserved through local tradition, friends or pupils, it lasts only a generation or two after him. Besides, the want of literary productions of the Pundits prevents the public from forming any judgment on their merits after death. But such is not the case with the illustrious subject of our writing. The public has not to form any judgment from the reports of his friends or pupils, for he has transmitted to us his works to prove his merits. He used his tongue when in his Professor ial chair, but he used his pen when in his closet; and hence we enjoy the fruits of those labours.

He has not left for us any poetical compositions, for we have enough of that species of writing. Neither has he left for us theological or polemical controversies, for, in these days, they are thought too useless to be read. He has left us a useful kind of writing. He has left us commentaries on difficult poems and drámás. His first essay in this branch of writing, after his acadmeical career, we learn, was "a commentary on the first 11 chapters of Naishadha." He did not finish the remaining chapters. His other principal works are commentaries on the "Kávyádarsha," on the "Rághava Pándaviya," on the Murári Nátaka," and on the "Uttara Rámcharita" His minor works are his commentaries on a few chapters of

the "Raghuvansha," on the eighth chapter of the Kumára," and his notes on "Sákuntalá," &c., &c. Besides these, he edited numerous works for the public in the Bibliotheca Indica.

In none of these works is he guilty of the charge laid down in the following two lines:—

"Commentators each dark passage shun,
And hold a farthing rush-light to the sun;"

—A charge of which even Mallinátha is guilty in some places of his works.

This is a hurried account of the life and writings of Pundit Prem Chandra Tarkabagish. A little time and proper investigation would bring much interesting matter to light. The friends and relatives of the Pundit should furnish the public with a more detailed account.

The day has not come when Indian Boswells will write lives of Indian Johnsons, but the time has certainly arrived when notices of eminent persons should be handled in newspapers and journals.

It is a sacred duty to embalm the memoirs of the illustrious dead, and it was a sense of this sacred duty that urged the writer of this, a dutiful pupil of the deceased, to bring before the public this short account of one who, as a commentator, the first of this age, falls not behind the much celebrated Mallinátha.

A. B.*

BENARES,
The 1st May 1867.

---

* This A. B. is Bahoo Abhoyanath Bhattacharjya now residing at Mirzapur.

R. A. CHATTERJEE.

THE "HINDU PATRIOT."

The 22nd May 1867.

The Late Pundit Prem Chandra Tarkabagish.

[A Biographical Sketch.]

• Sanskrit Literature has lost one of its brightest ornaments and a most devoted votary in Pundit Prem Chandra Tarkabagish, who died of cholera, at Benares, on Monday, the 25th ultimo.

The Pundit was born in the year 1806, in a small village called Saknara, in the district of East Burdwan, which he has eulogized in several of his poems.

He was descended from a long line of ancestors, whose deep erudition, great piety, and unbounded hospitality are still theme of admiration to the Ghuttucks of Bengal. Sharbeshwar Bhuttacharyya, who had emigrated from Bikrampore, in Dacca, during the commencement of the Mahomedan government, was the head of the family. He performed a *Yajna*, or grand religious ceremony, the like of which, it is said, has not since been celebrated by any one. It was memorialized by a poem at the time from which we quote the following :—

"নাম্না সর্ব্বেশ্বরঃ প্রাজ্ঞো দানৈঃ কল্পমহীরুহঃ।
অবসথীতি বিখ্যাতো যজ্ঞেঽবসথপালনাৎ ॥"

The descendants of Sharbeshwar were all more or less distinguished for their learning and virtue ; and the most celebrated among them were Moniram, Ramcharan, Ramcanta, Lakshmicanta, Ramshoonder, and Nushyram. True to the duties of the faith they professed and the caste they belonged to, they devoted their lives to the service of their religion, ever engaged in the observance of its numerous rituals, and imparting freely the knowledge of the *Shastras* to numbers, who resorted to the Colleges or *Chatuspathies*, of which they

were the heads. Ramcharan was the author of a popular comentary on *Shahityadurpan,* a celebrated work on Rhetoric. Of the last mentioned two Pundits, Shamshoondar was the grandfather, and Nushyram, the granduncle, of Prem Chandra.

An anecdote is related regarding the birth of Prem Chandra. Ramnarain and his brother Nushyram were not in good terms, and seldom saw each other; but when Prem Chandra was born in April 1806, Nushyram, who, among other branches of learning, had made astrology a part of his study, prognosticated what the new-born child would be, and flew to Ramnarain to congratulate him on the birth of an heir who, he exclained, would prove a Kalidásá to the family. Such a prediction from a Brahmin devoted to learning was but natural, but it had the good effect of mitigating the enmity of Nushyram towards his brother. He took a fancy to the child, whom he subsequently taught the first rudiments of Grammar.

On the death of Nushyram, Prem Chandra was, according to the custom of the country, sent to a *Chathuspathy.* It so happened, however, that his new tutor, one Joy Gopal Turka-bhushan, of Dwarigram, in West Burdwan, though rich in recondite lore, was not in a circumstance to provide board at his own expense for all his pupils. The youthful candidate for knowledge was therefore located in the house of a Brahmin in the same village, who promised to supply him with food on conditon that he would undertake to give instruction in the elements of Grammar to one of his children. These were hard terms to begin a student's life with, and to a tender youth like Prem Chandra, then only about 14 years old, they appeared particularly so; but his love for learning readily induced him to abide by them. Unfortunately the Brahmin's circumstances were not much better than those of the tutor, and the consequence was that Prem Chandra's allowance of the necessaries of life varied according to the daily earnings

of his host; and to make matters worse, the Brahmin, though poor, would never accept any pecuniary assistance from Prem Chandra, or his parents.

Joy Gopal's celebrity as a learned Pundit has spread far and wide, and invitations to *Shrads* and other ceremonials came to him from distant places, and every time he went abroad he took Prem Chandra with him, which was always a source of grievous hardship to the young pupil; but he cheerfully submitted to them as much to please his tutor, as to prosecute his studies without interruption, which he could not have done if he had remained at the *Chatuspathy* during the absence of the teacher. He never, however, forgot his sufferings, and often in after life recounted them in the most affecting terms. "*Chatuspathy* life," he once said to one of his younger brothers, "is the hardest that a young man can choose; and never can I forget how grievously I suffered from it. Being the youngest of all my fellow students, I was subjected to all the contumely that they could heap on me, and had often patiently to submit to cuffs and kicks. My attention to my lessons and the consequent kind treatment of the *Adhyapaka* had excited their envy; so they would every now and then tear the leaves of my *Puthees*; throw away the oil which I used to keep in store for my nightly study, and what was most annoying, rifle my little purse, of its contents, and thereby deprive me of the means of supplying new books or fresh oil. In addition to these sufferings and vexations, I had frequently to travel long distances with the *Adhyapaka* with swollen feet and pinched belly." "What sustained me in these trials," added he, "was the dread of rebuke from father, if I would be absent from *Chatuspathy*, and the hope of one day making a name in the literary world."

After a stay of several years in the *Chatuspathy* and having finished his elementary studies, Prem Chandra directed his attention to the higher branches of learning, such as Rhetoric,

Law, Logic, Philosophy, &c. He had heard the names of those renowned scholars, Nemye Chand Seeromonee, Shumbhoo Bachaspati, and Natooram Shastree, who then adorned the chairs of those subjects in the Sanskrit College of Calcutta, and longed to place himself under their able tuition. With this view he came down to the Presidency, and at the age of about 21 became a pupil of that Institution. That great Orientalist, Horace Hayman Wilson, was then its Secretary. When Prem Chandra first appeared before him for admission, Mr. Wilson was struck with his broad commanding forehead and intelligent appearance, and without submitting him to the ordinary examination, asked him if he could compose poetry. The young scholar was nothing loath; he immediately sat down, and wrote a few stanzas in Sanskrit, descriptive of the genius and ability displayed by Mr. Wilson in mastering the Sanskrit language, and the zeal and lively interest he uniformly evinced in promoting its cause. This settled the course of his future life. Professor Wilson at once took him by the hand, and ever after stood by him as a kind patron and a warm admirer.

On the death of Natooram Shastree, the chair of Professor of Rhetoric fell vacant, and Mr. Wilson knowing full well the eminent acquirements and the great natural parts of Prem Chandra gave it to him.

Thus Prem Chandra became the Professor of a most important branch of Sanskrit language, while he was yet a mere youth; but he was not unequal to new task. He discharged the duties of his post consecutively for 32 years with an amount of zeal, assiduity, and succes, which earned for him the higest approbation of the Government, and the admiration of the public. He early secured the respect of his Fellow-Professors and was greatly esteemed by his superiors in office. Professor Wilson never forgot him even when he had retired

to England, but corresponded with him upon diverse subjects connected with Sanskrit Literature.

Prem Chandra possessed great tact in deciphering ancient inscriptions, and this brought him into familiar intercourse with James Prinsep, whom he helped largely in bringing to light the purport of many an old record of great historical value.

During his collegiate career as a student, Prem Chandra was fond of spending his liesure hours in writing for the Vernacular Press. He selected for his organ the *Probhakar*, which was then edited by that clever Bengalee scholar, the late Baboo Iswar Chandra Gupta. Prem Chandra's connection raised the paper considerably in the estimation of its readers and its circulation was greatly increased. When, however, his reputation for Sanskrit writing became generally known and began to be appreciated by the learned, he dropped the Vernacular, and confined his attention solely to the former.

It is now four years ago that Prem Chandra left the service and retired to pass the remainder of his days at Benares. The cause that led him to take this step against the remonstrance of his friends and relatives is strange, and to many may appear purile. Like most people, whether ancient or modern, Prem Chandra was a fatalist. He believed, after examining his horoscope, that his last days was not far distant, and that he would die during the period intervening between the 57th and 62nd years of his age. He therefore hurried himself away to the above city to lay his ashes on its sacred soil. But impressed, as he was, with the idea of his approaching end, he did not feel in the slightest degree uneasy or nervous on that account. He followed the even tenor of his quiet life, and devoted his time to those literary pursuits, which had occupied the best part of his life. Between 20 and 30 of his pupils gathered round him, and to give them instruction *gratis* was his duty, as literary composition was his recreation.

Thus lived and died an eminent scholar in the full enjoyment of health and all the powers of mind, which had not suffered either by incessant labour, or the cares incident to the life of an author. Prem Chandra never shirked duty, and duty to him was always a source of grtification. He thought and believed that every educated member of the Hindu community was bound to exert to the best of his ability to revive the Sanskrit language from the ashes under which it had been smothered by centuries of Mahomedan domination, and how far he acted in accordance with this belief, may be seen by the numerous works which he has left, and which speak so well for themselves. Lately, he was engaged in writing a work on Rhetoric, and compiling a Sanskrit lexicon for the use of colleges. He was rapidly pushing them for the Press, and would have brought them to completion before long, had not death paralysed his pen, and but put an end to his hopes.

The life of a Pundit offers little matter for comment; but we cannot conclude this brief notice without adverting to the private character of Prem Chandra Tarkabagish. Perfectly disinterested in his actions and loving knowledge for its own sake, he was the very impersonation of all that is pure and virtuous. Though simple as a child in his daily intercourse with people, and in his conduct towards his disciples, there was a moral gravity and grandeur in his appearance, which inspired the respect of all. His love and affection for his pupils were more than parental. Among his pupils we may name such distinguished scholars as Iswar Chandra Vidyasagara, Mohesh Chandra Nyayratna, Dwarka Nath Bidyabhusan, Ram Narayan Tarkaratna, and Mooktaram Bidyabagish, who held him in the highest veneration. Well, can we understand how death has cast a gloom over the Professors and Students of the Sanskrit College; every one of whom is sincerely bewailing the loss he has sustained in the late learned Pundit.

Prem Chandra was a thorough orthodox Hindu of the Sect of Sakto, but he never condemned or questioned publicly the tenets of the other sects. Anything like hypocrisy, either in religion or morality, had no place in his composition. He acted upon what he truily and sincerely believed; and if sincerity is a virtue, whatever may be one's own faith, he had that in abundance. We have been assured that Sir Raja Radhacant held Prem Chandra in great esteem, as much for his learning as for his adherance amidst the laps and changes of the present generation to the religion of his forefathers.

Life of Prem Chandra Tarkavágisha with his verses in Sanskrit by Rámakshaya Chatterjee, Calcutta, printed at the Banerjee Press by J. N. Banerjee & Son, 119 Old Boytakhánȧ Bázár Road, 1892.

This is an excellent little biography in Bengali Who is there amongst us that has not heard of Pundit Prem Chandra Tarkavágisha, the Poet and Rhetorician? Pundit Tarkavágisha came of a good old stock of Sákrádá in Rarh. He acquired the rudiments of Sanskrit in a tóle. He then joined the Calcutta Sanskrit College as an advanced student, and soon after, completing his studies, was appointed Professor of Rhetoric and Poetry in his *alma mater*. Coming to occupy that chair after Pundit Náthuram Shástri, it was not easy to keep up its reputation. But Pundit Tarkavágisha showed that he was fully equal to the duties he had to discharge. He was truly loved by all the students who sat at his feet. He was an original poet of remarkable powers. He edited and com-

mented upon several celebrated Sanskrit poems, and was much esteemed by Professor Wilson and others not only for his sound scholarship but also for the purity and simplicity of his character. His biographer is his brother. Many remarkable anecdotes have been carefully collected, illustrative of Pundit Tarkavágisha's character. As befitted a rigid Hindu, the Pundit retired in his old age to Benares where he breathed his last, plunging into gloom his numerous disciples throughout Bengal. Pundit Tarkavágisha was connected with the Bengali press then in its infancy. His contributions to the *Probkara* were read with delight by a large circle. The little biographical sketch has been enriched by a collection of the Sanskrit verses of Pundit Tarkavagisha. These are delightful reading. It is a matter of great regret that the talents of Pundit Prem Chandra were allowed to be frittered away in comparatively unimportant tasks without being centred on something more worthy of them. An original poem from Pundit Tarkavágisha would not have been unworthy of the Sanskrit Muse of of mediæval India.

National Magazine, Dec. 1892.

(Vol. VI. No 12.)



Calcutta Review July, 1892.

p p. XXXIX.

Prem Chandra Tarkavágisha was one of the most distinguished Sanskrit scholar of Bengal during the early and middle parts of the century, and occupied the chair of Rhetoric in

৺প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশের হস্তাক্ষর।

শ্রীশ্রীরামঃ

দর্পান্ধরক্তদহনীদ্যুতিবিভাম্বুকান্তি
চ্ছটাং পুরঃ প্রবনমারুতোনিহিতজানু
গাপোস্থনঃ। হরন্নতিসুহৃঃ সহাং রাবণ
তাপভীতিং ক্ষণাং মদীয়হৃদয়াম্বরে
স্ফুরতু শেষশিবারাবরঃ॥ ১॥

the Sanskrit College of Calcutta for 32 years with great distinction. Some of the greatest oriental scholars such as Horace Hayman Wilson, Prof. E. B. Cowell and James Prinsep, held high opinions of the abilities and worth of the Pundit. He rendered great help to James Prinsep in deciphering ancient inscriptions in Palí and Sanskrit. He was a noted commentator of some of the immortal Sanskrit poems and was himself endowed with no mean poetical powers. His services for the improvement of Bengali literature are not to be slighted, as, in those early days of English education, few were the men who thought it worth their while to bestow time on the cultivation of their much neglected mother-tongue. As a man, Premchand was gifted with some of the noblest qualities of the heart, without which public virtues and the highest intellectual endowment are often a mere delusion. Taken all in all, Pandit Premchandra Tarkabágish was one of the greatest souls that Bengal ever has produced one, who certainly deserves the honour of being immortalised in a biography.

The department of biography in Bengali literature is exceedingly poor, not simply in respects of the number of books on the subject, but also in the sense that the few biographical works published in the language are not distinguished by the qualities which make a biography instruction, interesting and valuable, throwing light on the state of society of the time to which the individual who formed the hero of the work belonged. The life and poems of Premchandra Tarkabagish, though not a model of a biography, is still much above the general run of ordinary biographical works published in Bengalee. The author has not merely narrated the events in the life of his hero, but recorded various facts which have a bearing on the social and religious condition of Bengal in his time. The ancedotes given, few though they be, add to the interest of the work, and help to

make the character of the man as clear to the reader as possible. We are, however, sorry to note that in places the writer indulges in praises of the Pundit which overstep the limits of truth. For example, in noticing the demise of Premchandra, he says that with him poetry and warmheartedness departed from Bengal ! We have right to expect that English educated writers in Bengali should be above the practice of indulging in absurd oriental hyperboles, so common to old Sanskrit and Persian authors.
